"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২১শ বর্ষ।

(১৩২৫ মাঘ হইতে ১৩২৬ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

২১ বর্ষ।

আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত, আমাদের আদর্শ পুরুষ কে, যাঁহার অনুকরণে আমাদের জীবন গঠনের চেষ্টা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিতেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং যাঁহার ঐরূপ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ। কাম ক্রোধাদিও যখন বৃত্তি, তখন উহাদেরও বিকাশ আবশ্যক, তবে উহাদের দমনই, তাঁহার মতে উহাদের অনুশীলন। ভক্তি আদি বৃত্তির আতিশয্যে কামাদির একেবারে উচ্ছেদ সম্ভবপর বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহার মতে উহা করিলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না সুতরাং তাঁহার মতে ঐরূপ অনুষ্ঠানকারী যোগী সন্ন্যাসীরা আদর্শ পুরুষ নহেন।

শ্রদ্ধেয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনিও সন্ন্যাসের প্রতি যেন বিরূপ—তিনি সংসারের প্রতি রূপে রসে গন্ধে ব্রহ্মের স্ফুরণ দেখিতে চান—শত বাঁধনের ভিতর মুক্তি দেখিতে তাঁহার প্রয়াস। তাঁহার অনুবর্ত্তী অনেকে আজকাল এই ভাবের কথা লিখিতেছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়।

সন্ন্যাসকে আজকালকার শিক্ষিত অনেকে Mediæval superstition (মধ্য যুগের কুসংস্কার) বলিয়া উল্লেখ করেন। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস

প্রচারের ফলে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিযাছিল, এ কথা আজকাল যাহার তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং সন্ন্যাসীই আমাদের আদর্শ কি না, তৎসম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিযাছে দেখা যায়।

বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ—ইঁহারা সকলেই সন্ন্যাসী। ইঁহারা তবে কি আমাদের আদর্শ নহেন?

যাঁহারা সন্ন্যাসের বিরোধী, তাঁহাদের স্পষ্ট অভিপ্রায় কি তাহা অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। বঙ্কিম বাবুর কথাই ধরা যাক্‌। তাঁহার 'বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য সাধন'—আমার নিকট 'সোণার পাথরবাটী' ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। সামান্য জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেই আমরা আমাদের হৃদয়ে ভাল মন্দ উভয় প্রকার বৃত্তির একটা দ্বন্দ্ব—একটা সংগ্রাম অনুভব করি। ইহাদের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে?- খানিকটা ভাল—খানিকটা মন্দ—ইহাই কি সামঞ্জস্য? এক সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যায়—যদি মন্দ সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া ভালটাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে, অথবা ভালটা সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া মন্দটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়। এখানে আমরা দেখিতেছি, চূড়ান্ত না করিলে অব্যাহতি নাই, দ্বন্দ্বের শেষ নাই। সন্ন্যাসীর অর্থ—যিনি প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছেন—সুতরাং আদর্শ বলিতে আমি ত সন্ন্যাসী ছাড়া কাহাকেও দেখিতে পাই না।

হিন্দুশাস্ত্রের শত শত বচন উদ্ধৃত কর—যথেষ্ট দোহাই দাও—কিন্তু শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিয়াছ কি? গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতাপোষক যথেষ্ট প্রমাণ শুনিয়াছি, গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্মমাহাত্ম্যের ঘোষণা করিয়া সন্ন্যাসকে খর্ব্ব করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই অদ্বৈতকেশরী ভাষ্যকার শঙ্কর যে ভাবে উপনিষদ্‌ ও গীতাদির ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ত কাহারও উপাদেয়তর যুক্তি চক্ষে পতিত হয় নাই।

প্রবৃত্তিমার্গ মানবের স্বাভাবিক—ইহা সত্য; কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিকে

সংযত করিবার প্রবৃত্তিও কি তদ্রূপ স্বাভাবিক নহে? অনেকে সন্ন্যাসী, যোগী ও তপস্বীদিগের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক শরীরনিগ্রহ কঠোরতাদির দৃষ্টান্ত দেন - কিন্তু অতিরিক্ত বিলাসের অস্বাভাবিকতাই বা তাঁহাদের দৃষ্টি কেন এড়াইয়া যায়? এই অস্বাভাবিক বিলাসিতা ব্যক্তিতে বা ব্যক্তির সমষ্টীভূত সমাজশরীরে প্রবেশ করিয়া যখনই মানবকে অত্যধিক হীনবীর্য্য করিয়া তুলে, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অতিরিক্ত কঠোরতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসের সহিত এইরূপ কঠোরতাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

সন্ন্যাস মানব জীবনের স্বাভাবিক চরম পরিণতি। যে ত্যাগের বীজ মানবের মধ্যে দান, দয়া, স্বার্থত্যাগাদিরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই চরম পরিণতি সন্ন্যাসে। অনেকে সন্ন্যাসকে স্বার্থপরতার নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়া অতিশয় বিচারহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহার নামান্তর সর্ব্বস্বার্থবিসর্জ্জন তাহা স্বার্থপরতা হইল। আশ্চর্য্য কথা বটে! হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, উহার বর্ণধর্ম্ম, উহার আশ্রমধর্ম্ম, উহার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার মানবকে চরম সন্ন্যাসের দিকেই অগ্রসর করিতেছে। শুধু হিন্দুশাস্ত্রের কথাই বা বলি কেন?—ধর্ম্ম নামের যোগ্য কোন্ ধর্ম্মের এই প্রবণতা নাই—কোন্ ধর্ম্মের ইহা লক্ষ্য নহে?

আধুনিক জীবনে আবার সেই সন্ন্যাসের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নহে, সমাজ জীবনে ইহাকেই আদর্শ জানিয়া প্রাণপণে এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা আদর্শ হইতে বহু দূরবর্ত্তী হইতে পারি, কিন্তু আদর্শটীকে একবার যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন আসিতেছে। সাধারণ পিতামাতা ছেলে মেয়েদের কি ভাবে গঠনের চেষ্টা করেন?—লেখাপড়া যাহা শিখান

হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য কিসে অর্থ উপার্জ্জন হয়। যে যত অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয় তাহারই তত মান—তাহারই তত যত্ন। তার-পর বিবাহ দিবার চেষ্টা। ছেলে মেয়ের বিবাহ হইল—তাহাদের ছেলে মেয়ে হইল—ইহাতেই পিতামাতা পরম চরিতার্থ। নীতি বা ধর্ম্ম যদি কিছু শিখান হয়, তাহা এত সামান্য যে, ধর্ত্তব্যের ভিতরই নহে। ছেলে যদি এতটুকু বৈরাগ্যবান্ হয়, অমনি সে পিতামাতার চক্ষুশূল—পাকে প্রকারে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে সংসারী করিতে হইবে। আবার যে সকল পিতামাতা কিছু কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের সংশ্রব রাখেন, তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান অনেক সময়ে এমন প্রবল হয় যে, তাঁহারাও পুত্রের সামান্য বৈরাগ্যবীজকে ধর্ম্মসাধনাদি শিক্ষাদান-রূপ জলসেচনাদিসহায়ে বর্দ্ধিত করা দূরে থাকুক, তাহাকে গোড়া হইতেই পরীক্ষা করিতে বসেন—বিজ্ঞতার বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, এ এখনও সেই উচ্চ বৈরাগ্যলাভের যোগ্য হয় নাই—এখনও ত দেখিতেছি, সামান্য প্রলোভনেই উহার মন বিচলিত হয়—এ অবস্থায় সন্ন্যাসপথ গ্রহণ উহার পক্ষে ঠিক নহে।

প্রাচীনকালে ভারতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল—প্রায় সকলকেই বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচারী হইয়া কঠোর সংযম শিক্ষা করিতে হইত। এখন আবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেলে মেয়েদের ত্যাগ-তপস্যা সাধনভজন শিখান হউক—পরে যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ অধিকার, বয়স হইলে সে তদ্রূপ আশ্রম অবলম্বন করিবে। গোড়ায় সে শিক্ষা কই? অবশ্য এখন ঠিক প্রাচীন কালের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা চলে না—এবং তাহা উচিতও নহে। প্রাচীন কালে গৃহস্থগুরুগণ ব্রহ্মচারীদের শিক্ষক হইতেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ত্যাগতপস্যাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। বর্ত্তমান কালে সেরূপ গৃহস্থ গুরুর একান্তই অভাব তাই আমার মতে, বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে বালকগণ শিক্ষিত হউক। সন্ন্যাস আশ্রমও প্রাচীন কালের মত শুধু পরিব্রাজক আশ্রম হইলে

চলিবে না—এখনকার সকল সন্ন্যাসিগণের মনুর শাসনানুযায়ী গ্রামে একদিন ও সহরে তিন দিন ভিক্ষা করিয়া ঘুরিলে চলিবে না—অন্ততঃ কতকগুলিকে একস্থানে বসিতে হইবে এবং নিজের আত্মোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের শিক্ষার ভার লইতে হইবে। তারপর প্রশ্ন এই, এই সকল শিক্ষার্থীকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? ধর্ম্মশিক্ষা? প্রধানতঃ তাই বটে—আর ধর্ম্মশিক্ষা অর্থে আমি কেবল কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইতে বা কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস করাইতে বলিতেছি না। যাহাতে বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস ও একাগ্রতাসাধন হয়, ইহা শিক্ষা করানই প্রধান—অন্যান্য শিক্ষা যেরূপ আসিয়া পড়ে, তদ্রূপ হইবে। অর্থকরী সাংসারিক বিদ্যা শিখিবার ও শিখাইবার প্রবল উদ্যোগ চলিতেছে। ছেলেদের শিক্ষকের কাছে পড়িবার সময় সর্ব্বদা পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়—যেন পরীক্ষা দেওয়া ও তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যথার্থ আদর্শের দিকে লক্ষ্য হইলে ব্রহ্মলাভ জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিলে ও বুঝাইলে—অন্যান্য অপরাবিদ্যা যাহা শিখান হইবে তাহারও ভিতর জ্ঞানপিপাসার একটা প্রবল বেগ থাকিবে।

ভাব ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কার্য্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা জ্ঞানও পরিবর্ত্তিত হয়। অনেক বিষয় যাহা আমাদের নিকট অপরিহার্য্যরূপে প্রতীত হইতেছে, তাহা তখন আর তত অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা কি বৃথা কার্য্যে সময় অপব্যয় করি না? যে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্মে বা ঈশ্বরচিন্তায় সময় ক্ষেপণটাই সময়ের অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মলাভই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। সেইটীকে আদর্শ ধরিলে ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিলে আমরা কামিনীকাঞ্চনের জন্য যে সময় ব্যয় করিতেছি, তাহার যথেষ্ট সংক্ষেপ হইয়া আসিবে।

এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। কেবল কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য

বিবাহের আবশ্যকতা নাই, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক নাই। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকেই যদি আদর্শ করা যায় এবং অনেকে যদি বাল্যকাল হইতেই তাহার সাধনে কৃতকার্য্য হয়, তবে সৃষ্টিলোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া থাকেন। উপনিষদে স্থানে স্থানে যথায় সন্ন্যাসের চরমাদর্শ পাওয়া যায়, তথায় ঋষিরা বলিতেছেন, 'কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ'—আমরা সন্তান লইয়া কি করিব? অথবা 'ন ধনেন ন প্রজয়া'—পুত্র দ্বারা বা ধন দ্বারা মুক্তি হয় না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ আদর্শ অনেকে স্বীকার করিলেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে স্বীকার করিতে অসম্মত। তাঁহাদের যুক্তিগুলির মূল্য এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক্। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে যদি আদর্শ বলিয়া স্বীকার কর, তবে এক জনের পক্ষে তাহা উন্নতির কারণ হইলে অপরের পক্ষেও বা না হইবে কেন? যদি অধিকারী-ভেদ ধরিয়া অপরসাধারণকে অনধিকারীর ভিতর ফেল, তবে জিজ্ঞাস্য, তাহাদের ঐ বিষয়ে অধিকার আছে কি না, তাহা কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলে? এ বিষয়ে প্রাচীন কালের নিয়ম অর্থাৎ সকলকেই প্রথম অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধন শিখান খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যখন বয়স হইবে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি হইবে, তখন আচার্য্য বা গুরু তাহার অধিকার বুঝিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যে বা সাময়িক গার্হস্থ্যাশ্রমে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু যাহাকে গার্হস্থ্যে দীক্ষিত করা হইবে, তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বিবাহ পূর্ণব্রহ্মচর্য্যসাধনের একটী সোপান মাত্র। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে যথাসাধ্য সংযত হইয়া দু একটী মাত্র পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে—আর ইহাও সর্ব্বদা ভাবিতে হইবে যে, কবে এমন অবস্থা আসিবে, যখন কামবুদ্ধি সম্পূর্ণ অপগত হইয়া অপর স্ত্রীতে যেমন মাতৃবুদ্ধি করিতে হয়, নিজ স্ত্রীতেও তদ্রূপ মাতৃবুদ্ধি করিতে পারি। দুজনেই সেই ভগবল্লাভের পথে —মোক্ষপথে চলিয়াছি, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব,

বিঘ্ন কখনই হইব না। যদি উভয়ের সহাবস্থান বিঘ্নকর হয়, তবে পরস্পারে দূরে অবস্থান করিতে পরাঙ্মুখ হইব না এবং যত শীঘ্র ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়, তত শীঘ্র বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা যাহা বলিতেছি, তাহা কেবল পুরুষদের জন্য নহে, নারীগণের জন্যও এবং পুরুষের পুরুষ এবং নারীর নারী শিক্ষকই হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। উভয়ের কোন প্রকার সংশ্রব যত কম হয় ততই মঙ্গল, একেবারে না হইলেই ভাল।

যদি বলা যায়, প্রজোৎপাদন যদি কমিয়া যায়, তবে ত সমাজের অনিষ্টই হইবে। ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সাধারণতঃ এত বলবতী যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও তত সহজে উহা একেবারে লোপ পাইবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, ব্রহ্মচর্য্যবান্ হইলে নর নারীর ভিতর এমন বীর্য্য আসিবে যে, তাহাতে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অধিক প্রজাবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তারপর যদি এমন শুভদিন আসে যে, জগতের সকল নরনারীর ভিতর হইতে একই কালে কামভাব একেবারে চলিয়া যায়, (এই সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও) তাহাতেও মনুষ্যবংশলোপের আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা প্রাচ্য দর্শন উভয়ের প্রমাণেই আমরা এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ (Evolution theory) যদি সত্য হয়, তবে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে মনুষ্যের আবির্ভাব হইতে পারে। আর হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যোনিভ্রমণ বিশ্বাস করিলে পশুসমূহের কালে মনুষ্যরূপে উৎপন্ন হইবার কোন বাধা নাই। অবশ্য সকল মানুষের পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা এক সময়ে স্বীকার করিলে আশঙ্কা হয় বটে যে, সেই নিম্নশ্রেণীর জীবগণ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু একটী কথা ভাবিয়া দেখিলেই এ আশঙ্কার তত বলবত্তা থাকে না। ভিতরের প্রবল সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া মানুষ মানুষের জন্মদান করে আবার প্রবল ক্রোধাদিবসে মানুষ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়—

যেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে। এই জন্ম-মৃত্যুর কারণ আপাতদৃষ্টিতে মানুষই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কি আর কোন উচ্চতর শক্তি নাই? এবং সেই শক্তি স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগরূপ উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েও কি নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না? তারপর এইরূপ মনুষ্যসৃষ্টিপ্রবাহ বরাবর থাকাই ভাল, ইহাই বা কে বলিল? সৃষ্টি-টাকে হিন্দু কখনও ভাল বলিয়া স্বীকার করে না—সৃষ্টির আত্যন্তিক লয়—মোক্ষই হিন্দুর মতে পরম পুরুষার্থ। সুতরাং সকল নর নারীর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য সাধনে মানবজাতির লোপই হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা আমাদের ভয় পাইবার বিশেষ কারণ কি?

তারপর কাঞ্চনের কথা ধরা যাক্। কাঞ্চন বলিতে শুধু মুদ্রা বিশেষ বুঝিতেছি না—উহার দ্বারা লভ্য ভূমি, পশু, গৃহ, খাদ্য, বস্ত্র সবই ধরিতে হইবে। প্রথমতঃ সন্ন্যাসী হইলে যদি অর্থোপার্জ্জন ত্যাগ করা হয়, অথচ সকলকেই সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে আজ না হউক, একদিন না একদিন সমুদয় সম্পত্তির অভাব হইবে। তখন সন্ন্যাসীই বা খাইবে পরিবে কি? যতই ত্যাগের ভাব সাধন কর না কেন, একেবারে কার্য্যতঃ আক্ষরিক অর্থে সর্ব্বত্যাগে ত এক মৃত্যু ব্যতীত সম্ভব নহে।

ঠিক কথা, সম্পূর্ণ ব্রহ্মানুভূতি যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে এইরূপ ভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের আর পথ কোথায়? বুদ্ধ না হয় উহাকে 'নির্ব্বাণ' আখ্যা দিলেন, বেদান্ত উহাকে মোক্ষ বলিলেন। যাঁহাদের ভগবল্লীলাস্বাদনই জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই ভক্তগণও প্রেমের চরমাবস্থায়—মহাভাবের চরমোৎ-কর্ষে জড়সমাধিলাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইলেও ত সর্ব্বত্যাগ করিতে হয়। বলিবে, সে অবস্থা কি সম্ভবপর? আমরা কার্য্যতঃ সন্ন্যাসিগণের ভিতর কি মঠবাস, সম্পত্তি গ্রহণ প্রভৃতি দেখিতে পাই না? সন্ন্যাসীরও যে বিভিন্ন অবস্থা আছে—ত্যাগের সাধনা করিতে গিয়া যে সকল সন্ন্যাসীই চরম ধাপে উঠিতে পারেন নাই। আচ্ছা, না হয়, স্বীকার করিলাম, একেবারে শীতাতপ

সহকারী, আবাসত্যাগী, দিগম্বর সন্ন্যাসীও কোথাও কোথাও দেখা যায় কিন্তু আহার ত্যাগ হয় কি? সন্ন্যাসীর ভিক্ষা চলে কোথা হইতে? আর যদি সকলেই ভিক্ষুক হয় ত ভিক্ষা দেয় কে? যেমন কামিনী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছি, কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধেও সেই সকল কথা অনেক পরিমাণে প্রযুজ্য। প্রথমতঃ এই উচ্চতম আদর্শ প্রচার করিলেও ত সকলে এক সময়ে পূর্ণ ত্যাগী হয় না। সুতরাং সন্ন্যাসীর সামান্য অভাব পূরণের জন্য বাস্তবিক কোন ভাবনা নাই। আর যদি কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া সকলকেই পূর্ণ ত্যাগে সমর্থ বলিয়া ভাবা যায়, তবে আর একটু কল্পনা বিস্তার করিয়া যোগশাস্ত্রের সত্যতা স্বীকার করিয়া আহার ব্যতীত প্রাণধারণে সমর্থ অবস্থাই বা স্বীকার কর না কেন? কিন্তু তাহা না করিয়াও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, যদি সর্ব্বসাধারণে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা বা কোনরূপ বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে, তবে দেহের যৎসামান্য অভাব নিবৃত্তির জন্য কাহারও অভাব বড় হয় না। অতি সামান্য মাত্র চেষ্টায় পৃথিবীকে এমন ফলমূলশালিনী করা যাইতে পারে যে, তাহাতে সকলেরই ক্ষুন্নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আসল কথা, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমার যথার্থ অভাব কতটুকু? তুমি তোমার অভাব নিবৃত্তি করিতে চাও, না, বিলাসিতা চাও? বিলাসিতারও আবার মাত্রা আছে—এক অবস্থায় যাহা প্রয়োজন এমন কি অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সাধনার উন্নতি সহায়ে তাহাই পরিত্যাজ্য ও অনাবশ্যক প্রতীত হয়। ক্রমে অগ্রসর হইয়া যাও, ত্যাগের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া চরমে পঁহুছিবার চেষ্টা কর, দেখিবে, কত অল্প জিনিষে তোমার চলিয়া যায়। সর্ব্বদা মৃত্যু সম্মুখে এই কথা ভাব। দেখিবে, তোমার জগতে স্থায়ী সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। চাল যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে, যত কমাইবে, তত কমিবে। নিজস্ব বাড়ী, নিজস্ব সম্পত্তি, নিজস্ব গাড়ী ঘোড়া করিবার বাসনা চলিয়া গিয়া ভাড়া বাড়ীতে ভাড়া গাড়ীতেই সন্তোষ আসিবে—শেষে ভাড়া বাড়ী গিয়া পরের দ্বারে, পরের

দাওয়ায় একটুকু স্থান পাইলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিবে। হাঁটিয়া বেড়াইয়াই সুখী হইবে। অক্ষম হইলে একস্থান হইতে অপর স্থানে আর যাইবার আবশ্যকতাই বোধ করিবে না রেলগাড়ী, মোটর, এরোপ্লেনের আবশ্যকতা আর থাকিবে না।

ভাবিয়া দেখ, বাসনা হইতেই অভাব বোধ, অভাব বোধ হইতেই নানাবিধ চেষ্টা। যত বাসনা কমিয়া আসিবে, তত অভাব বোধ কম হইবে, ততই চেষ্টাও কমিয়া স্থিরতা লাভ করিতে থাকিবে আমাদের যে দিনরাত্র নানাবিধ চেষ্টা, এ যেন মত্ত ব্যক্তির ইতস্ততঃ ছুটাছুটি মাত্র!—যত স্থৈর্য্য আসিবে, তত আর এ সব চেষ্টা থাকিবে না।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে নানাবিধ আপত্তি উঠিতে পারে; তাহার ২।১টীর উল্লেখ করিতেছি।

১ম। সব বাসনা ত্যাগ করিব কেন? মন্দ বাসনাগুলি ত্যাগ করিব, ভাল বাসনাগুলি রাখিব।

২য়। তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে জগতের সভ্যতাই যে বিলুপ্ত হইবে।

৩য়। ইহাতে ঘোর নিশ্চেষ্টতা আসিয়া লোককে নিরুদ্যম, অলস ও হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিবে।

এই আপত্তিগুলি কেবল চিন্তাহীনতার ফলমাত্র তাহা সহজেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

১ম। মন্দ বাসনা, ভাল বাসনায় প্রভেদ কি? কিসে বাসনার ভাল মন্দর বিচার হয়? একমাত্র বিচার করিবার উপায়—যাহা ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর করে তাহাই ভাল, যাহা তাহা হইতে দূরে লইয়া যায় তাহাই মন্দ। সুতরাং আজ যাহাকে ভাল বাসনা বলিতেছ, উচ্চতর আদর্শের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মন্দ বলিতে বাধ্য হইবে। শেষে কোন প্রকার বাসনার লেশমাত্র থাকাটাকেই মন্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রসেবাদি নানা সৎকার্য্য করিতেছে, কিন্তু সে যতই জ্ঞানের

পথে অগ্রসর হইবে, ততই বুঝিবে, যথার্থ সৎকার্য্য অর্থের দ্বারা হয় না—চরিত্রের দ্বারাই হয়, চরিত্রই মূল। তুমি নিজেকে ভাল কর, তাহাতেই তুমি জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে।

২য়। সভ্যতা বিলোপের আপত্তি:—সভ্যতা কাহাকে বল? কতকগুলা বড় বড় বাড়ী, কল কারখানা এই সব? মানুষের প্রকৃতি সংযত না হইয়া ঐ সকল বাহ্য তথাকথিত উন্নতির দিকে যতই ঝুঁকিবে, ততই মানসিক অবনতি হইবে। তাই ফলমূল-ভোজী, কুটীরমাত্রবাসী জ্ঞানী ঋষিদের ভিতর যে যথার্থ সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাই, চাকচিক্যময়, ইহসর্ব্বস্ব, জড়বাদপ্রাণ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর তাহার এককণা দেখিতে পাই না। সকল বিদ্যা, সকল বিজ্ঞান যদি স্বার্থপরতার সহায় হয়, তাহাতে জগতে দ্বন্দ্ব, অশান্তি, কোলাহল, যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই আনয়ন করে,—শান্তির শীতল বাতাস তাহাতে আনে না—মানবকে উহাতে ক্রমশঃ তমোময় অজ্ঞানের পথেই অগ্রসর করে।

৩য়। নিশ্চেষ্টতার আপত্তি।—যাহার চেষ্টা উচ্চতর পথে উঠিতে একেবারে অশক্ত তাহার পক্ষে নিজাভ্যন্তরীণ ঘোর তমঃশক্তিকে প্রতিহত করিয়া প্রথমে প্রবল রজোগুণের উদ্দীপনা করা আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহাকে আবার তমোরজোগুণের সামঞ্জস্যরূপ প্রশান্তি-ধর্ম্মক সত্ত্বগুণের অভিমুখে প্রধাবিত করিতে হয়। উহার ভিতর যে রজোভাব আছে, তাহাকে কমাইয়া কমাইয়া ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব বা ত্রিগুণাতীত ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই উন্নতির ক্রম। সুতরাং উচ্চতম আদর্শের যথার্থ প্রচারের ফলে তমোগুণ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। ইতিহাস ত এ বিষয়ে আমাদের পক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ত্যাগপ্রচারের অল্পদিন পরেই ভারত ঐহিক উন্নতিতেও যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, আর কখনও তদ্রূপ হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের চরম আদর্শ 'সর্ব্বং ব্রহ্ম-ময়ং জগৎ' উপলব্ধি করা। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমা-

দিগকে প্রবল যত্ন করিতে হইবে। এই জগতের হিতসাধন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বলিতেন, চরম আদর্শে পহুঁছিবার পূর্ব্বে যে দেশে বা যে জাতিতে বর্ত্তমানে যে অভাব আছে, সেই অভাব পূরণ করিয়া তাহাকে সেই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণভাবে ভারতে অন্ন ও বিদ্যার অভাব বলিতেন এবং ক্ষুধিতের ধর্ম্মলাভ অসম্ভব বলিয়া অন্নাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা, শিল্পকলার উন্নতি সাধন করা এবং সর্ব্বসাধারণ মধ্যে লৌকিক বিদ্যা বিস্তারের চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন এবং এই সকল কার্য্যসাধনের জন্য ভারতের বর্ত্তমান সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণকেই এই স্বদেশসেবাব্রতে লাগিতে হইবে, ইহাও নির্দ্দেশ করিতেন। তবে এই সকল কার্য্যসাধন যথার্থভাবে করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে প্রবল ধর্ম্মশক্তির প্লাবন তাহার মূলে না থাকিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বলিতেন এবং সর্ব্বদা সেই চরম আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে বলিতেন। নিম্নস্তরে তমোগুণকে প্রতিহত করিয়া প্রবল রজঃশক্তির অভ্যুদয়ের জন্য পাশ্চাত্য জাতির প্রবল কর্ম্মপ্রবণতা ভারতে প্রবেশ করাইতে চাহিতেন, কিন্তু পাছে ভারত আবার বিলাসের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয়, তজ্জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে ধরিতে বলিতেন।

আমরা যে ত্যাগের কথা বলিলাম, তাহাই ভারতের ঘরের সম্পত্তি। এই ত্যাগসাধনে সিদ্ধ হইয়া সেবাব্রত সহায়ে ঐ ত্যাগ সকলের ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তথায় তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে যেমন জীবের ভোগ দ্বারা তৃপ্তি না জন্মিলে বৈরাগ্য আসে না, তদ্রূপ জাতীয় জীবনেও চরমাদর্শ ত্যাগের জন্য প্রবল উদ্যম আনিতে হইলে জাতীয় সমৃদ্ধিসাধন ও ভোগ আবশ্যক। সকলকে আদর্শ সন্ন্যাসীর পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে তাহার মূলে আদর্শ গৃহস্থ থাকাও আবশ্যক নতুবা কোন কালেই ত্যাগ আসিবে না। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ

একেবারে উড়াইয়া দিয়া কেবল ঐহিক উন্নতি সাধনের জন্য বিজাতীয় চেষ্টাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং তাহার জন্যই আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য এই মতেরই আমরা প্রতিবাদ করিয়াছি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া বা রাজাদেশে এইরূপ উচ্চতম আদর্শপ্রচারের পক্ষপাতী নহি। আমরা অধিকারিভেদ সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি। আর একথাও বুঝি যে, উচ্চতম আদর্শের এখনই সকলে অধিকারী নহে বা হইতে পারে না। আমরা যাহাকে আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলাম, অনেকে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এইরূপ জানিলেও এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের বিশ্বাস যথাযোগ্য যুক্তিসহকারে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মলাভ বা নির্ব্বাণলাভ এবং তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী পূর্ণ ত্যাগই আমাদের চরম আদর্শ এবং কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলেরই প্রাণপণ যত্নে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে কি জাতির কি সমাজের কল্যাণ বই অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। আশা—যাঁহারা আদর্শ ও তল্লাভের উপায় অকপটভাবে খুঁজিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

সংস্কৃত ভারতের নিকট নিবেদন।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

পার্থিব জগতের সকল বন্ধনই যেমন অনিত্য, রাজনৈতিক বন্ধনও তেমনই অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া একটা বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। স্থিতিশীল মানব তাহা ভাবিতে চায় না। অনিত্যকে সে নিত্য বলিয়া ধরিয়া থাকে। তবুও মানুষ যাহা ভাবিতে চায় না, অসম্ভব বলিয়া চিন্তার গতি ফিরাইয়া দেয়, মানবের ইতিহাসে কখন কখন এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। অচিন্ত্য-পূর্ব্ব ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে সকল অসম্ভব ব্যাপার মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্ভব হইয়া পড়ে। মানবের চিন্তারাজ্যে তখন বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং যতদিন পুনরায় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন উন্নতির গতি বন্ধ থাকে। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবাহে দ্রুত উন্নতির পথে চলিতে চলিতে শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া মানুষ মর্ত্ত্যধামে সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের স্বর্গসুখের কল্পনা করিতেছিল। কল্পনা-উদ্ভাসিত-দৃষ্টিতে মানুষ দেখিতেছিল সম্মুখেই সেই স্বপ্নের দেশ, সেই স্বর্গরাজ্যের শান্তিসৌধ— যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক পরিবারভুক্ত নরনারীর ন্যায় মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির দিব্যপথে চলিতে থাকিবে—পাশবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ চিরতরে অস্তমিত হইবে—বৈষম্যের উপর সাম্যের, হিংসার উপর মৈত্রীর এবং পাশবিক শক্তির উপর ন্যায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু বাস্তব-জীবনের এক আঘাতে যুগ যুগান্তরের কল্পনা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মানুষের আশার শত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। যেদিন বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, সেই দিন মানুষের চমক ভাঙ্গিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল সমস্ত পৃথিবী হৃদয়বিদারক রুধিররাগে রঞ্জিত! চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, নরহত্যা, ব্যভিচার ও প্রবঞ্চনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ

মানব মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ নারী পতি-পুত্র বিরহে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে! যুগ যুগান্তরের শিল্পকলা, শত সহস্র অট্টালিকা, মন্দির ও নগর-নগরী ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে! স্নেহ, দয়া ও ভক্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত পদদলিত করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া, ধর্ম্মমন্দির সমূহ অগ্নিবর্ষণপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া, সমাজহৃদয়-পরিমুক্ত বর্ব্বরতা জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে মানবজাতির বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে—সভ্য মানবের সভ্য দেশ এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কল্পনার স্বর্গরাজ্য অসুরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পুনরুদ্ধার হইবে কি না কে বলিতে পারে!

কিরূপে এই প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান পৃথিবীর একমাত্র চিন্তার বিষয়। দেশ দেশান্তর হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এই সমরযজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে—কর্ম্মীর কর্ম্ম, ধনীর ধন, দাতার দান, শিল্পীর শিল্প, বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় শক্তি একমাত্র যুদ্ধেরই সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মানব ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল। যুধ্যমান শক্তিসমূহের স্বার্থ-সমন্বয়ের সময় যাহাতে জাতীয় স্বার্থের কোনও ব্যাঘাত না হয়, বিস্তৃতির পথ সুগম হয়, এই চিন্তাই এখন সকল দেশে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ যুদ্ধ আর সহজে না হইতে পারে এরূপ জল্পনা কল্পনাও চলিতেছে। স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠায় লোকের যতই সন্দেহ থাকুক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে রাজনীতিকুশল পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য জাতিসকলের স্বার্থের একটা সুব্যবস্থা করিয়া সাময়িক শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

এত বড় একটা যুদ্ধের ফলসমষ্টি যদি শুধু আমাদের আর্থিক অবস্থারই সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটাইয়া নিঃশেষিত হইত, তাহা হইলে কাহারও বিশেষ আপত্তি ও আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত না। যুদ্ধটাকে লোকেরা দৈনন্দিন কাজের মতই একটা সাধারণ ব্যাপার

বলিয়া মানিয়া লইত এবং শীঘ্রই ভুলিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফল সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। যে অমানুষিক বর্ব্বরতা বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মানবজাতির অন্তর্জীবনের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে। পাশবিক বলের প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া, আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। সভ্যতার উপাস্য আদর্শ কলঙ্কিত করিয়া, মানব হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি যে প্রবল আঘাত করিয়াছে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মবিপ্লব ও নৈতিক-বিপ্লব।

বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মবিপ্লব মানবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মৃদু করাঘাত করিতেছে, কালে তাহাই ভীষণরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। এই আসন্ন ধর্ম্মবিপ্লব এখনও স্বীকৃত হয় নাই। তাহার গতিরোধের কোন উপায়ও উদ্ভাবিত হয় নাই। বাহ্য জীবনের ব্যাপার, বাহ্য জগতের ঘাত-প্রতিঘাত কতকটা রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে; কিন্তু অন্তর্জগতে ত রাজনীতির প্রবেশ নাই—সুখদুঃখময় মানবজীবনের অল্পাংশের উপরই রাজনীতির প্রভাব। অধর্ম্মের গতিরোধ করিতে একমাত্র ধর্ম্মই অবলম্বনীয়। পাপের স্রোত ফিরাইতে হইলে পুণ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাম্য স্থাপন করিতে হইবে ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক বৈষম্য ও আধ্যাত্মিক অবনতিই বাহ্য জগতে যুদ্ধবিগ্রহাদি রূপে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বন্ধন সাময়িক প্রলেপ মাত্র। কোথায় সেই প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট যাঁহার স্বর্গরাজ্যের অস্তিত্ব আজ সন্দেহের কুজ্ঝটিকায় অদৃশ্য হইতে চলিল!—সেই সুদর্শনধারী পার্থসারথিই বা কোথায় যিনি অধর্ম্মভীত মানবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ধর্ম্ম যে আজ প্রাণভয়ে কম্পিত ও পলায়নপর!

রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ যাহাই নির্দ্দেশ করুন, রাজন্য ও ক্ষাত্রশক্তি যাহাই অবধারণ করিতে যত্নপর

হউন, সাময়িক ইতিহাসে ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বর্ণিত হউক এবং ঐতিহাসিক বিচারে জাতি-বিশেষের যুদ্ধের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ যতই নিপুণতার সহিত নির্দ্ধারিত হউক না কেন, ধর্ম্মের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহা জাতিসমূহের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরতার পুনরুত্থান মাত্র। ধর্ম্মের চক্ষে এই বাহ্যবিপ্লব অন্তর্জগতের বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। স্বর্গরাজ্যের চিরশত্রু সেই প্রাচীন অসুর—হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতা যাহার প্রাণ এবং মানব-হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ যাহার বাসস্থান,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বিচিত্র বিলাসোপকরণ নির্ম্মাণ, বিভিন্ন প্রকারের স্থলযান, জলযান, ব্যোমযান আবিষ্কার, বৈদ্যুতিক উপায়ে বার্ত্তাবহন এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানার বিস্তাররূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রবাহের তরঙ্গাঘাতে গতাসু হয় নাই—মূর্চ্ছিত হইয়াছিল মাত্র। আত্মাভি-মান ও স্বার্থপরতা, ভোগতৃষ্ণা ও দেহাত্মবুদ্ধি তাহার নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছে এবং মানব-সমাজ পূর্ণ দিবালোকে নিজের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরতার নগ্নমূর্ত্তি দর্শনে নিজের যথার্থ পরিচয় পাইয়া বিস্ময়, বিষাদ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য জীবনের চরম লক্ষ্য ভোগ। সংসার তাহার চক্ষে একটা ভীষণ সমরক্ষেত্র—সকলেই যেন এখানে শত্রুমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার ভোগের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং সর্ব্বদাই তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করাই তাহার জীবনের সফলতা। অন্যের ভোগে তাহার হৃদয় হিংসায় জর্জ্জরিত। কাজেই সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে। জড়শক্তির খেলায় সে অদ্বিতীয়। যুদ্ধ তাহার ক্রীড়ার বিষয়। যে এই বিলাসক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ সে অসভ্য, বর্ব্বর। এই যুদ্ধের সেবায়ই পাশ্চাত্য জাতির শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক উন্নতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অমৃত যে বিজ্ঞান, যুদ্ধেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। আজিও ত বিজ্ঞান নরহত্যার যন্ত্র-উদ্ভাবনের সাধনায় মগ্ন। এই যুদ্ধের ভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমাজও এই যুদ্ধের ভার হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসই তাহার নিদর্শন। জার্ম্মানীর ক্ষাত্রসমাজে ও বিদ্বৎসমাজেও ইহা স্বীকৃত যে যুদ্ধই উন্নতির মূল এবং মানবজীবনের মহৎকর্ম্ম। যে জাতিসমূহের আন্তরিক ভাব এইরূপ ভীষণ যুদ্ধই যে তাহাদের পরিণাম ইহা ভাবিতে পারা যায়।

একে ত জাতিহৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ। তাহার উপর যদি উন্নত জ্ঞানও সেই অবস্থার অনুমোদন করিয়া সাহায্য করে, তবে ত তাহা আরও শোচনীয় হইবার কথা! মানুষ যদি উন্নত-জ্ঞানের সাহায্যে তাহার স্বাভাবিক হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কর্ম্মে সফলতা লাভ করিতে যত্নপর হয়, তবে যে সে কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞানের উপদেশ—জীবজগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। সেই জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বলের বিনাশ এবং যোগ্যতমের প্রভুত্ব লাভ। ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মহতী নীতি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডারউইন এই সত্য উদ্ভাবন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। শক্তিশালী জাতিই জীবিত থাকিবে দুর্ব্বল জাতির থাকিবার অধিকার নাই—এই নীতিই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

ডারউইনের সময় হইতে ইউরোপের জ্ঞান এই কঠোর নীতি দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির নিম্নতম বিকাশে যে অন্ধশক্তি কাজ করিতেছে, উচ্চতম বিকাশে—অনন্তভাবসম্পন্ন মানবে সেই অন্ধ-শক্তি কিরূপে নিয়মিত ও সংযমিত হইয়া মানবহৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হইয়া চলিতেছে এবং কিরূপেই বা যোগ্যতমের মাপকাঠি স্থূল বাহ্যশক্তি দ্বারা পরিমাপিত না হইয়া সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পরিমিত হইতেছে, ইউরোপের জ্ঞান এ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। মানবের জ্ঞান স্বভাবতঃ তাহার বাসনারই অনুগমন করিয়া থাকে এবং যে জ্ঞান পৃথিবীর কল্যাণের

নিমিত্ত নিয়োজিত হইতে পারিত, পাশ্চাত্য জাতি তাহাই স্বীয় স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে।

পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিতে হইলে, মানবজাতির উন্নতি কামনা করিতে হইলে এবং অধর্ম্মের গতি রোধ করিতে হইলে, উচ্চতর জ্ঞান ও আদর্শের প্রচার দ্বারা মানবমন হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থমলিন বাসনার বীজ দূরীভূত করিতে হইবে এবং মানবজাতিকে বুঝাইতে হইবে যে বিশ্ব-মানবের কল্যাণেই জাতিবিশেষের কল্যাণ। সমগ্র মানবজাতির উন্নতিতে জাতিবিশেষের উন্নতি। জাতিবিশেষের স্বার্থ, সকল জাতির স্বার্থের বিরোধী ত নয়ই—বরং অনুকূল সাম্য ও মৈত্রীই মানবজাতির কল্যাণের পথ। জীবন-সংগ্রাম সত্য দর্শনের জন্য,—ভোগের জন্য বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিবার জন্য নহে। ভোগই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। মানবজীবনের সার্থকতা জ্ঞানে। এই সকল বিশ্বনীতি প্রচার করিতে হইলে উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর আদর্শের প্রয়োজন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন। একমাত্র সংস্কৃত-ভারতই জ্ঞান ও প্রেমের সেই দিব্য জ্যোতিঃ মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিনিধি ও পরিরক্ষক সংস্কৃত-ভারতই উচ্চতর আদর্শ প্রচার করিয়া অধর্ম্মের গতি রোধ করিতে সমর্থ।

ইউরোপের ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদের নিষ্পেষণে হতবল ও গলিতনখদন্ত হইয়া মৃতপ্রায়। বৈজ্ঞানিক মিথ্যাদৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার সামর্থ্য ও তদনুরূপ সাধনা তাহার নাই। কালে হইবার আশাও সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান ইউরোপ প্রবল তমঃপ্রধান রজোগুণ দ্বারা চালিত হইতেছে—তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্মের সেই সাত্ত্বিকতা ও সেই অতীন্দ্রিয় সিদ্ধি কোথায়, যদ্দ্বারা এই প্রবৃদ্ধ রজোগুণ প্রশমিত হইতে পারে? যে তামসিক ভাবের উচ্ছ্বাস মানবজাতির বক্ষে নৃত্য করিতেছে, সত্ত্বগুণের প্রবল প্রতিঘাত ভিন্ন

তাহার বিনাশ অসম্ভব। তমোগ্রস্ত মানবজাতিকে পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, তাহার পক্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবহাওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সত্ত্বগুণের সনাতন বিদ্যুতাধার—বিশ্বের মঙ্গলঘট সংস্কৃত-ভারতে সুরক্ষিত রহিয়াছে। জগতে তাহার প্রয়োজন অতুলনীয়।

সংস্কৃত-ভারতের সনাতন আদর্শ দেব-জীবন লাভ। তাহার লক্ষ্য মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। উপায় জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম। অহিংসা তাহার পরম ধর্ম্ম। মানবকুল তাহার দৃষ্টিতে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। সংসার তাহার সাধনার তপোবন। তাহার জীবন নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বৈর কর্ম্মের যোগবদ্ধ ধারা। ইহাই বেদের ব্রহ্মবাণী, দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত, কাব্যের মহান্ সঙ্গীত এবং ইতিহাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। সংসারের নিখিল পরিবর্ত্তন প্রবাহের মধ্যে ইহাই তাহার নিকট জীবন্ত সত্য। রাজশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির কথা ত তাহারই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যারণ্যে আমরণ পরিভ্রমণ কর, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির বা অশোকের মত রাজা আর কোথায়ও পাইবে না। বিশ্ববিধাতার এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ভারতেই সম্ভব। যে দেব-আদর্শ এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে, বর্ত্তমান কালে জগতে তাহারই প্রচার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যে জাতি বিশ্বজীবনের যে বিভাগে যতটা মন একাগ্র করিতে পারিয়াছে, সে জাতি সেই বিভাগে ততটা সফলতা লাভ করিয়াছে। কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য, কেহ বা বিজ্ঞানাদি বিদ্যার সাধনা দ্বারা মানব জীবনরূপ মহাকাব্যের বিভিন্ন রসমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানবসভ্যতার শৈশব যুগ হইতে ভারত তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে দেব-জীবন লাভে, জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বরহস্য ভেদ করিয়া অতিমৃত্যুত্ব—অতিমানবত্ব লাভে। ফলে, মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও চিরগৌরবের আস্পদ—জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিতে তাহার সিদ্ধি অতুলনীয়। ভারতীয় জীবন অন্যান্য বিভাগ উপেক্ষার

চক্ষে দেখিয়াছে, এমন নহে। এখনও তাহার প্রাচীন শিল্প ও বিদ্যা-সমূহের ধ্বংসাবশেষ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান সময় ধর্ম্ম ও নীতি পদদলিত করিয়া বিশ্বসভ্যতার যে গ্লানিকর অঙ্গহানি করিয়াছে, মানবজাতির চির আশা ও আকাঙ্ক্ষার আস্পদ সেই অংশ পূর্ণ করাই ভারতীয় সাধনার কর্ম্ম। স্বার্থসমুদ্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে যে নৈতিক বিপ্লবের বিষ আবির্ভূত হইয়াছে, ভারতের নীলকণ্ঠ শিব ব্যতীত আর কে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ ও অগ্রসর হইবে। অতএব সংস্কৃত-ভারতের নিকট নিবেদন যে, তিনি মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার দেব-আদর্শ-প্রচারকার্য্যে ব্রতী হউন।

আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশ জাতীয় জীবনের প্রাণ কিন্তু আত্ম-প্রচারে সে জীবনের চরম সার্থকতা। সেই সাধকেরই সার্থক সাধনা, যিনি আপনার সিদ্ধি মাথায় করিয়া বিশ্বমানবের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করেন এবং তাহার সেবায় উৎসর্গ করেন। যে জাতির যাহা সাধনা ও সিদ্ধি, তাহার প্রচার ও বিস্তারেই সেই জাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। নব্য ভারতের বীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভারতের প্রতিনিধি হইয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার আদর্শ প্রচার করিলেন। ভারতরবির সে উজ্জ্বল দীপ্তি মহাসাগর পারস্থ ভূখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া আবার ভারতে পতিত হইল। আমাদের আঁধার কুটীর কথঞ্চিৎ আলোকিত হইল। সেই অস্ফুট আলোকে আমরা আত্মপরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। জড়দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিলাম। সুদীর্ঘ কাল আত্মগোপনের ফলে ভারতীয় জীবনে সঙ্কীর্ণতার যে একটা বিপুল জড়তা আসিয়াছে, উক্ত আত্মপ্রচারে তাহা দূরীভূত হইতে পারে। এই উপায়েই জাতীয় আদর্শের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব প্রকটিত করিয়া জাতিদেহে নব জীবনের বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। সেই প্রাণস্পন্দনই জাতীয় জীবনে গতিশক্তি প্রদান করিয়া আমাদের অনন্ত উন্নতির পথ সরল করিয়া দিতে পারে।

কোথায় সেই সংস্কৃত-ভারত—আর কোথায় সেই সংস্কৃত-ভারতের প্রতিনিধিগণ, যাঁহারা মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিরে বহন করিয়া সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন এবং দেশ বিদেশের নরনারীর প্রাণে জ্ঞানের দিব্য আলোক আনয়ন করিয়া নবযুগপ্রবর্ত্তনের সহায় হইবেন। দারিদ্র্যের ঘোর নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হইলেও রত্নপ্রসূ ভারতমাতা কখনই সুপুত্র লাভে বঞ্চিতা হন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান যাহাদিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষার নয়নে দেখিতেছে, তাহাদেরই মধ্যে এখনও বুদ্ধ ও চৈতন্যের আত্মা আহ্বানের প্রতীক্ষায় সুপ্ত রহিয়াছে। স্বর্গচ্যুত দেবগণের ন্যায় এখনও ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ঋষির আত্মা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

হে সংস্কৃত-ভারত, তোমার সেই প্রিয়তম সন্তানগণকে একবার আহ্বান কর। তোমার শত শত সন্তান চতুর্দ্দিকে ধাবিত হউক এবং পৃথিবী ব্যাপিয়া তোমার দেব-আদর্শ প্রচার করুক। তোমার অমৃতবাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হউক। দধীচি মুনির মত তোমার তপস্যাময় জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে উৎসর্গীকৃত হউক, জগতে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক এবং তোমার চিরকল্যাণময় নাম চিরতরে ধন্য হইয়া থাকুক। তুমিই ত একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে ধর্ম্ম ও নীতির শান্তিবারি বর্ষণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলে—হিংসাপ্লাবিত জগতে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলে। নৈতিক বিপ্লবের দুর্দ্দিন আবার পৃথিবীতে উপস্থিত। আবার তোমাকে ভিক্ষুবেশ ধারণ করিতে হইবে, আবার পৃথিবীকে জ্ঞানালোকে প্লাবিত করিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্বভার ত তোমার উপরই পতিত হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হও, তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বিশ্বমানবত্ব ও বিশ্বপ্রেমিকত্বের আদর্শ লইয়া, তোমার সাধনা ও সিদ্ধির মঙ্গলবার্ত্তা লইয়া বিশ্বমানবসমাজে উপস্থিত হও। তোমার কুলধর্ম্ম পালন করিয়া অতীত জীবনের গৌরব ও বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ

কর। তোমার সমস্ত দৈন্য, সর্ব্বপ্রকার বিফলতা, সফলতার অঙ্গাভরণ হইয়া থাকুক এবং তোমার বৃহত্তরজীবনলাভের সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হউক। সম্মুখে বিশ্বমানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর অমূল্য জীবন দেখিয়াও কি এখনও নিশ্চেষ্ট থাকিবার অবসর আছে? বিশ্বনাথের বিরাট্ মূর্ত্তির পার্থিব সংস্করণ বীরেশ্বর বিবেকানন্দের পিণাক ঐ শুন গর্জ্জন করিয়া তোমায় চির-শান্তির রাজ্যে আহ্বান করিতেছে:—"Once more the voice, that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the "Father of Mountains," and descended upon the plains through Krishna, Buddha and Chaitanya in all carrying floods, has spoken again—Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once more."*

---

* যে বাণী প্রাচীনকালে সরস্বতীতীরে ঋষিদিগের কর্ণে মহামন্ত্র শুনাইয়াছিল—যে বাণী পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যপ্রমুখ অবতারগণের আবির্ভাবে ভীষণ জলপ্লাবনের ন্যায় ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল—সেই বাণী আবার ঘোষিত হইয়াছে—"স্বর্গদ্বার আবার উন্মুক্ত হইয়াছে—তোমরা জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর।"

ভক্তের ভগবান্।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী)

ভগবান্ কে? তিনি কিরূপ, তাঁহার স্বরূপই বা কি তাহা জানি না। তবে শাস্ত্র বলেন তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। রসস্বরূপ পরমাত্মা সৃষ্টির অতীত—বুদ্ধির অগম্য। চিন্তায় সেই অচিন্ত্যরূপের দর্শন হয় না—তর্কে তাঁহাকে মিলে না—তিনি কেবল ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়েন।

ভক্তি জগতে কে না করে? সকলেই পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ভক্তি লৌকিক, এ লৌকিক ভক্তি দ্বারা সে অলৌকিক ধনকে পাওয়া যায় না।

মানুষ যখন বুঝিতে পারে, এ সংসার-নাট্যশালা সুখের নয়, দুঃখের আগার—মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে দিন দিন তাহার জীবনপ্রবাহ বহিয়া কালসিন্ধুর দিকে ধাবিত হইতেছে—তাহার প্রমোদের নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আর যখন সে সংসারের ত্রিতাপে তাপিত হইয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করে তখনই তাহার হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যতদিন সে সংসারের দুর্ব্বিষহ কষাঘাতে জর্জ্জরিত না হয় যতদিন তাহার মন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত না হয়, ততদিন তাহার উপর ভগবানের দয়া হয় না অথবা সে সদ্‌গুরুরও দর্শন পায় না।

প্রথমাবস্থায় ভগবানের নাম শ্রবণ, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ, তাঁহার বিগ্রহাদির পূজা, তাঁহার অর্চ্চনা বা বন্দনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন হৃদয়ের পাপরাশিকে ধৌত করিয়া তবে উচ্চাঙ্গের ভক্তির অধিকারী হইতে হয়।

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
> অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে তাঁহার নামের মহিমা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিতদেহ রাজা পরীক্ষিত কেবল সাতদিন মাত্র তাঁহার নামসুধা সেবনেই মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌কে তরণী করিয়া ভক্তচূড়ামণি শুকদেব স্বয়ং নাবিক হইয়া তাঁহাকে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার করিয়াছিলেন। এই নামের বলেই পবননন্দন অনন্ত পারাবার এক লম্ফে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নাম শ্রবণ করিতে করিতে উহাতে রুচি হইবে। তখন ভক্তিগদগদচিত্তে উহার কীর্ত্তন করিতে হইবে। যেখানে কীর্ত্তন-যেখানে সঙ্গীত সেইখানেই তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।"

আমরা মনে করি, ভগবান্ শুধু বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন—তাহা নহে। যেখানেই ভক্তকণ্ঠে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয় তিনি সেইখানেই অধিষ্ঠান করেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, কিংবা যোগীদের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নামকীর্ত্তন করে আমি সেই স্থানেই থাকি।

তাঁহার এই কীর্ত্তনের মহিমা বুঝিয়াছেন বলিয়াই দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া নাচিয়া নাচিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন, আর তাঁহার মোহিনী বীণা হইতে আনন্দ-কণা নিঃসৃত হয়—

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারি।
মাধব মনমোহন মোহনমুরলীধারি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার॥"

এই ভাবে বিভোর হইয়াই পাগল ভোলা শ্মশানে মশানে ডমরু-ধ্বনি করিয়া ফেরেন।

এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের মনে ভগবানের স্মরণ মনন

করিবার ইচ্ছা হইবে। তাঁহার কোটীশশীবিনিন্দিত চিদ্ঘনরূপের চিন্তা করিয়া—ঐ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ত ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ মত্ত হস্তীর পদতলে পড়িয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যে ভক্তাধীন—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার ত কেহ দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই। যে তাঁহাকে ভক্তিভরে ভজনা করে তিনি তাহাতেই বিরাজ করেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

ভক্ত শুধু শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ মনন করিয়াই তৃপ্ত হন না। তিনি তাঁহার পাদসেবন করিতে চান। তাঁহার বিগ্রহাদির সেবা করা, তাঁহার মন্দিরাদি মার্জ্জনা করা, ভক্তিভাবে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা ও পাদপদ্মে প্রণাম করা—ইহাই তাঁহার পাদসেবন। পূতসলিলা কলনাদিনী জাহ্নবী যে চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মশাপদগ্ধ সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন—বলিরাজা যে চরণ লাভের আশায় অমরাবতী ত্যাগ করিয়া পাতালবাসী হইয়াছিলেন—সততচঞ্চলা কমলা যে পদের লোভে অচলা হইয়া তাঁহার চিরদাসী হইয়া আছেন, সেই যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত চরণ-সরোজ হৃদিকমলাসনে ধরিতে পারিলেই ত অরুণোদয়ে তমোরাশির ন্যায় মনের আঁধার দূর হইবে। পাদসেবনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁহার অর্চ্চনা করা চাই। পত্র, পুষ্প, ফল, নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার স্থূল রূপের পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে ভক্তিভরে যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহা যে তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

এই পূজায় রতি থাকাতেই পৃথুরাজা ঘোর বিপদ্‌সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তকালে সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। দয়াময় ভগবানের দ্বার ভক্তের জন্য চির অবারিত। যখনই ভক্ত তাঁহার শরণাগত হয়, তখনই তিনি তাহার সকল ভয় দূর করিয়া তাহাকে মুক্তির পথের

পথিক করেন। কৃষ্ণভক্ত অক্রুর বিপৎসঙ্কুল কংসপুরীতে থাকিয়াও কেবল কৃষ্ণাভিবন্দনপ্রভাবে সমুদয় বিপন্মুক্ত হইয়া অন্তে ভগবদ্ সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন।

আমরা এই বৈধী ভক্তির সোপানসমূহ ত্যাগ করিয়া একেবারেই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে চাই। প্রথম ভাগের বর্ণপরিচয় না হইতেই আমরা কালিদাস, ভবভূতির গ্রন্থাবলী পড়িবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাহাতে না হয় আমাদের বর্ণপরিচয়, না হয় আমাদের কালিদাসের কাব্যামৃতরসাস্বাদন। বস্তুতঃ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে গেলে সাধারণতঃ আগে তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দনা, অর্চ্চনা প্রভৃতি দ্বারা বৈধী ভক্তির সাধনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে হয়।

এই রাগাত্মিকা ভক্তি কি সহজ? আগে বৈধী ভক্তির "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্" প্রভৃতি সমাপনান্তে ভক্ত যখন এই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হয় তখন তাহার কি আর মানাপমানের ভয় থাকে? সে উন্মত্তের ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া কখন হাস্য করে—কখন উচ্চৈঃস্বরে ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করে—কখন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে।

শুকদেব পথ দিয়া চলিতেছেন—বালকেরা পাগল বলিয়া তাঁহার গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে। আত্মারাম শুকদেবের বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। কেন থাকিবে? তিনি যে রাগাত্মিকা ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন—তিনি যে পূর্ণকুম্ভ! এ অবস্থায় প্রাণ আর কিছু চাহে না—চাহে কেবল দিবানিশি তদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে। তখন ভক্তের প্রাণ বলে—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥

হে ভগবন্, আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু করি তাহা তোমারই পূজা।

এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে—সে বলে "আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি তুমি আমার। তুমি সুন্দর, আহা, তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য্য-স্বরূপ। মন, তুমি সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্ পরম সুন্দর, তুমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস।"

এই রাগাত্মিকা ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভাবিতেন এবং সমুদ্র দেখিয়া যমুনা বোধে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়া রাধারাণী নেত্রে অঞ্জন লেপন করিতেন—কেননা জগৎ তাহা হইলে কৃষ্ণময় দেখাইবে। এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে ভক্ত ভগবানের উপর এক অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলে। সে তাঁহার উপর মান করে—রাগ করে—জোর করে—যেন ভয়ের লেশমাত্র নাই। এইরূপ ভক্তিজনিত হৃদয়ের বলেই যখন ভগবান্ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন তখন সুরদাস বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাদিতি কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

তুমি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আর পৌরুষ কি? যদি তুমি হৃদয় হইতে যাইতে পার—তবেই তোমার পৌরুষ বুঝি।

ভগবানকে যে যে ভাবেই পাইতে ইচ্ছা করে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। তুমি ভগবানের দাসানুদাস হও, তুমি তাঁহাকে পাইবে—আবার তুমি তাঁহাকে বন্ধু, সখা, সহচরভাবে চাও, তুমিও তাঁহাকে পাইবে।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র বনবাসী হইলে তাঁহার জটাবল্কল গুহকের আর সহ্য হইল না। তিনিও জটাবল্কল-ধারী হইয়া বনবাসী হইলেন। ভক্ত যে, সে কি ভগবানের দুঃখ সহ্য করিতে পারে? একবার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাইতেছেন, পথিমধ্যে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার হস্তে শাণিত তরবারি। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই তরবারি লইয়া কোথায়

যাইতেছ? সে বলিল, আমি এই তরবারি দ্বারা তিন জনের প্রাণনাশ করিতে যাইতেছি। প্রথমে কাটিব অর্জ্জুনকে—সে আমার কৃষ্ণকে তার রথের সারথী করিয়া বড় কষ্ট দিয়াছে। দ্বিতীয় কাটিব প্রহ্লাদকে—সে আমার প্রভুকে বিষ খাওয়াইয়াছে। তৃতীয় কাটিব বলিকে—সে আমার প্রাণধনকে তাহার দ্বারের দ্বারী করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবানকে যে যে ভাবেই ডাকে—যে ভাবেই দেখে তাহাতেই তিনি খুসী। গুহক জাতিতে চণ্ডাল, তিনি তাঁহাকে "মিতে" বলিয়া ডাকিতেন—ভগবান্ তাহাতেই খুসী। যশোদা গোপনারী। যশোদা তাঁহাকে পুত্রভাবে দেখিতেন—বকিতেন—কত তিরস্কার করিতেন, ভগবান্ তাহাতেই সন্তুষ্ট। আবার ব্রজবালাগণ তাঁহাকে স্বামী, পতি, কান্তভাবে দেখিত; ভগবান্ তাহাদের সহিত সেই ভাবেই বিহার করিতেন। তাহারা ব্রজবাস চাহিত না—পীতবাস হরি যে তাহাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাহারা মানসম্ভ্রম, কুল, শীল বিসর্জ্জন দিয়াছিল—অকুলকাণ্ডারী যে তাহাদের হৃদয়ের রাজা। যে বাঁশীর মধুর তানে বৃন্দাবনে আনন্দ-লহরী ছুটিত—বনপশুগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ থাকিত—সেই বাঁশীর মধুর তান তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের কৃষ্ণানুরক্তি লৌকিক নায়ক নায়িকার প্রেমের ন্যায় ছিল না। এই কান্তাসক্তির পূর্ণত্ব আমরা শ্রীরাধিকায় দেখিতে পাই।

নদী-বক্ষে-ভাসমান লৌহযান যেমন অয়স্কান্তগিরি সমীপে আসিবা-মাত্র খণ্ড বিখণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ সাধনা দ্বারা ভগবানের দিকে মন আকৃষ্ট হইলে অবিদ্যা, অহঙ্কার প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং দেহ মন সেই ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়।

লীলাময় হরি ছল করিয়া বলির ত্রৈলোক্যাধিকার হরণ করিয়া ছিলেন, কই তাহাতে ত বলিরাজের দুঃখ হয় নাই, তিনি সানন্দ-হৃদয়ে নিজের মন প্রাণ দেহ পর্য্যন্ত সেই বিশ্বরূপের চরণে সমর্পণ

করিয়া পাতালবাসী হইলেন। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যদি তাঁহার সেবায় ব্যয়িত না হইল তবে জীবনধারণে প্রয়োজন কি? কর্ম্মকারের ভস্ত্রাও ত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে।

বৈধী ভক্তি সাধনের দ্বারা যখন ভক্তের অবিদ্যা অহঙ্কারাদি তাঁহার ভাব-সাগরে ডুবিয়া যায় তখন সে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে সেই দিকেই দেখে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী নাম জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—রবিশশী তাঁহারই তেজোরাশি দানে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে—অভ্রভেদী হিমাচল তাঁহারই ধ্যানে সতত মগ্ন—জাহ্নবী যমুনা তাঁহারই করুণাকণা বহিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে—পিককুল কুহুরবে প্রাণ মাতাইয়া তাঁহারই আনন্দামৃত বর্ষণ করিতেছে—অলিকুল গুণ গুণ স্বরে তাঁহারই গুণ গাহিতেছে। সে দেখে তাঁহার মহিমার অন্ত নাই।

আবার এদিকে দেখ, যাঁহার অনন্ত মহিমা বেদাগম প্রকাশ করিতে পারে না, সেই ভগবান্ ভক্তের নিকট অনুরাগশৃঙ্খলে বাঁধা। ভক্তের মহিমা বিস্তারের জন্য তিনি ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—দাস হইয়া গোপাঙ্গনাগণকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন।

আমরা যে যতই "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" বলিয়া ভগবানের নামরূপকে উড়াইয়া দিতে চাহি না কেন, যাঁহার মন তাঁহার প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে তিনি তাঁহাকে "সাকার" বলিয়া না মানিয়াই পারিবেন না। জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপে ভারত উদ্ভাসিত করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও মহাজ্ঞানী বেদব্যাসের অন্তরে শান্তি আসিল না। তাই তিনি গুণময়ের কীর্ত্তিকুসুমরাশি কবিতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া ভক্তিচন্দন মাখাইয়া তচ্চরণে অর্পণ করিলেন।

যখন কীর্ত্তনাদি বিধি-সাধ্য নানা বৈধীভক্তির দ্বারা ক্রমে রাগাত্মিকা ভক্তিতে উপস্থিত হইয়া সাধক শান্ত, দাস্যাদি যে কোন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে করিতে সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করে তখনই তাহার মন সেই ভাবময়ের ভুবনমোহন রূপ গুণ দেখিতে

দেখিতে তন্ময় হইয়া উঠে—তখন সে আর তাঁহাতে ও নিজেতে কোন প্রভেদ দেখে না। ইহাকেই তন্ময়াসক্তি বা ভাবসমাধি কহে। মহাভাগা গোপীদের ঐ অবস্থা হইয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহাদের অহংজ্ঞান ছিল না, ততক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন তখনই পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

আর ভক্ত যদি ভগবানের নির্গুণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া ঐ ভাবের চিন্তা করিতে করিতে 'অহংজ্ঞানশূন্য হয় তবে সমুদায়ই তাঁহার নিকট নামরূপে অবিভক্ত এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হয়'। ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি বা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধি।

হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন"

—সাধক কবির এই কথা যেমন স্মরণ হয়, দেখি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অখিল প্রপঞ্চ যেন চমকে সেই মায়ের রূপসাগরে বিম্বপ্রায় মিশিয়া যায়—আর আত্মারাম আত্মহারা হইয়া আমি কৈ! আমি কৈ! করিয়া শেষে অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা আভাস মাত্র—ভ্রমরশিরোপরি গন্ধের ন্যায় সাধককে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এ বোধে-বোধ চিরকাল ব্যর্থ অনুসন্ধানের জন্য কে যেন রাখিয়া দিয়াছে। এ আভাস বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—স্মৃতিপটে থাকে শুধু জ্ঞান ও অজ্ঞানে মিশ্রিত কোন্ সুদূর জীবনের অপূর্ব্ব স্বপ্নবৎ বোধ। আব্রহ্মকীটাণু সকলেরেই ভিতর সেই সান্দ্রানন্দের আভাস

বিদ্যমান, আর সেই আনন্দটী ঠিক ঠিক ধারণা—ঠিক ঠিক উপলব্ধি না করিতে পারায়, তাহাদের প্রাণের পিপাসা যেন কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই তাহারা কেবল এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিয়া সারা হইতেছে, আর কখন এটা কখন সেটাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাণের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানব নিশ্চয় করিয়া একবার একটী আদর্শকে ধরে কিন্তু পরক্ষণে যখন সে ঐ আদর্শের নিকট পৌঁছায় তখন দেখে, সে যাহা চাহিয়াছিল ইহা তাহা নহে—তাহার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী, আরও উচ্চ।

সচ্চিদানন্দের অস্ফুট স্মৃতির প্রেরণায় মানব কিছুতেই স্থির নয়, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয়। আনন্দময়ীর চিদানন্দময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাই-বার তাহার আমরণ চেষ্টা। এই আমরণ চেষ্টার ফলে সৎ ও অসৎ কার্য্যের বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। যে প্রচেষ্টা মানবের অন্ত-র্নিহিত সচ্চিদানন্দের বিকাশক এবং যে প্রচেষ্টা সেই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় বা সেই শক্তির আবরক তাহাকেই আমরা সদসৎ কর্ম্ম বলি। সকলেই সেই পরমানন্দের চেষ্টায় ধাবিত সত্য—কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই বিপথ অবলম্বন করিয়া ক্ষণিক সুখে বিভোর। যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি দেখেন যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা সুখ তাহাই অমৃত—অল্পে সুখ নাই, যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য। তাই তাঁহারা বৃহতের অনুসন্ধান করেন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা জীবের জাত্যন্তরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা ভূমার অনুসন্ধান করেন তাঁহারা মানব হইতে দেবত্ব প্রভৃতি ক্রমোচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন, আর যাহারা তল্লাভ-চেষ্টায় অন্যপথগামী হইয়া ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য ক্ষুদ্র সুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তাহারাও প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ গতি নিম্ন হইতে নিম্নাভিমুখীই হইয়া থাকে; জীবাত্মার বাসনানুযায়ী এই দেহরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি। যাহার মনে পশুপ্রবৃত্তি প্রবল তাহার দেহও সেই প্রবৃত্ত্যনুযায়ী পশুবৎ হইয়া

থাকে, কারণ, উচ্চধ্যানপরায়ণ শুদ্ধসত্ত্ব শরীর দ্বারা কুক্কুরসুলভ পরিতৃপ্তি লাভ অসম্ভব।

ভিতরে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। উহার বিকাশ করিতে হইলে নানা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে সেইগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। কারণ, যুগযুগব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা ঋষিগণ তাহাদের সত্যতায় নিঃসংশয় হইয়াছেন। ঋষি-আবিষ্কৃত সেই সত্যসকল যে জাতি যত পরিমাণে জীবনে পরিণত করিয়াছে সে জাতি জগৎসমক্ষে তত্ই গরীয়ান্। তবে দেশকালপাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিধি-নিষেধেরও সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন আবশ্যক—তাই যুগপ্রয়োজন বুঝিয়া অবতারকল্প মানবগণ ঠিক্ সময়ে আবির্ভূত হইয়া বিধিনিষেধসমূহকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তোলেন। যাহারা এই সকল না মানিয়া সেই পুরাতনে আসক্ত থাকে তাহাদের বিনাশ অনিবার্য্য। এই জন্যই দেখা যায়, ক্ষুদ্র জাতি জগতে আধিপত্য বিস্তার করে আবার অতি প্রবল জাতিও কালের অতল জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

জাতীয়-জীবনে যাহা সত্য, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাই। আমরা দেখিতে পাই এই ব্যক্তিগত জীবনে কারণ কার্য্য প্রসব করে, পরে সেই কার্য্য কারণস্বরূপ হইয়া অপর কার্য্য প্রসব করে। এই কার্য্যকারণের আইনানুযায়ী ব্যক্তিগত-জীবনের কারণগুলি সমষ্টীভূত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনরূপ কার্য্যে পরিণত হইতে বাধ্য। সচেষ্টোপার্জ্জিত অর্থ এই জীবনে ভোগ হইল আর স্বোপার্জ্জিত অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ হইবে না, এ কিরূপ কথা? বলিতে পার, কাহারও কাহারও অসৎ কর্ম্মের ফল এই দেহেই ফলে কিন্তু কেহ কেহ সারাজীবন দুষ্কৃতি করিয়াও এই কার্য্যকারণাত্মক নিমিত্তবাদ হইতে অব্যাহতি পায় দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর জাতীয় জীবনেই হউক সকল ঘটনাবলীই যদৃচ্ছাপ্রসূত বলিলেই ত পরজন্মভীতি

হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভস্মীভূত দেহের আবার পুনরাবর্ত্তন কিরূপে হইবে? মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কিনা তাহাও কেহ কখনও দেখে নাই। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর কিছু বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বলিতে হয়, তুমি নিজ ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্তির জন্য যেন তেন প্রকারেণ এ জগৎকে যথেচ্ছাচারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, কিন্তু তোমার এই পরলোকনিরাসবাদ যে জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আরও অধিক ভীতিপ্রদ। ইহজন্মসার, ভোগসর্ব্বস্ব তুমি কি কখনও ব্যর্থপ্রেমিকের, ব্যর্থপরিশ্রমীর, চিররুগ্নের অবস্থা চিন্তা করিয়াছ? তাহাদের সে অবস্থার কারণ কি? এবং তাহাদের ইহজন্মের সকল প্রচেষ্টারূপ কারণ কি কখনও কোনও কার্য্য প্রসব করিবে না?—না তোমার মতানুযায়ী কার্য্য-কারণাত্মক নিমিত্তবাদকে পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া একটা ভয়ানক গোঁজামিলের মধ্য দিয়া এ জগৎ-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে? সদ্যোজাত জীবের আহার চেষ্টা এবং নানা সহজাতগুণসম্পন্নতা বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি, যদি নিমিত্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত জন্মান্তর-বাদ না মান, তবে কি করিয়া সমাধান করিবে। 'সহজাত' বা 'প্রতিক্রিয়াজনিত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিলেই ত কোন প্রকার ব্যাখ্যা হয় না। যতক্ষণ না উহার কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছ ততক্ষণ তোমার কথা কেহই গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ হয়ত বলিবেন, সহজাত জ্ঞান, প্রতিক্রিয়াজনিত জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ও দৈহিক ব্যাপার-গুলি অর্থশূন্য নহে। উহাদিগকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত বহুযুগব্যাপী সংঘর্ষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেহান্তর্গত রক্তসঞ্চালন, পরিপাক, নিশ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহও এক সময়ে জীবকে জ্ঞাতসারে করিতে হইয়াছিল। বালক যেমন শব্দ পরিচয় কালে প্রত্যেক বর্ণটী জ্ঞাতসারে অধ্যয়ন করে, পরে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে প্রত্যেক বর্ণটী উচ্চারণ না করিয়াও

ছত্রের পর ছত্র দ্রুত পড়িয়া যাইতে পারে, অথবা বাদ্যনিপুণ কোন ব্যক্তি অপরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াও যথাযথভাবে যন্ত্রাদির চালনা করিতে পারে, সেইরূপ জীবের প্রত্যেক জ্ঞান, সহজাতই হউক বা প্রতিক্রিয়াজনিতই হউক, বাহ্য প্রকৃতির সংঘর্ষজাত অভিজ্ঞতা হইতেই লব্ধ হইয়াছে। তবে এই সকল জ্ঞান পুত্র পিতা হইতে লাভ করে। পিতাকে যে শক্তি অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, তাহা পুত্রে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতমাত্র জীবকে ক্ষুধা ও পরে ইন্দ্রিয়-তাড়নায় প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে উপস্থিত হইতে হয়। এই সংঘর্ষে যে যত জয়-লাভ করে সে ততই তাহার শারীরিক পুষ্টিসাধন ও বংশবিস্তারে সমর্থ হয়। প্রকৃতির সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার্থ জীব নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজের নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছে। জীব যে কেবল জড়জগতের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত তাহা নহে, নিজ অস্তিত্ব, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতিকল্পে জীবজগতেও মহাসংঘর্ষ চলিতেছে। এই সংঘর্ষে যে যেরূপ উপযুক্ত তাহার অস্তিত্বের কালও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই উন্নতিকল্পে জীব যে শুধু বংশানুগত (hereditary) গুণাবলী লইয়া অগ্রসর হয় তাহা নহে; তাহার আবেষ্টনী (environment) ও ভাষা তাহার পূর্ব্বপুরুষদের বহুকল্পসঞ্চিত জ্ঞানরাশি স্বল্পকাল মধ্যে তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। পারিপার্শ্বিক সভ্যতা এবং উন্নত-ভাবার মধ্যে অবস্থান করিয়া জীব যেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে, দেহ ও মস্তিষ্কের পূর্ণতা লাভ করিয়াও অসভ্য সমাজে সে তাহা লাভ করিতে পারে না। এইরূপে জীবসমষ্টি প্রবাহাকারে ক্রমোন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতেছে। এ মার্গ অতি দুর্গম। ব্যষ্টি জীব আমরণ পরিশ্রম, হৃদয়ের রক্ত, দীর্ঘশ্বাস, ও অশ্রুপাতের দ্বারা যে একটু পথ পরিস্কার করিল পরবর্ত্তী ব্যষ্টি জীব সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক সেই প্রকার কঠোরতার মধ্য দিয়া আর একটু অগ্রসর হয়

মাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া কত সুখ দুঃখ, কত উন্নতি অবনতি, কত নব নব সংগ্রামের মধ্য দিয়া কোন্ এক অজানা আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এ গতির বিরাম নাই, শান্তি নাই।

কিন্তু ইহা ত কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি মাত্র। কি প্রকারে জড়াজড় জগতে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে তাহা অতি পরিপাটিরূপে এই আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা জানা যায় বটে কিন্তু কি কারণে, কোন্ শক্তিবলে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে যে সকল সমস্যার উত্থাপিত হইয়াছিল সে সকলের কোন পূরণই হইল না। জাতি ও সমাজগত ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কার্য্যকারণাত্মক নিমিত্তবাদের ক্রমপরম্পরা কতকটা থাকে সত্য কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ব্ব কথিত সমস্যার কোন পূরণই হয় না। আর "বংশানুগত গুণাবলী" কথাটী কত দূর সত্য তাহারও কিছুই তথ্য নির্ণয় হয় না। পিতামাতা হইতে দৈহিক কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিছু লাভ হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতের মূর্খ, মূর্খের পণ্ডিত, সবলের দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের সবল অপত্যের অভাব এ জগতে বিরল নহে। উৎকট ব্যাধিযুক্ত পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বালককেও সেই রোগযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, পিতা মাতার দারিদ্র্যে পুত্রকেও সেই দারিদ্র্যভার মস্তকে বহন করিতে হইবে প্রভৃতি যে অবিচারসমূহ জগতে প্রত্যক্ষ করা যায় এই নৈতিক সমস্যারই বা পূরণ কে করিবে? উপযুক্ত মস্তিষ্কাদিসম্পন্ন সুসভ্য সমাজে ও তাহার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও বহুলোক মহা অজ্ঞ ও দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় কেন তাহারই বা উত্তর কে দিবে? তাই আমরা পূর্ব্বজন্মবাদ মানি। আমরা পিতা মাতা হইতে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, অবনতি—এমন কি, সহজাত এবং প্রতিক্রিয়াজনিত জ্ঞানও আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজনিত অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মপ্রসূত সংস্কারের দ্বারাই নিয়মিত। এক্ষণে, অতি প্রাচীন অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু

দার্শনিকদের এ সম্বন্ধে অভিমত কি তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতভাবে নব বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহীও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতভাবেই নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের সহিত হিন্দুধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ রহস্য যথেষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু গীতার ঐ শ্লোকটী হইতে ঐ কথার যাথার্থ্য খণ্ডন হয়। কেবল গীতা নয়, শ্রুতি হইতে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মতামত উপস্থাপিত করিয়া ঐ মতের কোনও রূপ যাথার্থ্য নাই প্রমাণ করা যাইতে পারে। পরে যদি বৌদ্ধ ও হিন্দু দেহান্তরবাদ পরস্পর তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় ঐ উভয় মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বৌদ্ধমতে, একটী তরঙ্গ যেমন আর একটী তরঙ্গ প্রসব করে, কিন্তু প্রথম তরঙ্গমধ্যস্থ জলরাশি দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যে নাই, সেইরূপ একটী জীবন আর একটী জীবন প্রসব করে, কিন্তু এক জীব কখনও বিভিন্ন দেহ ধারণ করে না। এইরূপে যতদিন না নির্ব্বাণ লাভ না হয় ততদিন এ জীবনপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতি নাই। কাহার?—ক্ষণিক 'আমি'র। সে কিরূপ?—অলাতচক্রবৎ। এই যে বৌদ্ধমত ইহা হিন্দুদর্শন বেদবেদান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" শ্লোকের ন্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও ঠিক ঐরূপ একটী উদাহরণ আছে। যেমন তৃণজলোকা একটী তৃণের অন্তভাগে গমনপূর্ব্বক অপর একটী তৃণ আশ্রয় করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগের অবয়বসকল সম্মুখে উপসংহৃত করে, তদ্রূপ এই সংসারী আত্মা এই স্থূল দেহটীকে অচেতন অবস্থায় পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তরে অভিনিবিষ্ট হইয়া আপনার সূক্ষ্ম শরীর উপসংহৃত করিয়া থাকেন। কিম্বা ভাগবৎকার যেমন বলিয়াছেন, পুরুষ একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেমন জলোকা তৃণান্তর গ্রহণ

করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা অবিনাশী, দেহের বিকার থাকিলেও দেহীর বিকার নাই। দেহীর ভাববিকারহেতু দেহের নাশ হইলে দেহাভিমানবশতঃ অন্য দেহ স্বীকার করিতে হয়, ইহাই দেহীর দেহসংযোগের কারণ। বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে সংসার-গতি নিরূপিত হইয়াছে। জীব যখন এতদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করেন। শ্রুতিতেও এই বিষয়ের প্রশ্নোত্তর আছে। সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারাই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ আরণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন যে, যৎকালে এই পুরুষ দুর্ব্বল হইয়া সম্মোহ প্রাপ্ত হয়, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ তদভিমুখে ধাবিত হয়। তখন এই আত্মা এই তৈজস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণপূর্ব্বক হৃৎপ্রদেশেই গমন করেন। তখন চাক্ষুষপুরুষ আদিত্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রহ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন। সুতরাং আত্মা তখন রূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। পরে ইহার হৃদয়ের অগ্র অর্থাৎ নির্গমনদ্বারভূত নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলেই আত্মা সূত্র ও জীবন-স্বরূপ লিঙ্গ শরীরের সহিত স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। আত্মা আদিত্যলোক-প্রাপ্তি-নিমিত্তক জ্ঞানকর্ম্মের সঞ্চয়ে মস্তক দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন। এইরূপ কর্ম্মানুসারে যথাযথ ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন। আত্মা যখন নিষ্ক্রান্ত হন, তখন জীবনস্বরূপ লিঙ্গ শরীরও তাহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও ঐ সঙ্গেই গমন করে। জীব সবিজ্ঞান আর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষাশ্রিত বাসনারূপ সংস্কারবিশিষ্ট। মৃত্যুকালেও জীব উক্ত সংস্কার সঙ্গে লইয়াই গমন করিয়া থাকেন।

জীবের যে পূর্ব্বকর্ম্ম ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায় অর্থাৎ ভাবনাময় দেহবিশেষের উৎপত্তি করে তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিলে ইহাই

অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুকালে এতদ্দেহের যন্ত্রণাবশতঃ উহার অভিমান বিস্মৃতি হয়, পরে কর্ম্মসংস্কার জাগরিত হইয়া আমি দেব, মনুষ্য ইত্যাকার দর্শন ও তাহাতে অভিমানবশতঃ ভাবীদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে। তৎপরে দেহত্যাগ হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে নূতন দেহপ্রাপ্তি হইলে প্রাণ সকলও পূর্ব্ব দেহ হইতে নূতন দেহে যায় (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২)। কিন্তু প্রাণের উৎক্রমণ আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভবে না। সুতরাং আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ভূতান্তর মিশ্রিত হইয়া প্রাণ আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গমন করে, এবং অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের সাধন দধি, দুগ্ধ, সোমরস ইত্যাদি দ্রবময় পদার্থ। হোমকর্ম্মের দ্বারা সেই সকল পদার্থ পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয় এবং অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞকারীকে আশ্রয় করে। অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতেও প্রমাণ হয় যে জীব আহুতিময়ী 'আপঃ' পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। ইষ্টাপূর্ত্তকারীরা পরে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে। কিরূপে অবরোহণ করে? প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে স্থূলদেহ প্রাপ্তহয়।

জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লিঙ্গদেহাশ্রিত হন। লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া তবে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন। এই লিঙ্গদেহেই তিনি ভূর্লোকে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ লোকে গমন করেন। ইহাকেই প্রেতলোক বলা হইয়া থাকে। এইস্থানে যাইয়া পাপের ফলভোগ করিতে হয়। পরে পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত তাঁহাকে স্বর্গলোকে গমন করিতে হয়। তথায় পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগের অবসান হইলে তাঁহার কর্ম্মক্ষয় হয়। কর্ম্মক্ষয় হইলেও সংস্কার থাকে। এই সংস্কারই অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীব সেই অদৃষ্ট লইয়া পুনরায় ঐ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ-

কটাহে প্রবেশপূর্ব্বক স্থূলদেহ ধারণ করে। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবিৎ সোমপায়ী সুতরাং পাপবিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তিগণ অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গগমনে অভিলাষ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই পুণ্যফলে পবিত্র সুরেন্দ্রলোক অর্থাৎ ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। পরে তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া ক্ষীণপুণ্য হইলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীতের মুক্তিকামনা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

প্রায় সকল দেশেই সঙ্গীত আমোদের উপাদানরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই ললিত-রসকলা সাধনার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর সঙ্গীত সাধনার চরম লক্ষ্য—'রসো বৈ সঃ', যিনি সর্ব্ব রসের আকর তাঁহার উপলব্ধি।

সাধনা বলিলেই তাহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম মনে উদয় হয়। কিন্তু ললিত-রসকলা আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধির ভিতর স্বকার্য্যসাধনে কতটা সক্ষম হয়, এবং তাহার উপর অতি-রিক্ত মাত্রায় ভার চাপাইলে তাহার সতেজ পুষ্টি ও প্রসারবৃদ্ধির কোন ক্ষতি হয় কি না, কিছুকাল হইতে তৎসম্বন্ধে একটা আন্দোলন চলিতেছে। গত বৎসর 'সবুজ পত্রে'র ভাদ্র সংখ্যায় 'সঙ্গীতের মুক্তি'শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতা কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ। কথাটা যদি ঐ খানেই শেষ হইত, কোন কথা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষদ্-বিদ্যালয়ের মুখপাত্রস্বরূপ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তচিন্তামণি মহাশয় তাহার একটী প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।* কথায় কথা উঠে। তাই আমরাও একটা কথা কহিতেছি, যদিও ইহা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। কেন না সঙ্গীতে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। তবে, একটা আন্‌জে-মৌজে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সকল ব্যক্তিরই আছে। উক্ত প্রবন্ধে রবিবাবু স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটীমাত্র যোগ্যতা আমার আছে। তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।" এই অযোগ্যতার অধিকারেই আমরা দুই চারিটী কথা বলিব। আমাদের কথা যদি ভুল হয়, তাহাতেও একটা উপকার হইবে। সত্যকে চিনিতে হইলে ভুলগুলিকে জানা দরকার।

মূল প্রবন্ধের বিষয় 'সঙ্গীতের মুক্তি'। বাঁধা না পড়িলে ত মুক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের বন্ধন কোথায়? ব্রহ্ম নাম-রূপের ফাঁদে বদ্ধ; মানুষ বদ্ধ মায়ায়; কবিতা যেমন ছন্দ-মিলে বদ্ধ, সঙ্গীতও তেমনি বদ্ধ সুর-তালে। আধেয় এবং আধারে যে সম্বন্ধ, সুরতালে সেই সম্বন্ধ। কাল—গড়ে, স্থান—ধরে। নহিলে সৃষ্টি থাকে কোথায়? এই নিত্যসম্বন্ধ রদ্ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। রবিবাবু বলিয়াছেন—"য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেক বারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব নিকাশ করিয়া হাঁফ্ ছাড়িতে হয় না। কেন না সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি তাহাকে বদল করিতে পারে না।" সীমানা যিনিই বাঁধুন, একটা বন্ধনের প্রয়োজন। শৃঙ্খলা, সৌষ্ঠব, সমন্বয় না থাকিলে শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবিতায়

* 'হিন্দুসঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ'। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্ত-চিন্তামণি প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটাই লয়। * * * কাব্যেই কি আর গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।" এ কথার উত্তরে কৃষ্ণবাবু বলেন —"ছন্দে যদি দোষ না থাকে তবে, সুরে গান করিলে, কেন তাল-যোগে সঙ্গত করা যাইবে না—"

প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নাই। তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের যে কয়টী গান উদাহরণ দিয়াছেন, কৃষ্ণবাবুর পুস্তকে প্রকাশ যে সে সবগুলি সঙ্গীত-পরিষদে বহু সংখ্যক শ্রোতার সমক্ষে কবির অভীপ্সিত ছন্দ যতি নির্খুত রাখিয়া গীত হইয়াছিল। পুস্তকে এই সকল গানের স্বরলিপিও প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, গানের ছন্দ বা যতি, সুরের চাল বা গতি যেমনই হউক, তদনুরূপ ঠেকার বোল্ও ভিন্ন ভিন্ন, রকম রকম নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন কোন সুর যদি প্রয়োজন অনুসারে চাল পরিবর্ত্তন করে, তজ্জন্য 'তালফেরতা' সঙ্গতের ব্যবস্থা। এত সদুপায় সত্বে যদি তালের সম্বন্ধে বন্ধনের পরিবর্ত্তে উদ্বন্ধনের বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সত্যই দুঃখের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার নিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

সে কথা সত্য! সঙ্গীতের আসরে গায়ক অনেক সময় আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কেবল বাদককে অপ্রতিভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। বাদকও এ সম্বন্ধে বড় কম যান না। অনেক সময় দেখিয়াছি, বাদক তালটা মৃদঙ্গের চর্ম্মের উপর না ফেলিয়া উহ্য রাখিয়া দেন; তাঁহার পক্ষে সেটা একেবারেই অশোভন। যে আসরে দুই 'বাঘা ভাল্‌কো' শ্রোতৃবৃন্দকে রসদানের জন্য উপস্থিত হন সেখানে একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই যাওয়া উচিত যে, যেন আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। দুই এক জন মুরুব্বি ব্যতীত এরূপ দ্বন্দ্বের কেহই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। দ্বন্দ্বকে দূরে পরিহার কর।

নূতন সৃষ্টি করিতে হয়, করা হউক। কিন্তু তাল জিনিষটাকে একেবারে বর্জ্জন করা কি ভাল?

তাল সঙ্গীতের সঙ্গ, কিন্তু সুর তাহার অঙ্গ। সুর রসের ব্যঞ্জনা। ভাব যেখানে অনির্ব্বচনীয়, আপনাকে প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না, সুর সেখানে তাহার আত্মপ্রকাশের সহায়। মানবের ভাষা নিরতিশয় সীমাবদ্ধ। আমাদের চরম অনুভূতি যখন প্রাণস্পন্দন-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহা একটী মাত্র স্বরে আপনাকে উজাড় করিয়া দিয়া নীরব হইয়া থাকে—আ, উ, ও, ইত্যাদি। সে স্বর সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, বিরক্তি বা বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস, তাহা বুঝা যায় উচ্চারণের সুরে। সপ্তকের যে পরদায় যে রস প্রকাশ করে, বহু অভিজ্ঞতায় তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সুরের সাহায্যে রসের যে আদান প্রদান হয়, তাহাতে দুইটী সর্ত্ত অপরিহার্য্য। নিখুঁত কণ্ঠ এবং কর্ণ, এরূপ দুইটী বস্তুই দুষ্প্রাপ্য। এই দুইটী জিনিষই প্রথমতঃ প্রকৃতিপ্রদত্ত মালমসলা, তাহার উপর শিক্ষা সাধনা চর্চ্চাসাপেক্ষ। খনির অন্ধকার গর্ভে হীরা জন্মিয়াই রাজমুকুটে শোভা পায় না। যখন বাঙ্গালায় সঙ্গীতচর্চ্চা অধিকতর ব্যাপক ছিল, তখন সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত দিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া সেই নির্দ্দোষ আমোদ ও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক বসিত আর সে বৈঠকে আভিজাত্যের অভিমান থাকিত না। কেবল গুণের আদর আর কদর। সে দিন আর নাই, যখন প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বনাথ মতিলাল ফেরিওয়াল্লার 'চাঁপাকলা' ডাক্ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওরে কে আছিস, গান্ধার বলেছে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন্।' এখন চাঁপাকলা হাঁকিলে আমাদের শুষ্ক উদর ঘনদুগ্ধযোগে তাহার সুব্যবহারটাই মনে করে—জীবনযুদ্ধে আমরা জর্জ্জরীভূত। আমাদের মূল সপ্তক 'সা' এখন আফিসের বড় সাহেবের পরুষকণ্ঠ। 'রী' ঋণের তর্জ্জন। গান্ধার গলাবাজীতে। মধ্যম এবং পঞ্চম উভয়ই গৃহিণীর ঝঙ্কারে। ধৈবত শুধু 'ধা' 'ধা' করিয়া বেড়াইতেছে আর 'নি' উপবাসের চিঁ চিঁ স্বরে পর্য্যবসিত হইয়া কেবল 'পাইনি, খাইনি'

করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে! এখন উপায় থাকিতেও আমরা নাতোয়ান হইয়া পড়িয়াছি।

এইখানেই রবিবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণবাবুর মতভেদ। রবিবাবু বলেন— "ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষভাবে বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। * * * কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নয়। আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতঃই বিলাতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।" কৃষ্ণবাবু বলেন "হাস্য-রসাত্মক করিতে হইলে, স্বভাবতঃই বিলাতি ছাঁদের কেন হইবে, একথা আমরা বুঝিতে অক্ষম।"

'কেন হইবে' অথবা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় কি না এ কথার বিচার করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটা কথা ভাবিবার আছে—হইলে ক্ষতি কি? ভাব এবং রস বিশ্বব্যাপী। যদি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায়, যদ্দ্বারা ভাবরসের আস্বাদনও সর্ব্বজনীন হইতে পারে, এরূপ আদান প্রদানের একটা সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণবাবুর আশঙ্কা, ইহাতে আমরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিব। এই আশঙ্কার পূর্ব্বাভাস রবিবাবুর প্রবন্ধে আছে "এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহাদের জাত যাইবে, কিন্তু জাতি যাইবে না।"

যাঁহাদের উপদেশ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন সঞ্চয় করিবে, সেই উদার হিন্দুজাতি এইরূপ আদান প্রদানের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে হয়। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পরিবর্ত্তন বা ভাঙচুর করিতে হিন্দু কখন কুণ্ঠিত হন নাই। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক, তৎপরে

তান্ত্রিক, অনন্তর শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে এইরূপ কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তবে, সঙ্গীত এই প্রশস্ত পথে চলিবে না কেন? কৃষ্ণবাবু বিলাতি ঢপের আমদানী করিতে অনিচ্ছুক, কেননা তাঁহার ভয়, তাহাতে "হিন্দু রাগরাগিণীর বৈজাত্য সঙ্ঘটন হইতে থাকিবে।" কিন্তু বৈজাত্য সঙ্ঘটন ত পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সরফরদা, ইমন্‌, কাফী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হিন্দুরাগিণী নহে। তারপর পরিবর্ত্তন, ভাঙচুর করিয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সখা, সখী, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিতে বৃহৎ একান্ন-বর্ত্তী পরিবার। কাওয়ালী তাল না কি অনার্য্য কাওয়াল জাতির দান। তবে যদি এমন কথা হয়, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে কি? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা যাহাতে আমোদ বোধ করিতাম, এখন আর তাহাতে করি না। যাত্রার স্থল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছে। নূতন স্রোত আসিলে অনেক নূতন সামগ্রী ভাসিয়া আসে। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবে কীর্ত্তন আসিয়াছিল। তারপর বাউলের গান। নূতন ধারায় মনোভাব প্রবাহিত হইলেই তাহার অভিব্যক্তিরও নূতন ভাষা প্রয়োজন।

অন্যান্য ললিতশিল্পকলার ন্যায় সঙ্গীতেরও প্রধান লক্ষ্য শ্রোতার হৃদয়ে ভাবরসের সঞ্চার করা। পূর্ব্বে যাত্রার আসরে অনেক গান রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াই গীত হইত। ক্রমে নূতন ঢঙের প্রয়োজন হওয়ায় বদনের তুক্কো, গোবিন্দ দাশরথীর সুর, মধুকানের ঢপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। মানুষ পুরাতনের প্রতি যতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হউক, যতই তাহাকে ভক্তি সম্ভ্রম করুক, সে নূতনকে ভালবাসে—তাহা দ্বারা আকর্ষিত হয়, তাহাকে চায়। কালে শক্তির অপলাপে প্রচলিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার ছাঁচে গীত রচনা হইতে লাগিল। তার পর বিলাতি ধরণের থিয়েটার যখন আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইল, নটগুরু গিরীশচন্দ্র দেখিলেন, রাগরাগিণীকে

আরও ভাঙচুর না করিলে কাজ চালানো যায় না। দেখা গেল, কোন সঙ্গীতের চপল পদ-বিন্যাসের সঙ্গে সুর হাঁফাইয়া বলিতেছে, দাঁড়াও, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অত ছুটিতে পারি না। কখন গানের কথা কলহাস্যের রোল তুলিয়াছে, সুর তাহাতে যোগ দিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে বলিতেছে, আমার কি এখন অত ছ্যাব্‌লামো সাজে! ভাবুক রচয়িতার অন্তরে এরূপস্থলে যে কি হয়, তাহা ভুক্তভোগী নহিলে বুঝিতে পারা যায় না। কালোয়াৎ ত কড়িমধ্যম লাগাইয়া দিব্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। কিন্তু সাধারণ শ্রোতা যে কড়ি-মধ্যমের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম কিছুই বুঝে না, সে কি কেবল ওস্তাদের শিরঃ-সঞ্চালন, শ্মশ্রুআস্ফালন দেখিয়া আমোদ বোধ করিবে? এই শ্রেষ্ঠ রসকলা যদি শুধু দুই চারিজন সমজ্‌দার শ্রোতার জন্য হয়, তাহা হইলে কথা নাই। কিন্তু সঙ্গীতের একদিককার লক্ষ্য যেমন ভগবৎ সাধনা, তাহার অন্য দিকের লক্ষ্য সাধারণকে আমোদ দানে আকর্ষিত করিয়া তাহাকে ক্রমে উচ্চতর লক্ষ্যে প্রেরণ করা। তাহা করিতে হইলে সঙ্গীতকে সাধারণের উপযোগী ও উপভোগ্য করিতে হইবে।

যাত্রার গানে তবু একটা সুবিধা ছিল, এক একটা নির্দ্দিষ্ট রসের এক একটী সঙ্গীত রচিত হইত, সুতরাং সেই সেই রসের নির্দ্দিষ্ট সুর চলিত। তখন লোকের ধৈর্য্য ছিল শুনিত। যাত্রার লক্ষ্য রসের অবতারণা। রসাভাব না হইলে বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইত না। নাটকের ন্যায় নাটকীয় সঙ্গীতেও হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাবের খেলা প্রদর্শিত হয়। কোথাও দুরন্ত ঈর্ষার মাঝে দুর্জ্জয় ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, কোনখানে উপেক্ষায় অভিমানে হৃদয় দোলায়মান, কোথাও বা শোকের সঙ্গে উন্মত্ততার অট্টহাস। এইরূপ বিভিন্ন ভাবরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস নির্দ্দিষ্ট রসের নির্দ্দিষ্ট সুরে প্রকটিত হয় না। গিরীশচন্দ্র যেমন নূতন ভাবে নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন, তেমনি নূতন নূতন সুরও সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই অভিনব সৃষ্টির ইষ্টানিষ্ট, যুক্তি অযুক্তি লইয়া ওস্তাদ এবং কালোয়াৎগণ তর্ক বিচার করুন। কিন্তু নাটকীয় সঙ্গীতের প্রচলনে যে জনসাধারণ

একরূপ উচ্চ আমোদের অধিকারী হইয়াছেন তাহা রঙ্গালয়ের দর্শক মাত্রে একমুখে স্বীকার করিবেন। আমরা পূর্ব্বে যা ছিলাম, এখন আর তাহা নহি। সুতরাং কেবল পুরাতনে আমাদের সকল প্রয়োজন সাধিত হইবে কেন? ললিতরসকলায় হৃদয়ের উচ্চতম বিকাশ। তাহার পায় বেড়ী দিলে জাতীয় জীবন পঙ্গু হইবার ভয় নাই কি? সঙ্গীতের মুক্তিকামনা সঙ্গত কি না পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

(২৩)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

জ্ঞান।

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥

নব—প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, ও পৃথ্বী তন্মাত্র।

একাদশ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও মন।

পঞ্চ—স্থূলভূত,—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী।

ত্রীন্—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ।

যে জ্ঞান দ্বারা এই আটাশটী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই আটাশটীর মধ্যে "এক" পরমাত্মতত্ত্ব অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান। ইহাই আমার মত।

বিজ্ঞান।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বগুলি পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ দেখা যায় না, কিন্তু সেই তত্ত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ব্রহ্মকে দেখা যায়, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে।

অতএব জ্ঞান সবিকল্প, বিজ্ঞান নির্ব্বিকল্প।

(২৪)

সাধন ভক্তি ও প্রেমাভক্তি।

সাধন ভক্তি।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥

আমার অমৃতকথাতে নিরন্তর শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাদর, মৎকথা শুনিয়া নিরন্তর ব্যাখ্যান, আমার পূজাতে পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পূজায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের শ্রেষ্ঠ পূজা, সর্ব্ববস্তুতে মদ্ভাবস্ফূর্তি এইগুলি দ্বারা ভক্তি হয়।

প্রেমাভক্তি।

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥

যে নিজেকে আমাতে নিবেদন করিয়াছে, তাহার এই সব সাধন দ্বারা আমাতে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাভক্তি হইলে, সেই ভক্তের সাধন কি সাধ্য কিছু বাকি থাকে না, অর্থাৎ সব আপনা আপনি হইয়া যায়।

(২৫)

প্রশ্নোত্তরমালা।

দান কি?—কাহারও দ্রোহ না করাই দান, ধনার্পণ নহে।

তপঃ কি?—কাম ত্যাগই তপস্যা, কৃচ্ছ্রাদি নহে।

ধন কি ?—ধর্ম্মই ধন, অর্থ ধন নহে।

দক্ষিণা কি ?—জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা, হিরণ্য দান নহে।

সুখ কি ?—সুখ দুঃখের অনুসন্ধান না করাই সুখ, ভোগ নহে।

পণ্ডিত কে ?—বন্ধ হইতে মোক্ষের উপায় যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত ; কেবল যিনি বিদ্বান্ তিনি নহেন।

মূর্খ কে ?—দেহ ও গেহে যে অভিমানী সেই মূর্খ।

পন্থা কি ?—নিবৃত্তি মার্গই পন্থা, কণ্টকশূন্য পথ নহে।

স্বর্গ কি ?—সত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, ইন্দ্রাদিলোক নহে।

নরক কি ?—তমোগুণের উদ্রেকই নরক, তামিস্রাদি নহে।

বন্ধু কে ?—গুরুই বন্ধু, ভ্রাতাদি বন্ধু নহে।

গৃহ কি ?—শরীরই গৃহ, হর্ম্ম্যাদি নহে।

দরিদ্র কে ?—যে অসন্তুষ্ট সেই দরিদ্র, নিঃস্ব নহে।

কৃপণ কে ?—যে অজিতেন্দ্রিয় সেই কৃপণ—দীন নহে।

গুণ কি ?—দোষই বা কি ?

গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ।

গুণ ও দোষ দর্শনই দোষ। গুণদোষদর্শনবর্জ্জিত স্বভাবই গুণ। অর্থাৎ ভাল মন্দ দেখাই দোষ ; ভাল মন্দ না দেখাই গুণ।

(২৬)

মোক্ষের তিনটী উপায় কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ। যোগ অর্থাৎ উপায়।

জ্ঞানযোগে কার অধিকার ?

নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।

ইহাদের মধ্যে দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত ও তৎসাধনভূত কর্ম্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ।

কর্ম্মযোগে কার অধিকার ?

তেম্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্।

যার বৈরাগ্য নাই, যে সকাম, তার পক্ষে কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগে কার অধিকার ?

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্।

ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

কোন হেতুতে আমার কথাতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু বৈরাগ্য নাই, অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ।

(২৭)

কর্ম্মী ও জ্ঞানী।

কর্ম্মীর যজন।

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।

স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া যজ্ঞ দ্বারা আমার যজন করিবে। এইরূপে যজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়।

জ্ঞানীর সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা।

সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।

ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥

বিবেক দ্বারা সর্ব্বপদার্থের অনুলোমক্রমে সৃষ্টি (উৎপত্তি), ও প্রতিলোমক্রমে প্রলয় (নাশ) চিন্তা করিবে, যতদিন না মন নিশ্চল হয়। সর্ব্বক্ষণ সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়।

(২৮)

ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের কামনাশ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি সে জন্য ভক্তের হৃদ্গত কাম নষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের প্রয়োজন নাই।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনাভ্যাস পর্য্যন্তও ভক্তের প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না ? কারণ, উহাও শুদ্ধা ভক্তির অন্তরায়।

ভক্তিতে সব হয়ে যায়।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।

যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম, এবং তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করেন।

মোক্ষ দিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

একমাত্র আমাতে নিষ্ঠাবান্ এরূপ সাধু, ধীর ভক্তকে আমি সংসারগতিনাশক কৈবল্য বা মোক্ষ দিতে চাহিলেও তিনি উহা গ্রহণ করেন না।

(২৯)

শুচি অশুচি আচার কাহাদের জন্য।

যাহারা ক্রিয়া, জ্ঞান, ভক্তি এই তিনের অধিকারী নহে, অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মীও নহে, জ্ঞানীও নহে, ভক্তও নহে, যাহারা সাধনাশূন্য মূঢ় তাহাদের জন্য "আচার" অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধি, ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, এই সব বিধান করা হইয়াছে। ঐরূপ মূঢ় ব্যক্তিদের আচারে আঁট থাকা ভাল।

উদ্দেশ্য।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাং॥

কর্ম্মের নিয়মন জন্য গুণদোষের ব্যবস্থা করিয়াছি।

নিয়ম বিধির তাৎপর্য্য নিবৃত্তি।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।

এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥

যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে। মানুষের এই ধর্ম্ম মঙ্গলকর ও শোক-মোহ-ভয়নাশক।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(৭)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার এম, বি)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি উহা অনুভব করিতে পারে এবং অনেকস্থলে উহাকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র স্বপ্ন সৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসোঁর (Bergson) মতে সকল প্রকার স্বপ্নই ঐরূপ অনুভূতিজাত।

বার্গসোঁ বলেন, স্বপ্নের বাস্তবসত্ত্বা কিছুই নাই। স্বপ্নে আমি কত লোকজন দেখিতেছি, তাহাদের সহিত কত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, তাহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সবটাই মিথ্যা। জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন শূন্যে মিলাইয়া যায়। ইহা কতকটা কবি ডি, এল, রায়ের নিম্নলিখিত গানটীর মত—

বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিল নবরত্ন ন'ভাই।
(আর) তানসেন ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁর সভায়।
(অর্থাৎ) যেতেন নিশ্চয় তানসেন বিক্রমাদিত্যের কোর্টে।
(কিন্তু) দুঃখের বিষয় তানসেন তখন জন্মাননিকো মোটে॥ ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এরূপ কেন হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের নিদ্রিত ও জাগরণোন্মুখ অবস্থায় কি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ই অনুভূত হয় না?

কোন লোককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি একটু স্থির হইয়া দেখুন দেখি, কিছু দেখিতে পাইতেছেন কিনা, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই উত্তর দিবেন,

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ, নিজ মনকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইলে যতটুকু একাগ্রতা থাকা দরকার তাঁহাদের তাহা নাই। যাঁহাদের তাহা আছে তাঁহারা অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যথা—প্রথমে সাধারণতঃ একটী কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্র দেখা যায়, উহাতে উজ্জ্বল বিন্দুসকল দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে—ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতেছে, আবার যেন শান্তভাবে নামিয়া আসিতেছে। অনেক সময় অনেক বিভিন্ন বর্ণের দাগ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি এত অনুজ্জ্বল যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার কোন ব্যক্তির পক্ষে এই বর্ণগুলি এত উজ্জ্বল যে কোনও পার্থিব বর্ণের সহিত তাহার তুলনা হয় না। এই দাগগুলি কখনও বিস্তৃত হয় কখনও সরু হইয়া যায়, ইহাদের আকৃতি ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় এবং সর্ব্বদাই যেন নূতন একটী আসিয়া পূর্ব্বেরটীকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তন কখন অল্পে অল্পে ধীরভাবে হইয়া থাকে, আবার কখনও বা ঝড়ের মত তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে। এই বর্ণক্রীড়া কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? দেহবিজ্ঞানবিদ্ এবং মনোবিজ্ঞানবিদ্ উভয়েই ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; চক্ষুমধ্যস্থ আলোক, বর্ণময় দাগ, ফস্ফরাস্জাত আলোক (phosphine) প্রভৃতি বলিয়া নানা প্রকারে উহাদের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অপর কাহারও কাহারও মতে অক্ষিঝিল্লীতে (retina) যে রক্তপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য এইরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিম্বা চক্ষু বন্ধ করিলে চক্ষুগোলকের উপর যে চাপ পড়ে তাহাতে অক্ষিঝিল্লীতে কোন না কোনরূপ উত্তেজনা হয়, তাহা হইতেই ঐরূপ বর্ণের উৎপত্তি—ইত্যাদি নানাপ্রকার মতভেদ আছে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলি অনেকটা আনুমানিক বলিয়া মনে হয়। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার

উদ্ভাবিত কৃত্রিম চক্ষুর সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে আলোকরশ্মিপাতে চক্ষুর আণবিক বিকার (molecular change) উপস্থিত হয়, তাহাতে চক্ষুতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ইহাই কারণ। কিন্তু আলোকপাত রোধ করিবামাত্রই অক্ষিঝিল্লী ও চক্ষুস্নায়ুর আণবিক সাম্যভাব ফিরিয়া আসে না। কাজেই একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ নিয়তই চক্ষুস্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিতে থাকে। আর তড়িৎ-প্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজ্ঞানও অবশ্যম্ভাবী। এইহেতু চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকিবার সময়ও আমরা একপ্রকার বিক্ষিপ্ত ও সঞ্চারিত ক্ষীণালোকরশ্মি দেখিতে পাই। অধ্যাপক বসু মহাশয় বলেন, এই আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষুর নানা অংশের আণবিক বৈষম্যজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য।

কিন্তু মুদ্রিত চক্ষুর এই বর্ণবৈচিত্র্যের অনুভূতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতভেদ থাকিলেও ঘটনাগুলি কিন্তু সত্য। কারণ, এইরূপ অনুভূতি সকলের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। দার্শনিক বার্গসোঁর মতে ইহাই স্বপ্নের প্রধান উপাদান এবং প্রধানতঃ ইহা লইয়াই স্বপ্ন সৃষ্ট হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে আলফ্রেড মরি (M. Alfred Maury) এবং হার্ভি (M. d'Hervey) নামক দুইজন মনস্তত্ত্ববিদ্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ঘুমাইয়া পড়িবার সময় এই বর্ণময় দাগগুলি এবং এই গতিশীল আকৃতি-গুলি যেন জমাট বাঁধিয়া স্থির হইয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ আকৃতি গ্রহণ করে। স্বপ্নাবস্থায় এইগুলিই স্বপ্নদৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাটী সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। কারণ, যখন তাঁহারা এই নির্দ্ধারণটী করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থা। আধুনিক কালে আমেরিকার জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ *

* Professor Ladd of Yale University.

একটী অধিকতর সঠিক উপায় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ উপায় মত কার্য্য করা একটু কঠিন। কারণ, উহা কতকটা অভ্যাস সাপেক্ষ। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের ঠিক পূর্ব্বে যে স্বপ্নটী দেখিতেছিলাম নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র মনে হয় যে, স্বপ্নটী যেন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে লোপ পাইয়া যাইতেছে এবং লক্ষ্য না করিলে শীঘ্রই উহা আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবে। সেই লুপ্তপ্রায় স্বপ্নটীর প্রতি মনোযোগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যেন আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তিগুলি অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া এই আলোকময় দাগে পরিণত হইতেছে। মনে করুন, স্বপ্নে আমরা সমুদ্রে বেড়াইতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ঢেউগুলি খেলা করিতেছে—উহাদের চূড়া শুভ্রফেণময়। জাগরণমাত্র এই ছবি একটী বিস্তৃত দাগে মিলাইয়া যাইবে, উহার বর্ণ ধূসর এবং হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার মধ্যে উজ্জ্বল বিন্দু সকল ছড়ান রহিয়াছে। স্বপ্নের মধ্যেও এইগুলি বর্ত্তমান ছিল এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই স্বপ্ন সৃষ্ট হইয়াছিল। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এইরূপ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি ব্যতীত বাহ্য উত্তেজনাজাত অনুভূতিও যে স্বপ্নচিত্র সৃজনের কারণ হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

চক্ষুর আভ্যন্তরীণ অনুভূতিই স্বপ্ন সৃজনের প্রধান কারণ বটে। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও এইরূপ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি হইয়া থাকে—তাহারও স্বপ্ন সৃজনের সাহায্য করে। ধ্যানস্থ হইলে অনেকে কর্ণের ভিতরে একটী শব্দ লক্ষ্য করিতে পারেন। কোন কোন সম্প্রদায় (যেমন রাধাস্বামী সম্প্রদায়) কর্ণের এই শব্দ শ্রবণ দ্বারা তাঁহাদের ধ্যান যে যথাযথভাবে হইতেছে তাহা মনে করিয়া থাকেন। কর্ণের আভ্যন্তরীণ অনুভূতিপ্রসূত এই শব্দ আমাদের জাগ্রদবস্থায় অনুভূত না হইলেও নিদ্রিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই শব্দ এবং বাহিরের নানারূপ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শব্দ মিলিত হইয়া আমাদের স্বপ্নে শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দানুভূতি বর্ণানুভূতির ন্যায় স্বপ্নে প্রধান অংশ অভিনয় করে না।

স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক বলিবার আছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনুভূত ছবির সহিত মিলিত হইয়া তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করে।

মাক্সসিমন (M. Max Semon) তাহার নিজের একটী স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে পাশাপাশি দুই থাক স্বর্ণমুদ্রা সাজান রহিয়াছে, কিন্তু উহারা উচ্চতায় সমান নহে। তাঁহাকে যেন থাক দুইটীকে সমান করিতে হইতেছে, কিন্তু উহা তিনি কিছুতেই সমান করিতে পারিতেছেন না—এমন কি, তজ্জন্য তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অবশেষে এই কষ্টে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, বিছানার কাপড়ে জড়াইয়া তাঁহার পা দুইটী উঁচু নীচু হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। স্পর্শের দ্বারা অনুভূত এই অসমতার জ্ঞান দৃষ্ট চিত্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় স্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূত ভাবটী স্বপ্নের মধ্যে দৃষ্ট-চিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের যেরূপ স্পর্শশক্তি আছে, আমাদের শরীরাভ্যন্তরীণ প্রত্যেক যন্ত্রটীরও সেইরূপ এক এক প্রকার অনুভব শক্তি আছে। জাগ্রদবস্থায়ও এইগুলি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উহা আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। কারণ, জাগ্রদবস্থায় আমাদের জ্ঞান নানাপ্রকার বাহিরের কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকে—আমরা যেন নিজের দেহ ছাড়িয়া অনেকটা বাহিরে বাস করি। নিদ্রিতাবস্থায় যেন আমরা নিজের মধ্যে অধিকতরভাবে ফিরিয়া আসি। এইজন্য দেহসম্বন্ধীয় অনেক সূক্ষ্মানুভূতি আমরা স্বপ্নকালেই অনুভব করিয়া থাকি।

এইগুলি স্বপ্নের উপাদান। কিন্তু তাই বলিয়া, উহারাই যে স্বপ্নসৃষ্টি করে একথা বলা যায় না। এই কথাটী আরও কিছু বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

চক্ষু বুঁজিয়া আমরা যে বর্ণবৈচিত্র্য দেখি সেইটীই স্বপ্নের প্রধান

উপাদান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। মনে করুন, আমরা চক্ষু বুঁজিয়া সাদা জমীর উপর কাল দাগ রহিয়াছে এইরূপ একটী চিত্র দেখিলাম। এই চিত্র অবলম্বন করিয়া অসংখ্য প্রকারের স্বপ্ন সৃজিত হইতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যে আমরা যে বিশেষ ছবিটী দেখি তাহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়? আমাদের জাগ্রৎকালীন অনুভূতি সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ যে কৌতুহলজনক দুই একটী পরীক্ষা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যখন আমরা কোন পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ করি তখন কি আমরা সমস্ত অক্ষরগুলি একটী একটী করিয়া পাঠ করি? যদি তাহাই হইত তবে সমস্ত দিনে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করা হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেক বাক্যের সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখিয়া লই মাত্র। এমন কি ঐ অক্ষরগুলির সমস্ত আকৃতিটীও দেখি না—কতকগুলি দাগ দেখি মাত্র। যাহা দেখি তাহা হইতেই সমস্তটী একরূপ বুঝিয়া লই। যে সব অংশ আমরা দেখি না, আন্দাজে বুঝিয়া লই, আমরা মনে করি, সেগুলি ঠিক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাও স্বপ্ন দেখার মত কল্পিত দৃষ্টি (hallucination)। এ বিষয় লইয়া এত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে যে উহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছুই নাই। দুইজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ এই সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিয়াছেন আগামীবারে তাহার উল্লেখ করিব।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,

২৩।৮।১৬

পরম স্নেহভাজনেষু—

যো— তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম, তুমি সুস্থ হয়েছ জেনে বিশেষ প্রীত। তুমি আমার ভালবাসা ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানবে। * * * মালা জপ ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম করে যাবে—আমাদের অত বিধি মানতে হবে না। যারা মানে মানুক্। আমাদের চাই রাগমার্গের ভজন সাধন, যেমন ছিল ব্রজগোপীদের। "সখি, তোদের হ'ল কথার কথা, আমার যে অন্তরের ব্যথা, আমার ত না গেলে নয়!" হতে হবে ব্যাকুল উন্মাদ—এরই নাম রাগ-মার্গের ভজন। এখন ভগবৎকৃপায় ভক্তি প্রেমের বান এসেছে —ঠাকুরের আবির্ভাবে। যাও ভেসে, যাও মেতে; ভয় নাই, ভয় নাই। দাও ঝাঁপ—অমর হবে। হে জীব, নবজীবন লাভ কর, নূতন রাস্তায় এগিয়ে চল, ভাই! জয় শ্রীপ্রভুর জয়, জয় শ্রীভক্তের জয়। ইতি—

তোমারই

প্রেমানন্দ।

(২)

রামকৃষ্ণ মঠ,

পোঃ বেলুড়, হাওড়া,

১৮।৯।১৬

স্নেহভাজনেষু—

প্র— তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু তার পর ৺পুরী যাত্রা করি, গত পরশ্ব এসেছি।

ধ্যান কি কথার কথা? যার তার হবার নয়। জগৎশুদ্ধ লোকেরই ঐ কথা, কেউ ফুটে বলে ফেলে, কেউ বা চেপে রাখে মাত্র। ঠাকুরকে মনে মনে ডাক্‌বে, প্রার্থনা কর্‌বে ও আপনার ভেবে আব্দার কর্‌বে। সময়ে সব ঠিক হবে, ভাবনা নাই—তিনি পরম দয়াল। ঠাকুরের কথা "মন্ত্র নয়—মন তোর", যদি ভগবানে মন দিতে পার তাঁকে লাভ কর্‌বে।

দীক্ষা দরকার। একটা পথ ধরে গমন কর্‌তে হয়। দীক্ষা সেই পথ, গুরু ঐ পথপ্রদর্শক। গুরুকরণ আবশ্যক, ইহা শাস্ত্র বাক্য। শাস্ত্র মান্‌তে হয়, স্বাধীন চিন্তা করে সবাই ভুঁইফোড় হয় না। ব্যাকুলতাই এক মন্ত্র, ইহা মহা ভাগ্যের বিষয়, যার তার হয় না। ভারতে আছে, একলব্য নামে এক ভক্ত দ্রোণের মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ঐ একমাত্র একলব্যের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়। যার নিকট হতে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেছ পুনঃ পুনঃ তাঁর কাছেই শিক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর। * * *

আমরা ভাল আছি, এখানকার আর আর সবই ভাল। দুর্ভিক্ষ প্রায় নাই। তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে এবং তোমার ভাইকে আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

(৩)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,

৩০।১০।১৬

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিঠি পড়্‌লাম। ভগবানকে ডাক, তিনি তোমায় সত্যধারণায় ও সরল হবার শক্তি দেবেন। নিজেও চেষ্টা কর্‌তে হবে বাপধন। প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, তবেই ত সাড়া পাবে।

নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের দুষ্টামি ধর্‌তে চেষ্টা কর।

মন মুখ এক করা যদি ভালই বোধ হয়, তবে তার জন্য কি চেষ্টা করছ? আমি ঔষধ খেলে কি তোমার অসুখ সারবে?

ব্যভিচার যদি মন্দ বলেই জান তবে উহা হতে রক্ষা হবার কি উপায় করেছ? দোষগুলো ধর আর প্রতিজ্ঞা কর, অনুতাপ কর যে ওপথে চলব না—ওদিকে কখনই যাব না। তবেই রক্ষা। কৃপা আকাশ থেকে আসে না। এই যে খেয়াল হচ্চে এরই নাম কৃপা। বিচার করে ধারণা কর। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ।

(৪)

বেলুড় মঠ,
১।১১।১৬

স্নেহাস্পদেষু

* * * সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে চেষ্টা করিও। তোমাদের জীবন যেন লোকের আদর্শ হয়। কেবল ভালবাস আর কিছু নয়। তোমাদের দেখে জগৎ শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক। হীন স্বার্থপরতা যেন আমাদের দেহে প্রবেশ-পথ না পায়। * * ইতি—

তোমাদেরই
প্রেমানন্দ।

(৫)

৺কাশীধাম।
৩।১।১৭

পরম স্নেহভাজনেষু

তোমার পত্র পেয়ে সকল অবগত হলাম। ঠাকুরের কথা পড়েছ ত?—"খানদানি চাষা" হতে হবে। এক বৎসর ধান ভাল হল না বলে যে হাল গরু বিক্রী করে বসে থাকতে হবে তার

মানে কি? লেগে থাক্‌তে হবে। ধ্যান জম্‌বে না বলে একেবারে হতাশ্বাস হওয়া ভক্তের লক্ষণ নয়। ভক্ত প্রভুকে সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, শান্তি অশান্তিতে সকল সময়েই ধরে থাকে।

"মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে" —একথা ঠাকুর বল্‌তেন। সেই জগদ্‌গুরুকে ধরে থাক্‌তে পার্‌লে তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দেন, তাঁহার পাদপদ্মে অনুরাগ প্রেম প্রভৃতি দান করে থাকেন। অতএব যে সর্ব্বদা তাঁর স্মরণ মনন রাখে তার আর কিসের দরকার।

আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। শ্রী হরি মহারাজ এখানে আলমোড়া থেকে এসেছেন। তাঁর শরীর এখন একটু অসুস্থ। একটু সার্‌লেই আমরা সকলে একত্রে মঠাভিমুখে রওনা হব। আমাদের শরীর এখন মন্দ নয়। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদাদি জান্‌বে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
প্রেমানন্দ।

(৬)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।
৭।২।১৭

প্রিয়—

তোমার পত্র পড়্‌লাম। মানুষ সংসারের দাস সত্য, তবে 'শুদ্ধা বুদ্ধি দাও, প্রভু!' বলে প্রার্থনাও কর্‌তে হয়। যাই হক, কারু দোষ নেই। কে জানে তুমিই হয়ত একদিন ভাল হবে! খেল্‌চেন ভগবান্ মুখোস্ পরে। আমি তুমি সবাই সংস্কারের বশেই চলেছি। যাঁর সংসার তিনিই দেখ্‌বেন ও দেখ্‌ছেন।

'প্রভু! জগতে শান্তি দাও' এই আমাদের সর্ব্বদা প্রার্থনা।

"আমি জেনেছি শুনেছি আশয় পেয়েছি বুঝেছি তোমারই চাতুরী।
আমি ঐ খেদে খেদ করি, মা তারা, ঐ খেদে খেদ করি॥"

আমরা মঙ্গলময়ের হাতের খেলুড়ে মাত্র। গোবিন্দ ভরসা।

শুভানুধ্যায়ী
প্রেমানন্দ।

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
২০।২।১৭

কল্যাণবরেষু—

দু— তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তুমি এই মূর্খের লেখা পত্রখণ্ড মহাপণ্ডিত ভক্ত অ—বাবুকে দেখিয়েছ শুনে আমার সরম হচ্ছে। শ্রীযুক্ত হরি মহারাজের মুখে ভক্তবীর অ—বাবুর খুব সুখ্যাতি শুনলাম। জগতে ভক্তি বিশ্বাসই আসল ধন, আর সব ঐহিক ধন ঐশ্বর্য্য মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধাস্পদ অ—বাবুর দেহ কেমন আছে লিখো। ভগবান্ ভক্তদের সুস্থ রাখুন এই সতত প্রার্থনা।

তোমার হাইস্কুল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই হ—র মুখে শুনেছিলাম। বিদ্যালয়স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যা ও জ্ঞানদান যত পার করে যাও। ইহা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ছিল। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ পুরুষ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন তাঁহারা মনুষ্যদেহধারী দেবতা। তাঁহারাই নিষ্কাম কর্ম্মী, তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক, তাঁহারাই ধন্য এ ধরায়।

একটা বিদ্যালয়, দু'চারটে সেবাশ্রমে হবে কি? ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা কর, সেবাশ্রম স্থাপন কর। প্রভুর কাজ প্রভুই করেন, এইটী সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। যেই 'আমি' 'আমার' উঁকি মারবে অমনি প্রভু পালাবেন। সব পণ্ড হয়ে যাবে। তাই বলি সাবধান, সাধু সাবধান! ঐ 'কাঁচা আমি' হতে সাবধান।

এই কাঁচা পচা 'আমি'টাকে যদি ঠাকুরের কৃপায় তাঁর উপর বিশ্বাস করে, প্রার্থনা করে একবার পাকিয়ে নিতে পার তবেই হবে কর্ম্মযোগী। তখন আর কর্ম্মে বন্ধন হবে না। দেখ্‌বে নিজে একটা যন্ত্রমাত্র— উপাধিরহিত। রোগ বড় শক্ত কিন্তু রোজাও খুব পোক্ত। রোজার নাম নিলেই রোগ পালায়। প্রাণ মন এক করে গাও তাঁর গান— গাও প্রভুগুণগান। * * এই যে দেখ্‌চ বড় বড় লড়াই, ওর গোড়ায় 'আমি' 'আমার' বড়াই। "মৈ ভরোসে আপনে রামকো আউর কুচ নেহি কামকো"। রামের উপর ভরসা রেখে যা কর্‌বে তারই জয়। মানুষের উপর নির্ভর কর্‌লেই হয়ে যাবে ক্ষয়।

যদি বুঝে থাক, ঠাকুর কচ্ছেন ও করাচ্ছেন তবে আর কাহার ভয়। ভগবান্‌ ভক্তি দিন, শক্তি দিন তোমাদের, এই মাত্র প্রার্থনা। তোমরা সবাই আমার ভালবাসা জান্‌বে। * * * ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী, ১২ই মাঘ, রবিবার বেলুড়স্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামীর সপ্তপঞ্চাশং বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইবে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের বঙ্গে বস্ত্রবিতরণ কার্য্য চলিতেছে। মধ্যে বস্ত্রের মূল্য কথঞ্চিৎ সস্তা হওয়ায় আশা করা গিয়াছিল, হয় ত উক্ত বিতরণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। কিন্তু দুঃখের

বিষয় বস্ত্রের মূল্য পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন আসিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশন বস্ত্রবিতরণ কার্য্য স্থগিত না রাখা সঙ্গত স্থির করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীর সেবায় সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।

গত পৌষ সংখ্যায় যে বস্ত্রবিতরণবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিতরণের জন্য বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে ও তথায় বিতরণ কার্য্য চলিতেছে ঃ—

গৌরনদী (বরিশাল) ২৯ জোড়া ; কলমা (ঢাকা) ২০ জোড়া ; পাকং (ফরিদপুর) ২৫ জোড়া ; ইতনা (যশোহর) ৩১ জোড়া ; গড়বেতা (মেদিনীপুর) ১৫½ জোড়া ; শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মেদিনীপুর ৬২ জোড়া ; মালদহ ৩১ জোড়া ; বারুইপুর (২৪ পরগণা) ১১ জোড়া ; আঝাপুর (বর্দ্ধমান) ২০½ জোড়া ; দিঘীরপাড় (ঢাকা) ২০ জোড়া ; শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) ৫০ জোড়া ; লোজং (ঢাকা) ৩০ জোড়া ; চট্টগ্রাম ৩১ জোড়া ; মঠবাড়ী (খুলনা) ৩০ জোড়া ; সলপ (পাবনা) ৬০ জোড়া।

উল্লিখিত স্থানগুলিতে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই বস্ত্রবিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই মিশন আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত পৌষ সংখ্যার উদ্বোধনে "স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি" নামক প্রবন্ধে ৭১৭ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে "স্বামীজির অপর ভক্ত Miss Henrietta Muller এর অর্থে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়।" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইঁহার অর্থেই মঠস্থাপনা হয় নাই। স্বামীজির যে কয়েকজন পাশ্চাত্য ভক্ত উহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম।

কর্ম্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

(জনৈক ব্রহ্মচারী।)

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

আমরা প্রবল কর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি—আমাদিগকে কাজ করিতেই হইবে। কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্ম্মস্পৃহা বা কর্ম্মের বাসনা রহিয়াছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায় ততদিন কাহারও বিশ্রাম নাই। আমাদের অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত বাসনাই আমাদিগকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জন্মের পর জন্ম কাণে ধরিয়া ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, নাচাইতেছে—ইহাই আমাদের নিষেকাদিশ্মশানান্ত চেষ্টার প্রবৃত্তি। ব্যষ্টি জীবনের ন্যায় সমষ্টি জীবনেও যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু আন্দোলন—Civilisation বল, Patriotism বল, Socialism বল, Militarism বল,—পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছে সকলের মূলে সেই বাসনা। তাই কবি গাহিয়াছেন—"বাসনায় জগৎসৃজন।"

এই বাসনা কোথা হইতে আসিল? অভাববোধ—অপূর্ণতার বোধ হইতেই বাসনার সৃষ্টি। পূর্ণ যে সে আর কি প্রার্থনা করিবে? তাহার কোন অভাব বোধ নাই—কিছুই প্রার্থনীয় নাই সুতরাং কোন চেষ্টা বা কর্ম্মও নাই। অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্ম্মের সৃষ্টি, তখন যাহা কিছু আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা

কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি উদাসীন করে, তাহাই সৎকর্ম্ম এবং তাহাই আমাদিগকে উদার করে। আর যাহা কিছু আমাদিগকে অপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা কিছু "আমি আমার" হইতে প্রসূত—যাহা কিছু অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ কর্ম্ম এবং তাহাই আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" বাস্তবিক কর্ম্মরহস্য অতি জটিল। কিন্তু সদসৎ কর্ম্মের উপরোক্ত সংজ্ঞা মনে রাখিলে আমরা সহজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি। আর আমরা উদার হইতেছি কি সঙ্কুচিত হইতেছি আমাদের নিজের মনই তাহার প্রধান সাক্ষী।

উপরে সদসৎভেদে কর্ম্মের দুইটী বিভাগ করা হইল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম জিনিসটা সৎও নহে অসৎও নহে—সদসৎ আমাদের মনে। একই কর্ম্ম উদ্দেশ্যভেদে প্রবৃত্তিভেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। হত্যা করা খারাপ কিন্তু ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিয়া অত বড় কুরুক্ষেত্র সমর করাইলেন, তাহা নিশ্চিতই খারাপ নহে। কারণ, ক্ষাত্র-শক্তির হস্ত হইতে সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণরূপ তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান্ ছিল। সেইরূপ কর্ম্মের মধ্যে ছোট বড়ও নাই। যে জুতা সেলাই করিতেছে সে ছোট কাজ করিতেছে এবং যে চণ্ডীপাঠ করিতেছে সে বড় কাজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। উভয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। উহা যদি নিষ্কাম হয় তবে উভয়ই মহৎ। উভয়ই আমাদের ভববন্ধন ছেদন করিতে সহায়তা করিবে—উভয়ই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। সকাম কর্ম্ম, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যতই বড় হউক না কেন, বন্ধন আনয়ন করে। অতএব কি কর্ম্ম করিতেছি—না করিতেছি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিয়া কি ভাবে উহা করিতেছি তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথাবার্ত্তায় আমাদের ভাবশুদ্ধ হওয়া চাই—আমাদের

আসক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—ইহাই কর্ম্মযোগ। এই ভাবশুদ্ধিতেই মানুষে মানুষে প্রভেদ, মানুষে দেবতায় প্রভেদ, দেবতা ঈশ্বরে প্রভেদ। যাহার যত ভাবশুদ্ধ তিনি ততই ভগবানের নিকটবর্ত্তী, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি তত অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহার ভাব পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

এই ভাবশুদ্ধি সাধন করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার প্রবল উৎসাহ রহিয়াছে অথচ যাঁহারা ঈশ্বরে বা অপর বহিঃশক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা নিজ মনকে অনাসক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। আর যাঁহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী, তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিবেন, কারণ, সমস্তই ত তাঁহার। আপনাকে প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিশ্বাসে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে। যাহা কিছু আমার বলিয়া মনে উঠিবে তখনই তাহা প্রিয়তমের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—

যৎ করোতি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

ইহ পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার—জীবন মরণের সাথী। আর যাহা কিছু,—সকলের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে 'আমার' ভাবিয়া দুঃখের সৃষ্টি করা নির্ব্বোধের কার্য্য। এইরূপে যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, সকল অবস্থাতেই অচল অটল সুমেরুবৎ অবস্থান করিতে পারিব।

আর যাঁহারা জ্ঞানী—বিচারপথ অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নির্লেপ, সর্ব্বকার্য্যকারণাতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই ভাবশুদ্ধির জন্য "বিপরীত দৃষ্টি" করিবেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যুক্ত ও সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই কর্ম্মের আশ্রয় কিন্তু সেই দেহাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল আত্মাতে আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবিয়া থাকে যে 'আমি কর্ত্তা, আমার ইহা কর্ম্ম, আমি ইহার ফলভোগ করিব।' এই প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারনিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তিজনিত সুখিত্বও আত্মাতে আরোপ করিয়া (ভ্রান্ত জীব) বোধ করিয়া থাকে যে, 'আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, এবং (নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রযুক্ত) আমি এক্ষণে সুখী' ইত্যাদি। সেই এই প্রকার স্বভাবাক্রান্ত সংসারের লোকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন।*"

পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামিজী এই কর্ম্মযোগ পথে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম্মী এবং প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন।" এই আত্মসংযম খুব কঠিন বলিয়া দুর্ব্বল মানব যাহাতে সহজে ঐ পথে চলিতে পারে, যাহাতে সহজেই কর্ম্মে আসক্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য তাঁহার ঐশীজ্ঞানলব্ধ অমূল্য অভিজ্ঞতারাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। কিন্তু জগতের দুঃখ দূর করিব ইত্যাদি অভিমান থাকিলে কর্ম্মফলে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কৃত অনুবাদ।

স্পৃহা আসিবেই আসিবে। তাই কর্ম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিবার সহজ উপায়, আমরা যে চক্ষে জগৎটা দেখি সেই দৃষ্টিটাই বদ্‌লাইয়া দেওয়া। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—এ জগৎটা একটী Moral gymnasium বা নৈতিক ব্যায়ামশালা। জগং জগৎই থাকিবে মধ্য হইতে আমরা ভাল হইয়া যাইব। ইহারও দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জগৎকে কুকুরের ল্যাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন—উহা যেমন হাজার চেষ্টা করিলেও সোজা করিতে পারা যায় না, ছাড়িয়া দিলে যেমন বাঁকা তেমনই হইবে, সেইরূপ শত শত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলেও জগতের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, কিছুমাত্র দূর হইবে না—উহা বাতব্যাধির ন্যায় শরীরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। তথাপি স্বামিজী বলিতেছেন, আমাদিগকে সর্ব্বদাই সৎকার্য্য করিতে হইবে—পরোপকার করিতে হইবে। কারণ, উহাতেই আমাদের পরম কল্যাণ।

এতদিন 'জীবে দয়া' কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, কিন্তু স্বামিজী বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও দয়া করিতেছি" এ ভাবও ঠিক নহে, কারণ, দয়ার ভিতর ছোট বড় ভাব থাকে। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কতটুকু শক্তি যে দয়া করিব! আমার দয়া করিবার অধিকার কি? যিনি এত বড় সংসার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্য তোমার আমার মত লোকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। 'কোন দরিদ্রই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি। কারণ, সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে।' তোমার আমার জন্মিবার পূর্ব্বেও সৃষ্টি চলিয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিবে। সুতরাং আমাদের দয়া-করা-রূপ অভিমানের স্থান কোথায়? তাই তিনি বলিয়াছেন, "সেবা কর"। জীব তুচ্ছ দয়ার পাত্র নহে—জীব সাক্ষাৎ শিব। সেই বাক্যমনাতীত ভগবান্ তোমার সম্মুখে তোমার পূজা লইবার জন্য বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহার সেবা করিয়া—নরদেহে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হও। তাই তিনি

বলিয়াছেন, "তোমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব ইত্যাদি কিন্তু আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক।"

কর্ম্ম জিনিসটী বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে চলিবে না। কর্ম্মদ্বারাই আমাদিগকে কর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে সৎকর্ম্মরূপ কাঁটা দ্বারা অসৎ কর্ম্মরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মরূপ উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হইবে। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ হয় না। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে।" তাঁহার মতে *Struggle is life*—চেষ্টাই জীবন। ভাল হইবার জন্য চেষ্টা কর, তাহাতে খারাপ হয় হউক—ভয় নাই—ফের চেষ্টা কর, ইহাই জীবন। তমঃ হইতে সত্ত্বে যাইবার ইহাই একমাত্র উপায়—আমাদিগকে রজোগুণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। অধিকাংশ লোকই তামসিক ও রাজসিক। সাত্ত্বিক লোক নাই বলিলেই হয়। মুখের কথায় এই সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয় না—দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তবে ধীরে ধীরে তামসিক হইতে রাজসিক, রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তাই স্বামিজী বলিতেছেন, "কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ জগতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।"

কিন্তু আমরা এ অবস্থার মর্য্যাদা বুঝি না, আমাদের বুঝিবার শক্তিই বা কোথায়? আমরা অহঙ্কারবশতঃ মনে করি, আমাদের সাত্ত্বিক অবস্থা—আমাদের কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক এইরূপে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে—ভাবিতেছে—আমরা ভগবানের প্রিয়পাত্র, ভগবান্ ভক্তবৎসল, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন—আমাদের দেশের দুঃখদারিদ্র্য, রোগশোক দূর করিবেন। ভগবান্ ত আর ভক্ত চেনেন না—তাই আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে! নির্ব্বোধ আমরা নিজের চক্ষে ধূলি দিয়াছি, আবার ভগবানের চক্ষেও ধূলি দিতে চাহি! কিন্তু তিনি চক্ষুষ্মান্—তিনি উত্তম বৈদ্য! তিনি জানেন, কোন্ রোগের কি ঔষধ এবং তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতেছেন। কেন আজ সুজলা সুফলা ভারতভূমি করাল দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উজাড় হইতে চলিতেছে? কেন আজ গৃহে গৃহে হাহাকার, নিত্য নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে? ইউরোপ না হয় মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে—আমাদের দেশে ত মারামারি কাটাকাটি নাই—তবে আমাদের মৃত্যুর হার পৃথিবীর সমুদয় দেশ অপেক্ষা এত অধিক কেন? কেন এক দুর্ভিক্ষে, এক ম্যালেরিয়ায়, এক ইনফ্লুএনজায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ইউরোপীয় মহাসমর অভিনীত হইতেছে! কেন—তাহা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে! স্বামিজী বলিয়াছেন, আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দেশের কোটী কোটী দরিদ্র ও নারী জাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি—ইহাই আমাদের National sin (জাতীয় পাপ) এবং তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপর দাসসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও দুর্ব্বলতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ ও জড় করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি—নিজেরাই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছি। আমরা বুঝিয়াছি সংহতিই শক্তি—কোন একটা বড় কাজ, নূতন কাজ

করিতে গেলে দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা দরকার। ঐরূপ কাজও কয়েকটা আরম্ভ হইল—হাজার হাজার, টাকাও সংগৃহীত হইল, কিন্তু দু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহাদের সবগুলিই নষ্ট হইল! ইহার কারণ কি? পাশ্চাত্যের নিকট হইতেই আমরা এই Co-operation শিক্ষা করিয়াছি। কই, তাহাদের দেশে ত এরূপ হয় না! চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোর স্বার্থপরতা ইহার মূলে বিদ্যমান। দুই শতাব্দী বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এতদিনে আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু হায়, তাহাদের প্রত্যেক দোষটী আজও পূর্ণমাত্রায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে!

অতএব আমাদিগকে সযত্নে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে। আমাদিগকে আলস্য, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। সমস্ত দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে সারা দেশ নিদ্রায় অচেতন। আমাদের স্বদেশহিতৈষণা, আমাদের কংগ্রেস, আমাদের হোমরুল এজিটেসন, সেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপোক্তিমাত্র। বলিতেছি না আমাদের শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই—বলিতেছি না আমাদের সাহস নাই—আমাদের সবই আছে। কিন্তু আমরা সে শক্তি, সে বুদ্ধি, সে সাহসের ব্যবহার করিতেছি কই? বিনা ব্যবহারে উহাতে 'মর্চ্চে' পড়িয়া গিয়াছে—উহাদিগকে আবার ব্যবহার দ্বারা ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিতে হইবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্তসম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

আমাদের সম্মুখে যে অনন্ত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের উপর যে গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের উপর কোনও কালে এরূপ গুরুভার ন্যস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া যাইতেছে। গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিলে দুই চারিটা ড্রেণ কাটিয়া জল নিকাশের পথ

পরিষ্কার করিয়া দিলে এবং পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আট আনা কমিয়া যায়। আমরা অনেকেই ইহা বুঝি এবং এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু একটা গ্রামে গিয়া যথার্থ কাজ আরম্ভ করিতে রাজি নহি।—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

দেশের কোটী কোটী শ্রমজীবিসম্প্রদায় এক বিন্দু বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে—বৃষ্টি হইল না—শস্য শুকাইয়া গেল। ফলে কোটী কোটী নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল! গোটাকতক খাল কাটিয়া দিলে হয়ত তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত কিন্তু গ্রামবাসীর সে একতা, সে উদ্যম নাই! আমরা ইহার জন্য অপরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি।—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

গ্রামের মধ্যে যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা নিজের পুত্রকন্যাকে সহরে লইয়া গিয়া বিপুল অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন কিন্তু গ্রামের শত শত বালকবালিকা যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে সে দিকে কাহারও খেয়াল নাই। পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশনে, বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করিলে যে পার্শ্ববর্ত্তী ১০।২০ খানি গ্রামের বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহা জানিয়াও কেহ তত্টুকু স্বার্থত্যাগ করিতে রাজি নহেন! তাহাও অপরে করিবে তবে হইবে! নিজের ক্ষমতা থাকিতেও পরের মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—"Feed the poor and educate the masses." ভারত অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখ এবং শিক্ষা দাও। "Teach them through the ears and not through the eyes. If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must to the mountain." অর্থাৎ দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট আসিতে না পারে,

তুমি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাও এবং মুখে মুখে গল্প করিয়া, ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ছবি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কর। "Let these be your gods." হে দেশবাসি তোমরা কি কেহ সেই মহাপুরুষের কথায় কর্ণপাত করিবে না?

সন্ধ্যাবিধির দুইটি মন্ত্র।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

দেশ ও কালের যে ক্ষুদ্র অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমাদের মন সাধারণতঃ সেই ক্ষুদ্র অংশেই আবদ্ধ থাকে, আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাহিরে দেশ এবং কালের যে অসীম বিস্তার রহিয়াছে, তাহাও যে আমাদের অনুভূত দেশ এবং কালের ক্ষুদ্র অংশের ন্যায়ই সত্য, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যথেষ্ট নহে বলিয়া আমরা ঐ অসীম দেশ ও কালের ধারণা করিতে পারি না,—ইহা আমরা সচরাচর ভুলিয়া যাই। ইহার ফলে আমাদের অনুভূত দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ ঘটনাগুলিকে আমরা অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়া থাকি। যাহা ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর তাহাকে আমরা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া কল্পনা করি, যাহা বিনশ্বর ও অত্যল্পকালস্থায়ী তাহাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া মনে করি। আমাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের হর্ষ বিষাদ,—বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জগৎব্যাপারের সহিত তুলনায় তাহারা কি ক্ষুদ্র! যাহা পরিমিত ও ক্ষণস্থায়ী আমরা সংসারে তাহার জন্যই ব্যাকুল হই, তাহা পাইলে মনে করি বিলক্ষণ সুখ হইল, তাহা না পাইলে মনে করি জীবন অসুখী হইয়া গেল, কিছুই পাইলাম না। কিন্তু সংসারের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমাদিগকে বেশী দিন সুখী করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাদের অভাবে আমাদের প্রকৃত দুঃখের কারণ নাই।

"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"

—যাহা অসীম তাহাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

"যেহিসংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

সাংসারিক সুখ সকল "আদ্যন্তবান্", সে সুখ যখন ফুরাইয়া যায় তখন দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সকল তথাকথিত সুখের মোহে পড়িয়া আমরা যাহা প্রকৃত ও অনন্ত সুখলাভের হেতু তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকি।

এই সকল ক্ষুদ্র সুখের মোহ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় আমাদের মানসিক ক্ষেত্র (Mental horizon) উদারতর করা। আমাদের মানসিক ক্ষেত্র যত উদার হইবে—জগৎ ব্যাপারের যত অধিক অংশ আমাদের মনের গোচর হইবে, আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ততই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমরা ততই সেই সকল সুখদুঃখের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক ক্ষেত্র উদারতর হয় এবং সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ ঘটে। আমরা ভূগোল পাঠ করিয়া জানিতে পারি আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে কত নদনদী সাগর পর্ব্বতসমন্বিত বিচিত্র দেশ রহিয়াছে, সেখানে কত কোটি কোটি লোক তাহাদের সুখদুঃখ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে পারি যুগে যুগে কত লোক পৃথিবীতে আসিতেছে এবং "দুদিনের হাসিকান্নার" পর পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যাবন্দনার দুইটি মন্ত্র আছে তাহারা আমাদের মানসিকক্ষেত্র বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করে। একটি মন্ত্রের দ্বারা কালের গণ্ডী এবং অপরটির দ্বারা দেশের গণ্ডী শিথিল হয়। দুইটি মন্ত্রই সন্ধ্যাবিধির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, কারণ তাহাদিগকে একাধিকবার আবৃত্তি করিতে হয়। প্রথম মন্ত্রটি এইরূপ—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্র্যজায়ত ততো সমুদ্রোঽর্ণবঃ

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত,
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্যমিষতোঃ বশী
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং অথ স্বঃ॥

এই মন্ত্রে সৃষ্টি ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে কিছুই নাই—নিগুর্ণ নিরাকার নিরুপাধি ব্রহ্ম রহিয়াছেন—তাঁহার প্রদীপ্ত ধ্যান হইতে সত্যের প্রকাশ হইল—রাত্রির সৃষ্টি হইল—সমুদ্রের সৃষ্টি হইল—সম্বৎসর হইল—সূর্য্য ও চন্দ্র হইল—স্বর্গ মর্ত্ত আকাশ সকলই আবির্ভূত হইল। এই মন্ত্রে অল্প কথায় বায়স্কোপের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায়—যুগযুগান্তব্যাপী ঘটনাবলির একটি চিত্র হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ,' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে এই সকল পদার্থ যেমন ছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ পদার্থ সকল আবির্ভূত হইল। সুতরাং এই মন্ত্রে কালের যে পরিমাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বর্ত্তমান সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে তাহার আরম্ভ। বাস্তবিক এখানে অনাদি কালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কালের স্রোত অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহমান, তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অনন্ত কালসাগরে আমাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য কোথায় হারাইয়া যায়!

দ্বিতীয় মন্ত্রটি এইরূপ—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহ ওঁ জন ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ
ওঁ আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।

বাস্তবিক ইহা সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরা এই তিনটি মন্ত্রের সমষ্টি। সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র। অতএব এই মন্ত্র দ্বারা আমাদের মন পৃথিবীলোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বায়ুলোক, বরুণলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বময় প্রসারিত হইবে। আমাদিগকে

ধ্যান করিতে হইবে—যিনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। এই ভাবে নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের যোগস্থাপন করিলে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সমগ্র জগৎব্যাপারের এক অংশ এবং অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ হইয়া পড়িবে।

এই দুইটি মন্ত্রদ্বারা আমরা অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব। অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিলে সংসারের পরিমিত ও "আদ্যন্তবান্" সুখদুঃখগুলি আমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাদের প্রতি আমাদের কোন আসক্তি থাকিবে না এবং সংসারের শোকদুঃখ ও তুচ্ছ ভোগাকাঙ্ক্ষার পরপারে যে অমৃতলোক অবস্থিত সেই অমৃতলোকের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

(৩০)

তত্ত্বসংখ্যা।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, তত্ত্বসংখ্যা নানাবিধ কেন?

বিভিন্ন তত্ত্বসংখ্যার হেতু।

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥

ভগবান্ বুঝাইলেন, এক তত্ত্বে অপর তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট, কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্ব

অনুপ্রবিষ্ট। এজন্য তত্ত্বের বিভিন্ন সংখ্যা হয়। কেহ কারণতত্ত্ব বলিল। কারণে কার্য্য অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহা দ্বারা কার্য্যতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কার্য্যতত্ত্বগুলি বলিল। কার্য্যে কারণ অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহাদ্বারা কারণতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভগবানের মতে তত্ত্ব আটাশটী।

তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

নয়টী কারণ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, পৃথ্বী তন্মাত্র।

এগারটী সূক্ষ্ম কার্য্য—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, প্রাণ, জিহ্বা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর উভয়াত্মক মন।

পাঁচটী স্থূল কার্য্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়।

(৩১)

পুরুষ প্রকৃতি।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, প্রকৃতি ছাড়া পুরুষের উপলব্ধি হয় না—দেহ ছাড়া চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, চৈতন্য ছাড়া দেহের উপলব্ধি হয় না। অতএব প্রকৃতি পুরুষ কি এক না ভিন্ন?

ভগবান্ বলিলেন,—প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু।

প্রকৃতি ত্রিবিধ।

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিদ্ধ্যতি।

চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, আর চক্ষুগোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশ রূপ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অধিদৈব। প্রকাশকার্য্য এই তিনের সংযোগে সিদ্ধ হয়। অতএব প্রকৃতি অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব।

পুরুষ স্বপ্রকাশ।

স্বয়ানুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।

পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশের দ্বারা নিখিল পরস্পরপ্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক।

(৩২)

জন্মমৃত্যু।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—জন্মমৃত্যু কি?

মৃত্যু।

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥

ভগবান্ বলিলেন, পূর্ব্বদেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু।

জন্ম।

জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন...বিষয়স্বীকৃতিম্॥

পুরুষের আপনার সহিত সম্পূর্ণ অভেদভাবে যে বিষয়স্বীকার বা দেহাভিমান তাহাই জন্ম।

জন্মমৃত্যু নাই।

যা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।

ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নিদারুসংস্থিতঃ॥

পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জন্মানও না বা মরেনও না কিন্তু ভ্রান্তি হেতু প্রতীতি হয় যেন জন্মান ও মরেন। মহাভূত রূপ অগ্নি আকল্পান্ত অবস্থিত হইলেও কাষ্ঠ সংযোগ ও বিয়োগে যেরূপ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় পুরুষের জন্মমৃত্যুও সেইরূপ।

আত্মার কর্ম্ম নাই।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।

চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ॥

.........তথা সংসার আত্মনঃ॥

জল চঞ্চল হইলে তটস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও যেমন চঞ্চল বোধ হয়, চক্ষু ঘূর্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আত্মার সংসার বন্ধনও মনঃকল্পিত।

সংসার স্বপ্নে অনর্থাগম।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥

যেরূপ বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নে সর্পদংশনাদি নানা অনর্থ দর্শন হয় সেইরূপ বাস্তবিক বিষয় না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হইতেছে না।

(৩৩)

তিরস্কার সহনের উপায়।

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুককে লোকে অত্যন্ত পীড়া দিত। দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কেবল মাঝে মাঝে একটী গান গাহিতেন—

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং কচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

মানুষ যদি সুখ দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কর্তৃত্ব কি? সে কর্তৃত্ব ভৌতিক দেহের—এক দেহ আর এক দেহের সুখদুঃখ উৎপাদন করিতেছে। নিজ দন্ত দ্বারা যদি জিহ্বা দংশন করা যায়, তবে সেই বেদনার জন্য আবার কাহার উপর রাগ করিব?

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে কচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি সুখদুঃখের হেতু হয় তাহাতে আত্মার কি? কারণ, সুখদুঃখ উভয়ই দেবতার। মুখে হস্ত প্রদান করিলে মুখ যদি উহা দংশন করে, তাহা হইলে বাগাভিমানিনী দেবতা বহ্নি ও হস্তাভিমানিনী দেবতা ইন্দ্রই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু কে ইহার জন্য স্বদেহাভিমানী দেবতার উপর রাগ করিয়া থাকে.

(৩৪)

দুঃখ সহ্য করিবার উপায় সাংখ্য।
সাংখ্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় চিন্তা করা।

স্থষ্টি।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ এক বিকল্পশূন্য ব্রহ্মে লীন ছিল।

তিনি মায়ার সহায়ে প্রকৃতি পুরুষ রূপে দ্বিধা হইলেন।

প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপিণী, পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ।

প্রকৃতি হইতে তিন গুণ উৎপন্ন হইল।

তিন গুণ হইতে মহত্তত্ত্ব হইল।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস।

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক প্রভৃতি দেবগণ ও মনের স্থষ্টি হইল।

রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল।

তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইল।

তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূত হইল।

প্রলয়।

ভূমি জলে লয় হয়।	অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় হয়।
জল তেজে লয় হয়।	মহত্তত্ত্ব গুণে লয় হয়।
তেজ বায়ুতে লয় হয়।	গুণ প্রকৃতিতে লয় হয়।
বায়ু আকাশে লয় হয়।	প্রকৃতি কালে লয় হয়।
আকাশ তন্মাত্রে লয় হয়।	কাল জীবে লয় হয়।
তন্মাত্র অহঙ্কারে লয় হয়।	জীব আত্মায় লয় হয়।

সর্ব্বদা স্থষ্টি-প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য জন্মে ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারা যায়।

(৩৫)

গুণাতীত হইবার উপায়।

গুণোৎকর্ষ দ্বারা অবস্থা ভেদ।

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।

প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥

সত্ত্বগুণ দ্বারা জাগরণ অবস্থা, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থা এই তিন অবস্থাতেই বর্ত্তমান অথচ নির্ব্বিকার অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ।

কর্ম্ম।

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥

ভগবৎপ্রীতির জন্য দাসভাবে কৃত নিত্যকর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফল কামনা করিয়া কৃত কর্ম্ম রাজসিক এবং হিংসাবহুল কর্ম্ম তামসিক।

বাসস্থান।

বনন্তু সাত্ত্বিকং বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

সাত্ত্বিক বাস বনে বাস। রাজসিক বাস গ্রামে বাস, তামসিক বাস যে স্থানে দ্যূতক্রীড়াদি হয় সেই স্থানে বাস কিন্তু ভগবৎনিকেতনে তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হেতু তথায় বাসই নির্গুণ বাস।

আহার।

পথ্যম্ পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

যে আহার্য্য হিতকর, শুদ্ধ ও অনায়াসলভ্য তাহাই সাত্ত্বিক আহার, যাহা ইন্দ্রিয়রোচক তাহা রাজসিক আহার, যাহা কষ্টদায়ক ও অশুদ্ধ তাহা তামসিক আহার, আর ভগবানকে নিবেদিত আহার্য্য মাত্রই নির্গুণ আহার।

রজঃ ও তমোনাশ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ।

মুনি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা দ্বারা রজঃ ও তমঃ নাশ করিবেন।

সত্ত্ব নাশ।

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।

শান্ত ও সংযত হইয়া নৈরপেক্ষ অর্থাৎ অনাসক্ত ভাব দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ সুখ ও জ্ঞানে আসক্তি নাশ করিবে। এইরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।

বৈদিক বিদুষী মৈত্রেয়ী।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

ভারতবর্ষ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ দেশের জ্ঞানে, গুণে, শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া মহামতি মোক্ষমুলার বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে নৈসর্গিক শোভাসম্পদে, ধনরত্নে কোন্ দেশ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলিব ভারতবর্ষ।"

কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। পৃথিবীর কোন্ দেশে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী, ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-শৈব্যার ন্যায় সাধ্বী, ও পবননন্দন হনুমানের ন্যায় প্রভুভক্ত আছে? কোন্ মহাবীর কর্ণের ন্যায় স্বহস্তে স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া অভ্যাগত অতিথির সেবা করিতে পারিয়াছে? প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের মত এ পৃথিবীর কে কবে পিতৃ-সত্যপালনার্থ রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া বল্কলবাসে বনবাসী হইয়াছেন? পৃথিবীর কোন্ দেশের রমণী দাহিরপত্নী ও রাজপুত রমণীর ন্যায় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীর কোন্ দেশের রমণী বৈধব্যাবস্থায় অশেষ কষ্ট ও উপেক্ষা সহ্য করিয়া আহারবিহার ও আচারঅনুষ্ঠানে কঠোর সংযম রক্ষা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতে পারে? বস্তুতঃ এদেশ জগতে অতুলনীয়।

এই ভারতেই মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ জন্মগ্রহণ করিয়া মধুর কাব্যসুধা-দানে দেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই দেশেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানালোকে ভারতগগন উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। এই দেশেই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

চৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, কবীর, নানক, তুকারাম, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি অবতার ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। আবার এই দেশের গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী, প্রভৃতি বিদুষী রমণীবৃন্দের পাণ্ডিত্যের ঝঙ্কারে একদিন শুধু এদেশ কেন সুদূর পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ও ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি জনকের রাজধানী 'জনক-পুর' বিদ্বান্ ও বিদুষীদিগের সমাগমে মুখরিত ছিল। রাজর্ষি জনক বিদ্যানুশীলনের মহাপৃষ্ঠপোষক এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহচর ছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সমাদর জানিতেন এবং তৎকালীন প্রথা-মতে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব "মিত্র" তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য রমণী এই ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক মিত্রেরই দুহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেও অন্যান্য বেদদ্বয়েও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; তিনি এই তিন বেদেরই অধ্যাপনা করিতেন। ইহা ছাড়া ষড়বেদাঙ্গও তাঁহার টোলে অধীত হইত। কিন্তু প্রধানতঃ শুক্লযজুর্ব্বেদের অধ্যাপনাতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৈদিক গ্রন্থে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যাপনাগুণে নানা দিগ্দেশ হইতে বহু ছাত্র বেদশিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার টোলে উপস্থিত হইত। তখন সমাগত ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়াই অধ্যাপকের রীতি ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ীর অনতিদূরে মহর্ষি জনকের সাহায্য-প্রাপ্ত একটী প্রকাণ্ড ছাত্রাগার ছিল। ছাত্রেরা সেইখানে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অভিভাবকত্বে বাস করিত। তিনি প্রতিদিন প্রত্যেক ছাত্রের কার্য্যকলাপ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নিরূপিত সময়ে তাহাদিগকে পড়াইতেন। বলা বাহুল্য, এখানে সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র বংশোদ্ভবসকল প্রকার ছাত্রই থাকিত, তন্মধ্যে প্রাসাদবাসী রাজপুত্র হইতে সামান্য গৃহস্থের সন্তানও ছিল। ছাত্র হিসাবে

সকলকেই সমান ভাবে থাকিতে হইত—ধনী নির্ধন—রাজা প্রজা ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী সকলের পুত্রকেই সমানভাবে সুখদুঃখ সহ্য করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য করিতে হইত। তাহাদের প্রত্যেকের একই প্রকার আহার করিতে হইত—একই প্রকার শয্যায় শয়ন করিতে হইত এবং একই প্রকার ব্যায়াম করিতে হইত। কেবল যাহারা যোদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা বেশী পরিমাণে শিখিত তাহাদের জন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রেরা জাতিভেদ কাহাকে বলে তাহা জানিত না। তাহারা একত্রে একপংক্তিতে পানভোজন করিত—বাগ্দেবীর মন্দিরে সকলেরই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার ছিল।

মিত্র দুহিতা মৈত্রেয়ী জ্ঞানে, গুণে, সৌন্দর্য্যে গার্গী অপেক্ষা বিশেষ হীন ছিলেন না। অবশ্য গার্গী যেমন সহস্র সহস্র শ্রোতা ও দর্শকপরিবেষ্টিত সংক্ষেত্রে যাইয়া বিদুষীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে গভীর জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে কূটতর্ক করিতেন মৈত্রেয়ী ততদূর পারিতেন না। তাহা হইলেও তিনি সমস্ত সভা-সমিতিতে গার্গীর অনুসরণ করিতেন। মৈত্রেয়ীর পিতা মিত্র, যাজ্ঞ-বল্ক্যের সহিত একযোগে একখানি নূতন যজুর্ব্বেদ প্রণয়নে প্রতিদিন একত্র সমবেত হইতেন। গার্গীর ন্যায় মৈত্রেয়ীও সেই স্থানে নিবিষ্ট মনে বসিয়া তাঁহাদের কূটতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিতেন।

একবার রাজর্ষি জনক একটী বিরাট সভার আয়োজন করিয়া তাহাতে দেশের সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভার অনতিদূরে সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ বিশিষ্ট এক সহস্র গো রাখা হইয়াছিল। রাজর্ষি সভায় উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি-লেন—"ভক্তিভাজন ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞ) তিনি এই গোগুলি লইয়া যাউন।" সভায় অনেক বাণীর বরপুত্রের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া তাঁহার জনৈক শিষ্যকে গোগুলি তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন মাত্র ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা।

সেই সভায় অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৈশম্পায়নের প্রিয়শিষ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র পরাজিত হন নাই। সভায় মৈত্রেয়ী ও তৎপিতা রাজসচিব মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্য দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

মৈত্রেয়ী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। যৌবনের রূপ লাবণ্য মৈত্রেয়ীর অঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে, কিন্তু মৈত্রেয়ী জানেন না তিনি যুবতী কি বালিকা। মৈত্রেয়ী যথার্থ ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা জানেন, তাই তিনি পিপীলিকা হইতে বনের বৃক্ষটীকে পর্য্যন্ত ভালবাসেন। মৈত্রেয়ীর চক্ষু আছে, তিনি সেই চক্ষু দ্বারা সুন্দর কুৎসিত সমগ্র বস্তুই দর্শন করেন, কিন্তু সে দৃষ্টি কোন দিকেই আবদ্ধ হয় না। বহির্জগতের কোন বিষয়ই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মৈত্রেয়ী যেন ব্রহ্মচারিণী গার্গীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা।

মিত্র তাঁহার এই তত্ত্বজ্ঞানোন্মাদিনী কন্যাকে কাহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন সেই চিন্তাতেই অহর্নিশ ব্যাকুল। একবার জনকপুরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর যাজ্ঞবল্ক্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। একটা প্রকাণ্ডকায় শার্দ্দূল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার কিছুই জানিতেন না। মিত্র তখন দুইজন ক্ষত্রিয় দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের আশু প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সশস্ত্র রক্ষীদ্বয়কে ব্যাঘ্রটীকে সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহাদের অব্যর্থ শরসন্ধানে ব্যাঘ্র নিহত হইল এবং যাজ্ঞবল্ক্যও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজর্ষি জনকের অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের অসামান্য জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাইয়া মৈত্রেয়ী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি হয় গার্গীর মত আমরণ ব্রহ্মচারিণী থাকিব, না হয় যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী হইব।"

কন্যার এই কথাতে পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাণরক্ষক, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলে অবশ্য তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না—এ চিন্তাও মধ্যে মধ্যে মিত্রের মনে উপস্থিত হইত। কিন্তু মিত্র তত নীচপ্রকৃতির ছিলেন না—তিনি প্রত্যুপকারের আশা করিতেন না।

কাত্যের কন্যা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী। কাত্যায়নী গার্গী বা মৈত্রেয়ীর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু না হইলেও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা ছিলেন। কি করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত স্বামীর চিত্তবিনোদন করিতে হয়—কিরূপে অতিথি অভ্যাগতকে কুশাসন, ভূমি, জল ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় কাত্যায়নী তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহার গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় এত গুণ থাকিলেও যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বদা একটা অভাব বোধ করিতেন—তিনি কাত্যায়নীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া সুখ পাইতেন না।

কাত্যায়নী প্রায়ই শিবিকারোহণে মৈত্রেয়ীর নিকট গমন করিতেন। এইরূপ আসা যাওয়ার ফলে দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বসূত্র আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। একদিন কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন —তোমার বিবাহ যদি আমার বাড়ীর কাছে হয়, তাহা হইলে আমার জীবন বড় সুখে কাটিবে।

মৈত্রেয়ী—আমি যে বিবাহ করিব তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?

কাত্যায়নী—তুমিও অবিবাহিতা থাকিবে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তুমি কি ব্রহ্মচারিণী থাকিতে ইচ্ছা কর? আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবনই ভাল বলিয়া মনে করি।

মৈত্রেয়ী—আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্য জীবন ছাড়া পৃথিবীতে আর কি কিছু করণীয় নাই?

কাত্যায়নী—যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা, দেবতাদের পূজা, ব্রতপালন, উপবাস ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কি করণীয় আছে?

মৈত্রেয়ী—আমি তোমার কথায় মত দিতে পারিলাম না।

কেন, স্ত্রীলোকের কি আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একটা কর্ত্তব্য নহে?

কাত্যায়নী—হাঁ, আমি ইহা স্বীকার করি, কিন্তু গার্গী ভিন্ন কয়জন স্ত্রীলোক এরূপ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন? তাই বলিতেছি, আত্মজ্ঞান লাভ কেবল পুরুষদের সাজে।

মৈত্রেয়ী—আচ্ছা বল দেখি, আত্মা জিনিষটা কি শুধু পুরুষ মানুষেই আছে? আমরা কি আত্মা ছাড়া?

কাত্যায়নী এবার আর হাসি সংবরণ করিতে না পারিয়া সহাস্তে বলিলেন -"না—না—না। আত্মা মেয়েমানুষেও আছে। আত্মা না থাকিলে আমরা কিরূপে কথা বলি, চোখে দেখি, কানে শুনি এবং ভাল মন্দ বুঝিতে পারি?"

মৈত্রেয়ী—আচ্ছা বল দেখি, আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইহাদের উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে আছেন, না পুরুষে কিছু বেশী পরিমাণে আছেন?

হাসিতে হাসিতে কাত্যায়নী বলিলেন, আমি তোমার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। আত্মা সকলের ভিতরেই সমান ভাবে আছেন। আত্মায় স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই।

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, এখন বুঝিলে ত আত্মা স্ত্রীপুরুষ সকলে সমানভাবে বিরাজিত। তবে কেন স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে না? এই বলিয়া মৈত্রেয়ী দুঃখিতভাবে বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রীকে আমার নিকট আত্মজ্ঞান শিখিতে হয় ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

কাত্যায়নী—কি করিব, সংসার লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতে হয়, এ সব শিখিব কোন্ সময়ে?

মৈত্রেয়ী—শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সময় অবশ্য হয়। দেখ, পুরুষেরা সংসার পালনের জন্য দিবারাত্র অর্থচিন্তা করিয়াও মুক্তির কথা ভুলে না, আর আমরা স্ত্রীজাতি সাংসারিক কাজ শেষ হইলেই

আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করি। এর চেয়ে আত্ম-বিস্মৃতি আর কি হইতে পারে ?

কাত্যায়নী—তোমার কথায় আজ আমার ধারণা হইল যে, আত্ম-জ্ঞান লাভ করা পুরুষ জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের যে কেবল গৃহকর্ম্মেই নিযুক্ত রাখে, এটা কি তাহাদের অন্যায় নহে ?

মৈত্রেয়ী—অবশ্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার স্বামী তোমাকে এ সমস্ত বিষয়ও শিখাইয়াছেন।

কাত্যায়নী—হাঁ তাঁহার কোন দোষ নাই, আমিই তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহার কথা কাণে তুলি নাই।

মৈত্রেয়ী—তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। বহুজন্মের পুণ্যফলে এমন স্বামী পাইয়াছ।

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন পরিচারক শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মৈত্রেয়ীর শুভ-পরিণয় হইয়া গেল। সে সময়ে এইরূপ বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বপত্নী কাত্যায়নীর অনুমতি লইয়াছিলেন। কাত্যায়নী বলিয়াছিলেন,"মৈত্রেয়ীর ন্যায় স্বপত্নী পাইলে আমার সুখের অবধি থাকিবে না।" বিবাহের পর মৈত্রেয়ী স্বামীগৃহে যাইয়া পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মচিন্তা লইয়া কালাতিপাত করিতেন। কোন দিনও যুবতীজনসুলভ ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশে স্বামীর কায়িক সুখের অভিলাষিণী হন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীদ্বয়কে লইয়া তপোগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার সহিত নানা প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইতেন। এইভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে যখন রাত্রি অধিক হইত, তখন যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নী শয়নাগারে চলিয়া যাইতেন, মৈত্রেয়ী

সেই তপোগৃহেই বসিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত ভগবৎধ্যানাদি করিতেন।

আমরা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রকৃত স্বামী ও স্ত্রী-দ্বয়ের ধর্ম্মগুরুরূপে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি তিনি আপন সহধর্ম্মিণীদ্বয়কে ভোগের পথে না যাইয়া ত্যাগের পথে যাইতে শিক্ষা দিতেছেন। গৃহের বহির্ভাগে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং গৃহাভ্যন্তরে মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী সহধর্ম্মিণী পাইয়া তিনি বড় সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাত্যায়নী সংসারধর্ম্মে দক্ষতা দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের গৃহস্থালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মালোচনার অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। মৈত্রেয়ী সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ীর কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। আর হইবেই বা কিরূপে? তিনি স্বামীর আত্মজ্ঞানের স্পৃহা আরও বলবতী করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন দিন তাঁহার ভোগাশা মিটাইবার ত সাধ করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংসারত্যাগকালে* মৈত্রেয়ীকে তাঁহার

[* অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাঽহো। নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতাং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি। * * *

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

বৃহদারণ্যক, ৪, ৫।

সম্পত্তির অংশ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া নির্জ্জন বনে যাইয়া ভগবদারাধনা করিতে করিতে নিজের সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ও কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকর্ম্মনিপুণা ছিলেন। এই অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি এই স্থান (গার্হস্থ্যাশ্রম) হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিই।

তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, যদি আমার ধন দ্বারা পরিপূর্ণ এই সসাগরা পৃথিবী লাভ হয় তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, না, খুব ধনী ব্যক্তির জীবন যেরূপ হয় তোমার জীবনও ঠিক সেইরূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের কোনই আশা নাই।"

এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্, যদ্দ্বারা কেবল অমৃতত্ব লাভ হয় এরূপ যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, কেহ কখনও পতির জন্য পতিকে ভাল-বাসে না—পতির মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পতি এত প্রিয় বোধ হয়। কেহ কখনও পত্নীর জন্য পত্নীকে ভাল-বাসে না—পত্নীর মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পত্নী এত প্রিয় বোধ হয়। এইরূপ যত কিছু দ্রব্য বল, তৎসমুদয়ের জন্য তাহারা প্রিয় বোধ হয় না—তাহাদের মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই সেই সমুদয় দ্রব্য এত প্রিয় বোধ হয়। প্রিয়ে, একমাত্র আত্মাই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান করিবার বস্তু। উঃ সঃ।]

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

বেলুড় মঠ।
১৩।৭।১৩

প্রিয়—

সংসার স্বার্থপূর্ণ ইহা ধ্রুবসত্য, কিন্তু যখন সংসারেই থাক্‌তে হবে তখন শুধু "সংসার স্বার্থপূর্ণ" ইত্যাদি বলে বৃথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। একবার ঐবাক্যের সত্যতা খুব ভাল করে চিন্তাযুক্তি সাহায্যে ধারণা করে নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। সংসার স্বার্থপূর্ণ থাকুক্ কিন্তু আমি যেন তাই বলে স্বার্থপর না হই, ইহাই উদ্দেশ্য। স্বার্থ না থাক্‌লে সংসার চল্‌বে কেন? সংসার যখন আছে তখন স্বার্থ থাক্‌বেই, এটা যে একটা বেশী কিছু দোষের তা নয়; কারণ, ভগবান্‌ই সংসার সৃজন করেছেন এবং তাঁর মায়াতেই এই সমস্ত স্বার্থের সৃষ্টি। এখন কথা হচ্ছে যে, নিজেকে স্বার্থহীন হতে হবে। সংসারের দোষ না দেখে, নিজের কি দোষ তাই অগ্রে দেখ্‌তে হবে। পিতামাতার স্বার্থ থাক্‌বে না ত কি থাক্‌বে? তাঁরা তো আর অত নিঃস্বার্থ ভাব বুঝ্‌তে পারেন নাই; তাঁরা চিরকাল স্বার্থ চিন্তা করে এসেছেন, তাই এখনও স্বার্থ খুঁজ্‌ছেন—এতে তাঁদের যে বড় একটা দোষ আছে তা নয়। হোন্ তাঁরা স্বার্থপর—কিন্তু তাই বলে কি আমাদিগকেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ভক্তিহীন হতে হবে? তা যদি হই, তবে আমরা যে নিঃস্বার্থভাবের বড়াই কর্‌তে যাচ্ছি তার অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একজন স্বার্থপর বলে কি আমাকেও স্বার্থপর হয়ে উপযুক্ত সম্মান, ভক্তি, স্নেহ দেখাতে বিরত হতে হবে? এটা একেবারে ভুল। জগতে সমস্ত স্বার্থপরতা সহ্য করে আমাদিগকে স্বার্থগন্ধমাত্রহীন হতে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ। আদর্শ ঠিক থাক্‌লে, মনে এই জোর থাক্‌লে, ধর্ম্মপথ হতে কেউ কাউকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। ধর্ম্মের পথে মন প্রাণ দিয়ে অগ্রসর হন। পথে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আসে

মনে খুব জোর এনে সেগুলিকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করুন। আর দিনরাত প্রার্থনা করুন যে হৃদয়ে জোর—বল—তেজ পান। তেজ না থাক্‌লে কিছুই হবে না—এই তেজরূপ রজঃ হৃদয়ে না আস্‌লে সত্বগুণ কখন আস্‌বে না। আর সত্বগুণ না আস্‌লে ব্রহ্ম কখনও মনে প্রতি-ফলিত হবেন না। নিজেকে প্রথমে বিশ্বাস কর্ত্তে শিখ্‌তে হবে—এই মনে কর্‌তে হবে যে আমরা প্রভুর সন্তান, আমাদের মধ্যে দোষ, স্বার্থ কখনও আস্‌বে না; আস্‌বার চেষ্টা কর্‌লে তখনই মনে জোর এনে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। কর্ত্তব্য কার্য্য করে যান, আর ভগবানের দিকে মন প্রাণ ঢেলে দিন, ক্রমে ক্রমে তিনিই সব সুবিধা করে দেবেন। যদি আন্তরিক হয় তবে সব হয়ে যায়। ঠাকুরের এক একটা ভাব নিয়ে খুব চিন্তা করুন, তার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করে কার্য্যে পরিণত করুন। ঠাকুরের ভাবানুযায়ী কার্য্য করাই ঠাকুরকে মান্য করা, নতুবা শুধু দুটো ফুল ফেলে দিয়ে কিম্বা ভাবে দু মিনিট আহা-হা করে কেউ কখনও বড় হয় নি। ভক্তি খুব থাক্‌বে আর তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতে হবে, অথচ সমস্ত তন্ন তন্ন করে বিচার করে নিতে হবে। বুদ্ধিশক্তিকে পরিচালিত কর্‌তেই হবে নতুবা উপায় নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলেছিলেন, "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?" ইত্যাদি—ঠাকুরের কথাগুলিকে ধ্যান করে করে নিতে হবে। তবে ওর ভিতরের মানে জেগে উঠ্‌বে। অধিক কি, ভয় কিছুই নেই। হল না বলে হতাশ হতে নেই। অসীম ধৈর্য্য চাই, নতুবা এ পথের পথিক কেহই হতে পারে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,
প্রেমানন্দ।

(২)

মঠ, বেলুড়।
১৭।৫।১৪

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। কত লোক

কত দিকে চলিবে, সে সব দিকে কি দেখিতে আছে? "ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকোগম্য স্তমসি পয়সামর্ণব ইব।" কত লোককে কত প্রকারের পথ দিয়ে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন তিনিই জানেন, আমরা কি বুঝিব? আমরা এই World Theatre এ নানা লোকের acting দেখ্‌চি, এই আমাদের কার্য্য। তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে। তুমি অসঙ্কোচে এখানে আসিয়া যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,
প্রেমানন্দ।

(৩)

বেলুড় মঠ।
৬।৭।১৫

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্র— গত কল্য রওনা হইয়াছে। সুধীর মহারাজের যাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিকট সবিশেষ শুনিবে। প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের পূজা সেবা কর। তাঁহার ধ্যানে, জপে ডুবিয়া যাও। তাহাতে যদি মন সমর্পণ না করিতে পার, তবে আর কাশী মক্কা গিয়া কি হইবে? মন দিয়া যদি ডাক তবে ঐখানে বসিয়াই পাইবে, মঠে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, Mission এর regular meeting কি হইতেছে? কাহারও সহিত বিবাদ বিরোধ না করিয়া সকলকেই ঠাকুরের সন্তান জানিয়া সকলকে পরম আত্মীয় ভাবিয়া ভালবাসিয়া চলিয়া যাও। সুখ্যাতি অখ্যাতির দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবে না। যদি কিছু থাকে তো দিয়া যাও, প্রতিদান চাহিও না—কাহারও নিকট কোন আশা করিও না। ভূ- বাবু অতি সুন্দর লোক। সবই সুন্দর, অতি সুন্দর। অসুন্দর কাহাকেও তো দেখি না।***প্রভুর লীলায় তোমাদের আদর্শ জীবন দেখাইবার জন্যই তোমাদের জন্ম এইটী মনে রাখিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,
প্রেমানন্দ।

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৭।৭।১৫

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। মনটাকে রেখে দাও শ্রীশ্রীগুরুর পাদপদ্মে। দেহটা যেখানেই থাকুক্ না কেন ভাবনা কি? "ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে, কোণে"। লম্বা চওড়া কথা কণ্ঠস্থ কর্‌লেও কিছু হয় না, তীর্থে সাধু সঙ্গে পড়ে থাক্‌লেও কিছু হয় না। চাই মন মুখ এক করা। ছি! ডুব্‌বে কেন? ওসব ভাব মনে আস্‌তে দিও না। কত জন্মের সুকৃতির বলে —র আশ্রয় পেয়েছ। তাঁর কৃপা পেলে কি মানুষ কখনও ডোবে? তুমি আবার কতজনকে তুল্‌বে, এই ধারণা দিবারাত্র হৃদয়ে পোষণ কর্‌বে। You are the chosen children of our Lord. নইলে—কৃপা কর্‌বেন কেন? Depression গুলো দূর করে দিবে। ভাব্‌বে——র কৃপায় আমরা নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ।

মিশনের regular meeting হচ্ছে শুনে আনন্দিত হলাম। পাঁচটা লোক যদি এক মন হয় তাহলে পৃথিবীর ভাবরাজ্য বদ্‌লে দিতে পারে। কতকগুলো লোক নিয়ে হৈ চৈ কল্লে হয় না। কিন্তু বিশ্বাসী, সৎসাহসী, নির্ভীক হৃদয়বান্ পাঁচ সাত জন থাক্‌লেই তোমাদের কাজ খুব উত্তমরূপে চল্‌বে। হও তোমরা সব একজন ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর। ভগবানের নামে খুব স্ফূর্ত্তি কর্‌বে। মনে কখনও হতাশ ভাব, অবিশ্বাস স্থান দিও না। লেগে যাও, লেগে যাও, খুব মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের কাজে লেগে যাও। অভিমান আস্‌বার সুযোগ দিও না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

(৫)

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৭।১১।১৫।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত বুধবার প্রয়াগ থেকে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছি। এখন মঠের সকলে ভাল আছে। তোমরা হৃষীকেশে অনেকগুলি জুটেছ—গাজন নষ্ট না হয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, এইটী বিশেষ নজর রাখ্‌বে। তোমরা সবাই সিদ্ধ হয়ে যাও, শ্রীশ্রীপ্রভুর ও পরম উদার স্বামিজীর নাম নেবার উপযুক্ত হও। তোমরা বঙ্গদেশের আদর্শত্যাগী এই ভাবে তোমাদের জীবন প্রস্তুত করতে হবেই হবে। কেবল পরের ঘাড়ে চড়ে তীর্থভ্রমণ, উত্তম ভোজন ও দুচারটী বচন ঝাড়্‌বার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। ঘোর তপস্যায় লেগে যাও, অভিমান ধ্বংস করে বস্তু লাভ করে তবে ফিরবে। ভারত—কেবল ভারত কেন, সারা ভুবন তোমাদের দেখে অবাক্ হবে, আচার্য্যের স্থানে বসাবে। তবেই তোমরা বেলুড় মঠের সাধুভক্ত। নতুবা পেটের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সাধু হিন্দুস্থানে প্রচুর। হও পবিত্র, হও অকপট; আর প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর বলে। পরম দয়াল প্রভু বল দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অন্তর থেকে ডাক তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। রা—প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে ও তুমি জান্‌বে। আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখ্‌তে—শেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎ মন বুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা। হরি মহারাজের শরীর তত ভাল না থাকায় তারক দাদার সহিত ৺কাশীতে আছেন। তাঁহার সহিত অতি আনন্দে প্রভুর প্রসঙ্গে দিন কাট্‌তো। মহারাজ তাঁহাদের এখানে আন্‌বার জন্য চেষ্টা করবেন। শু—ঢাকায় এক অভিনব জাগরণ আনয়ন করেছে শুনলাম। আহা! প্রভুর নামে লোক জাগুক্,

নবজীবন প্রাপ্ত হোক্, মোহ কেটে যাক্, আনন্দ লাভ করুক্—এই প্রেমানন্দের আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

নারদ একসময়ে সত্য জানিবার নিমিত্ত সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এপর্য্যন্ত কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন?" নারদ উত্তরে বলিলেন যে, তিনি সমুদয় বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তি হইতেছে না। পরে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; ঐ প্রসঙ্গে সনৎকুমার বলিলেন—বেদ, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি যাহা কিছু বল, সমস্তই অপরা বিদ্যা,—সমুদয় বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যাহা দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান—তাহাই পরা বিদ্যা। এই ভাবটী সকল ধর্ম্মের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইহেতু ধর্ম্মই চিরকাল পরা বিদ্যার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানের অধিকার আমাদের জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশেই সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা ধর্ম্ম দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা তৎপ্রচারিত সত্যের ন্যায় অনাদি অনন্ত—অসীম। এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতুই ধর্ম্ম অনেক সময়ে সমুদয় অপরা বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে; শুধুই তাহা নহে, অনেক সময়ে অপরা বিদ্যার সাহায্যে নিজ সত্যতা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, সারা পৃথিবী জুড়িয়া পরা বিদ্যা ও অপরা

বিদ্যার মধ্যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—পরা বিদ্যা অপরোক্ষানুভূতিরূপ অভ্রান্ত পথপ্রদর্শকের অধীনে চালিত বলিয়া অপরা বিদ্যার কথায় কর্ণপাত করিতে আদৌ রাজী নহে, আবার অপরা বিদ্যাও তীক্ষ্ণ যুক্তিবিচাররূপ ছুরিকা সহায়ে ধর্ম্ম যাহা কিছু উপস্থাপিত করিতেছে তাহাই কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতেছে। সকল দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। ফলে, ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ বারম্বার পরাজিত ও উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে মানবীয় বিচার বুদ্ধিকে দেবতার আসনে বসাইয়া যে পূজা করা হইয়াছিল মানবেতিহাসে উহাই তাহার সর্ব্বপ্রথম পূজা নহে, ইহা অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে বর্ত্তমানে উহা বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানসমূহ এক্ষণে শ্রেষ্ঠতর যুক্তি দ্বারা স্বীয় ভিত্তিকে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর করিয়াছে এবং ধর্ম্মসমূহ তদভাবে ক্রমশঃ ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে; আধুনিক লোকেরা প্রকাশ্যে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে জানেন যে 'বিশ্বাসের' যুগ চলিয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংঘবদ্ধ পুরোহিত বলিতেছে বলিয়া অথবা অমুক পুস্তকে লেখা আছে বলিয়া কিম্বা লোকে পছন্দ করে বলিয়াই যে তাঁহাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে আধুনিক লোকের পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা তথাকথিত লৌকিক মতে বিশ্বাস করেন কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে তাঁহারা মোটেই চিন্তা করেন না। বিশ্বাস করা রূপ ব্যাপারটীকে "চিন্তাহীনতাপ্রসূত অনবধানতা" বলা যাইতে পারে। এইরূপ সংগ্রাম চলিতে থাকিলে অচিরেই যে সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি? আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, অন্যান্য সমুদয় বিজ্ঞান যেরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মও সেইরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না? পদার্থবিজ্ঞান ও অন্যান্য বাহ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে অনুসন্ধান প্রণালীর অনুসরণ করি, ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কি আমাদিগকে ঠিক

সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে? আমার মতে, ইহাই অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং যত শীঘ্র এরূপ করা হয় ততই মঙ্গল। যদি কোন ধর্ম্ম এরূপ অনুসন্ধানের ফলে বিনষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহা বরাবরই তুচ্ছ নিরর্থক কুসংস্কার মাত্র ছিল; আর এরূপ ধর্ম্ম যত শীঘ্র বিনষ্ট হয় ততই ভাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার বিনাশই জগতের পক্ষে পরম কল্যাণকর। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে, ধর্ম্মের যাহা কিছু হেয়, অকিঞ্চিৎকর তাহা অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে কিন্তু উহার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি যতটা বিজ্ঞানসম্মত উহা যে অন্ততঃ ততটা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অধিকন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইবে। কারণ, ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ আভ্যন্তরিক অনুভূতি—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির সেরূপ কোন প্রমাণ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, আমাদের মনে হয়, তাঁহারা নিজেরাই যেন নিজেদের মত খণ্ডন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খ্রীষ্টানগণ বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, কারণ, ইহা ভগবদ্বাণী এবং অমুকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দাবী করেন এবং ঠিক এই কথাই বলেন কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমানকে বলেন, তোমরা যে নীতি শিক্ষা দাও তাহা কোন কোন স্থলে ঠিক নহে। যেমন দেখ ভাই, তোমাদের কোরাণে বলে, বিধর্ম্মীকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা উচিত এবং সে যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে তবে তাহাকে হত্যা করা উচিত; আর যে মুসলমান এরূপ কাফেরের প্রাণবধ করিবে তাহার যতই পাপ বা দুষ্কৃতি থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।" মুসলমান প্রত্যুত্তরে বলিবেন— "কোরাণে যখন ঐরূপ বলিতেছে তখন আমার পক্ষে ঐরূপ করাই ঠিক, উহা না করাই আমার পক্ষে পাপ।" খ্রীষ্টান বলেন—"কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ত এরূপ বলে না।" মুসলমান বলেন—"ওসব আমি

জানি না। আমি তোমাদের শাস্ত্র মানি না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিতেছে—'সমুদয় বিধর্ম্মীকে বধ কর।' ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তুমি কি করিয়া জানিবে? নিশ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই সত্য—তোমাদের শাস্ত্র যে বলিতেছে 'হত্যা করিও না' তাহা ঠিক নহে। হে বন্ধুবর, তুমিও ঠিক এই কথাই বলিবে; তুমি বলিবে, জিহোবা ইহুদিদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছিলেন তাহাই কর্ত্তব্য এবং তিনি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাই অকর্ত্তব্য। আমিও সেইরূপ বলিতেছি, আল্লা কোরাণে বলিয়াছেন, এই এই কর্ম্ম করা উচিত, এই এই কর্ম্ম করা উচিত নহে এবং ইহাই সত্য মিথ্যার একমাত্র কষ্টিপাথর।" ইহাতেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইয়া কোরাণের নীতির সহিত খ্রীষ্টের শৈলোপদেশের নীতির তুলনা করিবার জেদ করিয়া বসেন। ইহার মীমাংসা কিরূপে হইবে? শাস্ত্র দ্বারা কখনই হইতে পারে না—কারণ, শাস্ত্রসমূহই পরস্পর বিবদমান, তাহারা কি করিয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিবে? সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এমন একটা কিছু আছে যাহা এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অধিকতর সর্ব্বজনীন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মনীতি হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যাহা বিভিন্ন জাতি-সমূহের বোধিলব্ধ জ্ঞানের গভীরতার তুলনামূলক বিচার করিতে সমর্থ। আমরা ইহা নির্ভীকভাবে, স্পষ্টভাবে স্বীকার করি বা না করি, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এইখানে আমরা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, এই যুক্তিরূপ আলোক বোধিলব্ধ জ্ঞানসমূহের পরস্পর তুলনায় বিচার করিতে পারে কিনা; স্বীয় বিচারের মাপকাঠিতে ঈশ্বরাবতারগণেরও বিরোধের মীমাংসা করিতে সমর্থ কিনা, এবং ধর্ম্মের কোন রহস্য ইহার আদৌ বুঝিবার শক্তি আছে কিনা? যদি ইহার এই শক্তি না থাকে, তবে যুগ যুগ ধরিয়া শাস্ত্র-সমূহের ও অবতারপ্রমুখ পুরুষগণের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে তাহার মীমাংসা হইবার আর কোনই আশা নাই। কারণ, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা ও পরস্পর সম্পূর্ণ

বিরোধী,—তাহাদের মধ্যে নীতির কোন সুসমঞ্জস ধারণা নাই। ধর্ম্মের প্রমাণ মানুষের প্রাকৃতিক গঠনের সত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে —কোন পুস্তকের উপর নহে। এই পুস্তকসমূহ মানুষের মানসিক গঠন, স্বভাব চরিত্র ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ—ফলমাত্র। পুস্তকে মানুষ তৈয়ার করিয়াছে ইহা ত কেহ কখনও দেখে নাই। যুক্তিও সেইরূপ মানুষের প্রাকৃতিক গঠনরূপ সাধারণ কারণের একটী ফল এবং আমাদিগকে এই অন্তঃপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যুক্তি বলিতে কি বুঝি? বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে জিনিষটার অভাব আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি অর্থাৎ লৌকিক বিদ্যার আবিষ্কৃত নিয়মাবলি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ ঘটনা সামান্য ঘটনা দ্বারা এবং সামান্য ঘটনা অধিকতর সামান্য ঘটনা দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, এইরূপে আমরা অবশেষে সর্ব্বজনীন ঘটনায় উপনীত হই। আমাদের নিয়মসম্বন্ধীয় ধারণার কথা ধরুন। কোন একটী ঘটনা ঘটিলে, যাই আমরা জানিতে পারি, ইহা অমুক নিয়মের ফল, অমনি আমরা সন্তুষ্ট হই; এবং উহাকে ঐ ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া মনে করি। ঐ ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, যে একটী মাত্র ঘটনা দর্শনে আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম তাহা ঐ প্রকার বহু ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম এবং ইহাকেই আমরা নিয়ম বলি। একটী আপেল পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন চঞ্চল হইয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন, সমস্ত আপেলই পতিত হয় তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে মধ্যাকর্ষণ নাম দিলেন। মানবীয় জ্ঞানের ইহাই একমাত্র পন্থা। আমি পথে একটী প্রাণী, একটী মনুষ্যকে দেখিলাম এবং তাহাকে মনুষ্য সম্বন্ধীয় বৃহত্তর ধারণার সহিত তুলনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মানবজাতি-রূপ সামান্য ভাবের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহাকে মনুষ্য বলিয়া ঠিক করিলাম। সুতরাং বিশেষ ঘটনা সামান্য ঘটনা দ্বারা, সামান্য ঘটনা বৃহত্তর সামান্য ঘটনা দ্বারা এবং অবশেষে সমস্তই আমাদের কল্পনার চরম সীমা 'সত্তা'রূপ সর্ব্বজনীন ভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে

হইবে। সত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ভাব। আমরা সকলেই মনুষ্য অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই 'মানবজাতি' রূপ সামান্য ভাবের এক একটী অংশ বিশেষ। মনুষ্য, বিড়াল, কুক্কুর ইহারা সকলেই প্রাণী। এই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি 'প্রাণী'রূপ বৃহত্তর সামান্য ভাবের অংশ। মনুষ্য, বিড়াল, কুক্কুর, গুল্ম, ও বৃক্ষ—সমস্তই ইহাপেক্ষা বৃহত্তর সামান্য ভাব 'প্রাণের' অন্তর্গত। আবার, জড় বল, চেতন বল সমস্তই 'সত্তা'রূপ সর্ব্বজনীন ভাবের অন্তর্গত; কারণ, আমরা সকলেই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থ একমাত্র ইহাই যে, বিশেষ ঘটনাকে সামান্য ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করা—তজ্জাতীয় আরও বহুসংখ্যক ঘটনা বাহির করা। আমাদের মনে যেন এইরূপ বহুবিধ সামান্যীকরণ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। উহা যেন অসংখ্য 'খোপে' পরিপূর্ণ, আর ঐ খোপগুলিতে এই সমস্ত ভাব 'থাক্' 'থাক্' করিয়া সাজান রহিয়াছে। যখনই আমরা কোন নূতন পদার্থ দর্শন করি, তখনই আমাদের মন ঐ খোপগুলির কোন একটার ভিতর হইতে উহার সমজাতীয় পদার্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যদি আমরা ঐ খোপটী বাহির করিতে পারি তবে ঐ নূতন পদার্থ টীকে উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং বলি আমরা উহাকে জানিয়াছি। ইহাই 'জানা'র অর্থ—আর কিছুই নহে। আর ঐ খোপ-গুলিতে ঐরূপ কোন পদার্থ দেখিতে না পাইলেই আমরা অসন্তুষ্ট হই এবং যে পর্য্যন্ত না ঐ জাতীয় পদার্থের আর একটী খোপ খুঁজিয়া পাইতেছি সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য ঐ খোপ পূর্ব্ব হইতেই মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য আমি ইতি-পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান জিনিষটা মোটামুটী এই শ্রেণীবিভাগ। শুধু ইহাই নহে, আরও কিছু আছে। জ্ঞানের আর একটী লক্ষণ এই যে, কোন পদার্থের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাইবে —বাহির হইতে নহে। এক সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত, একটা ঢিল ছুড়িলে উহা যে মাটিতে পড়ে তাহার কারণ ভূতে উহাকে টানিয়া নামাইয়া আনে। এইরূপ অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে লোকে ভূতুড়ে

কাণ্ড বলিয়া থাকে। ভূতে ঢিল টানিয়া নামায় এই প্রকার ব্যাখ্যা ঢিলের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না—উহা বাহির হইতে গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণরূপ অপর ব্যাখ্যাটী ঢিলের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার —ঐ ব্যাখ্যা ঢিলের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই চেষ্টাটী আপনারা আধুনিক ভাবজগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন। এক কথায়, বিজ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায় যে, পদার্থসমূহের ব্যাখ্যা তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এবং জগৎব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য বহিঃস্থ কোন প্রাণী বা সত্তার প্রয়োজন নাই। রসায়নবিদ্ তাঁহার প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য ভূত প্রেতাদি বা ঐরূপ কোন কিছুর দরকার বোধ করেন না। পদার্থবিদ্ তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ইহাদের কোনটীরই প্রয়োজন বোধ করেন না, অপর কোন বৈজ্ঞানিকও নহেন। আমি বিজ্ঞানের এই একটী লক্ষণ ধর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। সমুদয় ধর্ম্মগুলিতেই এই লক্ষণটীর অভাব দৃষ্ট হইতেছে এবং এই হেতুই তাহারা দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই ভিতর হইতে—পদার্থসমূহের স্বস্বরূপ হইতে তাহাদের ব্যাখ্যা চাহিতেছে কিন্তু ধর্ম্মসকল তাহা দিতে পারিতেছে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক সগুণ ঈশ্বরের ধারণা চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনুকূল যুক্তিগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—কিরূপে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক ঈশ্বর—এক প্রপঞ্চাতীত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন, যিনি স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং যাঁহাকে ধর্ম্ম ইহার শাসনকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এই সমস্ত যুক্তি সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে 'পরমকারুণিক' বলা হইয়াছে অথচ পৃথিবীতে এত বৈষম্য রহিয়াছে। দার্শনিক এই সমস্ত ব্যাপার আদৌ লক্ষ্য করেন না; তিনি বলেন, গোড়ায় গলদ হইয়াছে। এই জগতের কারণ কি? না, ইহার বাহিরের কোন কিছু—কোন প্রাণী, যিনি এই জগৎকে চালিত করিতেছেন। ঢিল পড়ার ব্যাখ্যাটীও যেমন অসম্পূর্ণ দেখা গিয়াছে, ইহাও সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার পক্ষে

অসম্পূর্ণ, এবং ধর্ম্মসমূহ ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা দিতে পারিতেছে না বলিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।

কোন পদার্থের ব্যাখ্যা তাহার নিজের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে, এই মতের সহিত আর একটী মত জড়িত রহিয়াছে এবং তাহা ইহারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—সেটী আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ। ক্রম-বিকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, কোন পদার্থের স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণের রূপান্তর মাত্র; কার্য্যের সমস্ত শক্তি কারণে বিদ্যমান ছিল; এই নিখিল প্রপঞ্চই অভিব্যক্ত—নূতন কিছু সৃষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের পুনঃ-প্রকাশ—কেবল দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত মাত্র। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার চলিতেছে, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগকে সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইবে না, তাহারা ইহার মধ্যেই রহিয়াছে। বাহিরে কোন কারণানুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ইহাও ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, অর্থাৎ যে সকল ধর্ম্ম কেবল মাত্র সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী—ঈশ্বর একজন খুব বড় লোক তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে, এইরূপ বিশ্বাস করে—তাহারা আর টিকিতেছে না; তাহারা যেন সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃত মহাত্মা।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

সন্ন্যাসিকুলতিলক ইয়েন-হোর খ্যাতি সুবিশাল চীন-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য একখানি জীর্ণ পর্ণকুটীরে বল্কল পরিধান করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেন। গো-পরিচর্য্যাই তাঁহার প্রধান কর্ম্ম ছিল। লু প্রদেশের রাজা

তাঁহার সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছায় দূতহস্তে কতকগুলি উপ-ঢৌকন তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকল অজ্ঞ ব্যক্তি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়াও তাঁহার আড়ম্বরশূন্য বেশভূষা দর্শনে তাঁহাকে অপর কোন ব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়! এই স্থানেই কি সন্ন্যাসী ইয়েন-হো বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—'হাঁ, ইহা তাঁহারই বাসস্থান বটে—'

এই কথা শুনিবামাত্র উহারা উপহারগুলি তাঁহার নিকটেই প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ইয়েন-হো কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় আপনারা ভুল করিয়া আমাকে দিতেছেন। রাজা ইহা জানিতে পারিলে আপনাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনারা এগুলি লইয়া ফিরিয়া যান। পরে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ের সঠিক খবর লইয়া যথোচিত বিহিত করিবেন।" অনন্তর উহারা তাহাই করিল কিন্তু রাজার নিকট হইতে পুনরায় আজ্ঞা পাইয়া আবার যখন তাহারা সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন আর সাধুর দর্শন মিলিল না। এই সংবাদ শুনিয়া লু-রাজ বুঝিলেন, ইয়েন-হোর ন্যায় প্রকৃত ঋষি ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব সম্পদ্ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অনন্তর আপনার আচরণ স্মরণ করিয়া তিনি সন্তপ্তহৃদয়ে এই বলিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন –

"সেই জন্যই কথিত আছে, মোক্ষমার্গের পথিককে অধিকাংশ সময়ই আত্মোন্নতির চিন্তায় রত থাকিতে হয়, রাজ্যশাসন ও অন্যান্য কার্য্যপরিচালন পরের কথা। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, প্রথিতনামা নৃপতিমণ্ডলী ও সেনানায়কগণের অদ্ভুত সাহসিক কর্ম্মগুলি অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণের কর্ম্মের অতি নগণ্য অংশ মাত্র। মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকল্পে বা দেহরক্ষায় উহারা কোন কাজেই আসে না। কিন্তু অধুনা মূর্খ জননায়কগণ আপনা-দিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এই সকল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক যশের জন্য লোলুপ! ইহা বড়ই দুঃখের কথা বটে!

"কিন্তু ভাবিয়া দেখ, মহৎব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এরূপ বহু নির্ব্বোধ ব্যক্তি দেখিতে পাই যাহারা নামযশের আশায় সু-রাজের বহুমূল্য হীরকখণ্ড লাভের জন্য দূরস্থিত একটী ক্ষুদ্র পক্ষী গুলি করিয়া আপনাপন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যস্ত! জগৎ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসে। কেন?—কারণ তাহারা সার জিনিষের পরিবর্ত্তে অসার লইয়াই প্রমত্ত!"

* * *

বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—সাধুর কথা নৃপতি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই একবারমাত্র সাক্ষাৎকারের ফলেই তাঁহার জীবনে অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনন্তর একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ সু-উ-কি-উ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আহ্বান করা হয় নাই, তথাপি এই আকস্মিক আগমনের কারণ কি? রাজা বিস্মিত হইলেন—তবে কি কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার আবির্ভাব? আমার মদ্য ও মাংসের আশায় আসিয়াছেন কি?

"প্রভো! নির্জ্জন পর্ব্বত প্রদেশে বন্য ফলমূলে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনি এতদিন কালযাপন করিতেছিলেন—আমার ন্যায় হতভাগ্য অকিঞ্চনের চিন্তা কোন দিন আপনার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এরূপ অবহেলার পর অকারণ এত কৃপার কারণ কি?

"রাজন্! অতি নীচ কুলে আমার জন্ম, —সুতরাং দেবভোগ্য মদ্যমাংস আহার করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি আপনার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্যই আসিয়াছি।"

"আপনার বাক্য সম্যক্ বুঝিতে দাস অসমর্থ—সমবেদনা করিবার কি আছে?"

"মহারাজের আত্মা ও দেহ উভয়ের অবস্থাই অতীব শোচনীয়।"

"অনুগ্রহ করিয়া খুলিয়া বলুন।"

তখন পরিব্রাজক বলিতে লাগিলেন—"জীবন ধারণের জন্য কি উচ্চ, কি নীচ সকল মনুষ্যেরই পুষ্টির প্রয়োজন। আপনি একটী বিশাল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, অসংখ্য প্রজার জীবনরক্ষার ভার ভগবান্ আপনার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনার সে দায়িত্ববোধ কোথায়? সামান্য ইন্দ্রিয়লালসার জন্য আপনি প্রজাকুলকে অমানুষিক নির্য্যাতন করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার অন্তরাত্মা কোন দিন এই গর্হিত কর্ম্মে সম্মতিদান করেন নাই। রাজন্! বিবেকবাণী অমান্য করিবেন না। উহা চিরদিন শান্তি ও সাম্যের জন্য উৎসুক—স্থির জানিবেন, চাঞ্চল্য ও কোলাহল ব্যাধিরই লক্ষণ। এতদ্দর্শনে আপনার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য আসিয়াছি—জগতে কেবল আপনিই কেন এত অযথা দুঃখ ভোগ করিবেন?"

"প্রভো! আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বহুদিবস হইতেই আমার বাসনা ছিল। আজ তাহা পূর্ণ হইল। আমি আমার প্রজাবর্গকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে চাই, উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয় আমি তাহারই একান্ত অভিলাষী। প্রভো! ইহা কিরূপে সম্ভব?"

"রাজন্! আপনার বর্ত্তমান কার্য্যাবলী ও ব্যবহার একান্ত অসন্তোষজনক। অধিককাল এইরূপ চলিলে ঈপ্সিতলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা আপাতমঙ্গলজনক ভাবিতেছেন, ভবিষ্যতে দেখিবেন উহাই বহুবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করিবে। নানারূপ সৎকর্ম্ম ও প্রভূত দান অবশেষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে—কারণ জানিবেন, এই সকল সৎকর্ম্ম সত্ত্বেও প্রজাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অন্তর্নিহিত, হিংসা, দ্বেষ ও লালসা প্রভৃতি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুন কেবল অনর্থের সৃষ্টি করে। এইরূপে আন্তরিক বিদ্রোহ বাহিক বিগ্রহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মানবমনের সংস্কার আবশ্যক,—উহাদিগকে এমন শিক্ষা দান করিবেন যাহাতে উহারা পাশবিক প্রবৃত্তি দমন

করিয়া দেবভাবগুলির প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে। এই কঠিন কার্য্য সমাহিত না হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহের লোপ সম্ভবপর নহে। মানবমনকে প্রাচীনেরা প্রার্থনামন্দিররূপে বর্ণনা করিয়াছেন —সেই শান্তরসাস্পদ তপোবনকে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিবেন না।

"মানবমনে ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক সকল ভাবগুলি নির্ম্মূল করা প্রয়োজন। অপরকে শঠতা, দুরভিসন্ধি বা যুদ্ধবিগ্রহের ফাঁদে ফেলা উচিত নহে। ধরুন,—আমি যুদ্ধনীতি অমান্য করিয়া একটী সমগ্র জাতির বিনাশ সাধন করিলাম এবং স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য সুবিশাল প্রদেশগুলি দখল করিয়া লইলাম তাহাতেই বা আমার জয়লাভের কি ফল হইল? ভগবানের কৃপায় যখন মানবজন্মলাভে সমর্থ হইয়াছেন তখন সমবেদনা করিতে শিখুন—নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দরিদ্রের দুঃখ-বার্ত্তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করুন— কখনও নিষ্ঠুর আচরণ করিবেন না। মহত্ত্ব আর কাহাকে বলে? আত্মসংযমই মহত্ত্ব। দেখিবেন, আপনার প্রজাবৃন্দ, আর নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইবে না দেখিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে—তাহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ্য করিতে শিখিবে। তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ নিবৃত্তির বিলম্ব কোথায়?"

পরমাবতার কনফুসিয়স নৃপতি চু-কে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত নদীগুলিকে সমুদ্র কখনও পরিত্যাগ করে না, সেই কারণেই উহারা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের বিশালতা আরও বাড়াইয়া তুলে। সেইরূপ প্রকৃত মহাপুরুষও জগতের সকলকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া লন। তাঁহার সৎপ্রভাব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর উপর পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। তিনি কোন বিশিষ্ট কুলজাত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন না, নিরুপাধিরূপেই জগৎ হইতে বিদায় লন। ইহাই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ। কুকুর উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিতে পারিলেই আমরা তাহাকে ভাল কুকুর বলি না, সেইরূপ বেশী কথা বলিতে পারিলেই আমরা কাহাকেও সৎলোক বলি

না, মহৎ তো দূরের কথা। বড় কাজ করাই মহত্ত্বের লক্ষণ নয়—উহা হইতে ধর্ম্মের সম্ভাবনা বড় কম।

"মহত্ত্বে এই বিশ্বই অতুলনীয়। কিন্তু মহৎ হইবার জন্য উহা কি কিছু পাইবার আশা করে? মহৎ ব্যক্তি কখনও কোন লাভের আশা রাখেন না, তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, তিনি কাহাকেও অস্পৃশ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন না, বাহিরের দুঃখে তাঁহার মন কখনও বিচলিত হয় না। তাঁহার অফুরন্ত মানসিক শান্তি তিনি উপভোগ করেন,—স্বীয় উচ্চতম প্রকৃতিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। প্রকৃত মহত্ত্বের ইহাই সার কথা।"

ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। *

ব্রহ্মশক্তি।

(শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেদান্তবেদ্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ব্রহ্মের শক্তিই জগদম্বিকা। ইঁহারা বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। অভিন্না প্রকৃতিই আদ্যা সনাতনী, তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী—ত্রিগুণা। তাঁহার সত্তাতে জগতের সত্তা, তিনি অচিন্ত্যনীয়া; পরন্তু গুণাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত বোধে তাঁহার উপলব্ধি হইতে পারে। এই ব্রহ্মময়ী সনাতনী শক্তি সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যতে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান যাবতীয় বস্তুরই শক্তি। যাবতীয় বস্তুর শক্তি বলিয়া তাঁহার নাম অখিলাত্মিকা। তিনি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা ও মহাস্মৃতি এবং বিদ্যারূপে জগত্তারিণী এবং অবিদ্যারূপে জগন্মোহিনী। তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অন্ত-

---

*আমেরিকার The Message of the East পত্রের 'The True Sage' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

নিহিত চৈতন্যময়ী শক্তি, বস্তুধর্ম্ম ও প্রকৃতি। বস্তুধর্ম্ম ও প্রকৃতি একার্থ-বাচক। পরব্রহ্ম আপনাতে গুণের আরোপ করিয়া সগুণে কল্পিত হইয়া স্বরূপে তুল্যশক্তি ও তুল্যগুণে এক হইয়াও বহুরূপে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাসেশ্বরী রাধিকা, ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়া প্রকাশমান হয়েন। ইহাই প্রকৃতি। অগ্নির অন্তর্নিহিত (latent) শক্তি যেন অগ্নির বস্তুধর্ম্ম, অগ্নির দাহিকা শক্তি (manifested) যেন অগ্নির প্রকৃতি, সেইরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম এবং তাহাই ব্যক্তাকারে ব্রহ্মের প্রকৃতি। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রকৃতি অভেদ। প্রকৃতি দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা ব্রহ্মেরই কার্য্য—বিভিন্ন উপাধিতে, নাম ও রূপে প্রকাশমান্ মাত্র। এই প্রকৃতিই সগুণব্রহ্ম। পরব্রহ্ম সৃষ্টি বিস্তারের জন্য আপনাতে গুণের আরোপপূর্ব্বক সগুণে কল্পিত হইয়া বিভিন্ন নাম, রূপ ও উপাধিতে আবির্ভূত হয়েন। পরব্রহ্ম প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়া রজো-গুণাবলম্বনে ব্রহ্মা উপাধিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য, সত্ত্বগুণাবলম্বনে বিষ্ণু উপাধিতে জীবের পালনকার্য্য এবং তমোগুণাবলম্বনে শিব উপাধিতে অখিল ভূতের নাশ কার্য্য করেন। তিনি স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক হইয়া আপনাকে পালন এবং পরিশেষে সংহর্ত্তা হইয়া আপনাকেই সংহার করেন। অনন্ত সমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা—ইহাই যেন ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব, আর সমুদ্রের যে বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই যেন ব্রহ্মের সগুণ ভাব। ব্রহ্মের প্রকৃতি পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টীকরণ দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। প্রলয়কালে পরমাণু-সমষ্টিরূপ-ব্রহ্মাণ্ড ব্যষ্টি-ভাব ধারণপূর্ব্বক সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্মে বিলীন হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম হইতে প্রকৃতির বিকাশ। পুং-বিকাশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পিতা এবং স্ত্রী-বিকাশ, হৈমবতী, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও রাসেশ্বরী রাধিকাকে মাতা বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রকৃতিই আপনার কার্য্য, আপনার লীলা আপনি করেন—আপনি দেখেন।

প্রকৃতি দ্বিবিধা—জড়রূপা ও চিতিরূপা। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই দ্বিবিধা শক্তির সত্তা উপলব্ধি হয়। প্রকৃতি কুণ্ডলিনীরূপে জীবদেহে অবস্থান করেন। জীবদেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ড মধ্যে ৬টী যন্ত্র আছে। উহা ষট্‌পদ্ম বা ষট্‌চক্র নামে অভিহিত, (১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান—(৩) মণিপুর, (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞাচক্র। মূলাধারচক্র—পায়ু যন্ত্র—ক্ষিতিস্থান, যে স্থানে ক্ষয় হয় (ক্ষি ধাতু ক্ষয়ার্থ)। স্বাধিষ্ঠান চক্র—লিঙ্গমূলে, জলস্থান। মণিপুর চক্র—উদরে, তেজের স্থান, যেখানে অন্নাদি পরিপাক হয়। অনাহত চক্র—বক্ষে, বায়ুর স্থান। বিশুদ্ধ চক্র—কণ্ঠে, ব্যোমের স্থান। "ব্যোম্নি শব্দোঽভিব্যজ্যতে"—আকাশের গুণ শব্দ। সেইজন্য কণ্ঠ শব্দস্থান কণ্ঠে যাবতীয় বর্ণের উচ্চারণ হয়। পঞ্চচক্রের উপরে আজ্ঞাচক্র, নেত্রদ্বয়ের অন্তরালে তাহার অবস্থিতি—ইহা মনের স্থান।

"নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নং সুপ্তি হৃদম্বুজে চ"—পঞ্চদশী। জীবগণ যখন জাগরিত হয়, তখন নেত্র উন্মীলিত হয় এবং সংসারে ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছাশক্তি মনের। জীবগণ নিদ্রিত হইলে নেত্রদ্বয় মুদিত হইয়া যায়, কোনরূপ ইচ্ছাই থাকে না। এইরূপ নানা কারণে আজ্ঞাচক্র মনের স্থান অবধারিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রের সর্ব্বোপরি মহাচক্র অবস্থান করে। মহাচক্র সহস্রার—ইহা ব্রহ্ম স্থান। এই স্থানে চিতিরূপা মহামায়া পরব্রহ্মের সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করেন। কেবল সহস্রারে নহে, মহামায়া কুলকুণ্ডলিনী আধারাদি সকল চক্রেই বিহার করেন। বিদ্যুদ্বর্ণা প্রসুপ্তভুজগাকারা কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা হইয়া আধারচক্রে অবস্থান করেন। যখন যে চক্রে বিহার করেন তখন সেই চক্রের ক্রিয়া হয়। আধার ও স্বাধিষ্ঠানে ত্যাগ ক্রিয়া। মণিপুরে ক্ষুৎপিপাসা। অনাহত চক্র বায়ুর স্থান বলিয়া ধারণ চালনাদি বায়ুক্রিয়া সকল সংসাধিত হয়।

"ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সংকোচঃ প্রসবস্তথা।
বায়োঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥—জ্ঞানসঙ্কলিনী।

এই অনাহত পদ্মের অভ্যন্তরে একটী অবকাশ আছে, তাহাকে

দহরাকাশ বলে। তথায় পুরীতৎ নামক স্থানে জীবাত্মা বাস করেন। সুষুপ্তিকালে জীব বিবিধ চক্রে বিহার করিয়া যখন পরিক্লিষ্ট হন, তখন তথায় সুপ্ত হন। কুলকুণ্ডলিনাও স্বস্থান আধার পদ্মে প্রসুপ্ত ভুজগীর ন্যায় সুপ্ত থাকেন। সাধক হৃদিস্থ দীপকলিকাকার জীবকে কুল-কুণ্ডলিনীর সাহায্যে ব্রহ্মস্থানে উপনীত করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ করেন। বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপদ্মে কুণ্ডলিনী উপনীত হইলে ব্যোমের ক্রিয়া কেবল শব্দোচ্চারণাদি হয় তাহা নহে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা ইহারাও পঞ্চ ব্যোমক্রিয়া।

"কামঃ ক্রোধস্তথা মোহো লজ্জা লোভশ্চপঞ্চমঃ।
নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষ্যতে॥"—সঙ্কলিনী।

এখানে প্রকৃতি মাতৃকাসরস্বতীরূপে ষট্‌পদ্মে বর্ণাত্মিকা হইয়া বিরাজমানা। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ তাহার কলেবর। আধার পদ্ম চতুর্দ্দল—তাহাতে ব, শ, ষ, স এই চারিবর্ণ। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষড়্‌দল—তাহাতে ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টী বর্ণ। মণিপুর দশদল পদ্ম—তথায় ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটী বর্ণ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে ইহার সম্যক্ আলোচনা অনাবশ্যক।

এই চিন্ময়ী প্রকৃতি সর্ব্বজীবে বিষ্ণুমায়ারূপে, চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, নিদ্রারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন। তিনিই বাসনা—তিনিই আশা—তিনিই ভরসা। সৃষ্টিকালে তিনি তেজ, জল এবং অন্ন সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং গায়ত্রী হইয়া নির্ব্বিকারাংশ পরমব্যোমস্বরূপ পরমেশ্বর হন। সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট জলে তাঁহার শক্তিবীজ অর্পিত হইলে তন্মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রথমে সহস্রসূর্য্যপ্রভাযুক্ত সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় একটী অণ্ডের উৎপত্তি হয়। পরে সেই অণ্ডের মধ্য হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। পুনর্ব্বার ব্রহ্মা সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি-

পুরুষ দুই রূপ ধারণ করিলে তাহা হইতে বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই বিরাট্ পুরুষ হইতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীরে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই রূপ কল্পিত হইবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের একত্র সংমিশ্রন ব্যতীত জগতে জীবগণের উৎপত্তি নাই। ব্রহ্মশক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূল প্রকৃতি আপনাকে বিভাগ করিয়া বামাঙ্গে ভগবতী, দক্ষিণাঙ্গে শিবরূপে প্রকাশিত হন এবং পুনর্ব্বার সৎ চিৎ আনন্দে লয় প্রাপ্ত হন। ইহাই নিত্যা প্রকৃতি। এই নিত্যা প্রকৃতি একরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয় না করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ; দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী—ত্রিবিধ রূপ কল্পনাপূর্ব্বক এক এক রূপে এক এক কার্য্য সমাধা করেন।

স্বপ্নতত্ত্ব ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, বি)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন পুস্তক পাঠ কালে আমরা প্রত্যেক বাক্যের সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখি মাত্র এবং তাহা হইতেই সমস্তটী একরূপ বুঝিয়া লই। এই সম্বন্ধে দুই জন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ * যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। ইঁহারা কতকগুলি সাধারণ কথা কাগজে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া বা ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন ; যথা—"প্রবেশ নিষেধ", "চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা" ইত্যাদি। এই শব্দগুলি লিখিবার সময় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন কোন শব্দে কিছু বদলাইয়া, কোন কোন শব্দে মধ্যে মধ্যে অক্ষর

* Goldscheider and Muller.

বাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন। এই অশুদ্ধ পদগুলি একটী অন্ধকার ঘরে রাখা হইয়াছিল, এবং যাঁহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে এই অশুদ্ধির কথা আদৌ জানান হয় নাই। অতঃপর এই পদগুলির উপরে বৈদ্যুতিক আলোক এত অল্প সময়ের জন্য ফেলা করা হইয়াছিল, যে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত অক্ষরগুলি কিছুতেই পাঠ করা যায় না। পরীক্ষকগণ একটী অক্ষর পাঠ করিবার জন্য কতক্ষণ আলোক ফেলা দরকার, দুইটী অক্ষরের জন্যই বা কত সময় আবশ্যক তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অক্ষরবিশিষ্ট পদসমূহ পাঠ করিতে কত সময় লাগিবে তাহার তালিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে যে পদটীতে ৩০।৪০টী অক্ষর আছে তাহার মাত্র ৮।১০টী অক্ষর পাঠ করিতে পারা যায় এরূপ সময়ের জন্য তাহাদের উপর আলোক ফেলা হইয়াছিল। ফলে দেখা গিয়াছিল যে, যাঁহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাঁহারা সাধারণতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে সমস্ত পদটী পড়িতে পারিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আর একটী শিক্ষাপ্রদ বিষয়ও লক্ষিত হইয়াছিল। যে অক্ষরগুলি ইচ্ছা করিয়া অশুদ্ধভাবে লেখা হইয়াছিল পরীক্ষিত ব্যক্তিগণ সেইগুলির স্থানে শুদ্ধ অক্ষরগুলি দেখিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, যে অক্ষরগুলি ঐ বাক্য হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সেই অক্ষরগুলিও আলোকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছেন এরূপ কথাও বলিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের যে সকল অনুভূতি গ্রহণ করিতেছি ঠিক তদনুরূপ জ্ঞানই যে আমাদের চিত্তে সর্ব্বদা বিকসিত হইতেছে তাহা নহে। আমাদের স্মৃতিশক্তি অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। কোনরূপ অনুভূতি ইন্দ্রিয়সহায়ে আমাদের চিত্তে উপনীত হইলেই আমাদের স্মৃতিশক্তি উহাকে কোন কিছুর লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কোন্ অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই লক্ষণটী মিলে তাহা খুঁজিয়া

বাহির করিতে থাকে। এইরূপে আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি যেন বাহিরের বস্তু হইয়া আমাদের নিকট চিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষিত ব্যক্তিগণ বাক্যস্থ পদগুলিকে দেখে নাই, এই স্মৃতিগুলিকেই দেখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি যখন কোন পুস্তক পড়া যায়, তখনও কতকটা এইরূপ হইয়া থাকে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে যে যথার্থ জিনিষটীকেই দেখি তাহা নহে; যথার্থ জিনিষের উপরে স্মৃতি দ্বারা সঞ্চিত কতকগুলি উপাদান বসাইয়া একরূপ নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকেই দেখি। এই মূর্ত্তিগঠনকার্য্যে কতকগুলি কৌতুহলপ্রদ ব্যাপার লক্ষ্য করা হইয়াছে।

উল্লিখিত পরীক্ষকগণ আর এক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি অসাধারণ কথা শুদ্ধভাবে লিখিয়াছিলেন। এই কথাগুলি পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা এত অল্প সময়ের জন্য যে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত কথাটী পড়া অসম্ভব। পরীক্ষার্থী যখন কথাটী বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন আর একটী লোক তাঁহার কাণে কাণে একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা বলিল। ইহার পর যদি পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি দেখিলেন, তাহা হইলে তিনি এমন একটী কথা বলিবেন, যাহার সহিত লিখিত কথার মোটামুটি অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং যে কথাটী তাঁহাকে কাণে কাণে বলা হইয়াছিল তাহার সহিত উহার অর্থের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বিষয়টী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। মনে করুন, লিখিত কথা ছিল 'Tumult' এবং তাঁহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল 'Railroad'। তাহাতে পরীক্ষার্থী বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'Tunnel' এই কথাটী পড়িয়াছিলেন। লিখিত কথা ছিল 'Trieste' (জার্ম্মান ঐতিহাসিকের নাম) এবং তাঁহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল 'Verzweiflung' (নৈরাশ্য-বাচক জার্ম্মান কথা)। তাহাতে পরীক্ষার্থী পড়িয়াছিলেন 'Trost',—এই জার্ম্মান কথাটীর অর্থ দুঃখে সহানুভূতি।

পরীক্ষার্থী Tumult কথাটীর যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই টুকুই ধরিয়া তাঁহার স্মৃতির মধ্যে ইহার সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কাণের নিকট Railroad এই কথাটী উচ্চারণ করাতে, তাঁহার মনে অজ্ঞাতসারে এই আশা জাগিয়া উঠিল যে, তাঁহার দৃষ্ট কথাটী এরূপ কোনও স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে যাহার সহিত Railroad কথাটীর সাদৃশ্য আছে।

কাণে বলার ন্যায় নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারাও স্মৃতি বিচলিত হয় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজিকাল ল্যাবোরেটরীতে (Pathological Laboratory) একজন সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিরূপ পুস্তক লিখিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিতে পারেন কি?

যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি ডাক্তারী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চার অভ্যাস একেবারেই ছিল না। যাহা হউক তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ইঁহার 'ছিন্নমস্তা' বলিয়া বোধ হয় একখানি পুস্তক আছে।

সাহেব বলিলেন, উহার অর্থ কি?

ডাক্তার বলিলেন, "যাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন, "বুঝিয়াছি, মিষ্টার ঠাকুর লোমহর্ষণঘটনাপূর্ণ (Sensational) পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন।"

পরে জানা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু কোন হাণ্ডবিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র' পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলেন। প্যাথোলজিকাল ল্যাবরেটরীতে মৃত জীবজন্তুর শরীর ব্যবচ্ছেদকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় তথাকার ভাব (Association) সংস্পর্শে 'ছিন্নপত্র' সম্ভবতঃ 'ছিন্নমস্তা' হইয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য মতের ন্যায় হিন্দুদর্শন মতেও ইন্দ্রিয়বোধ তিন প্রকার মানসিক অবস্থার দ্বারা জ্ঞানভূমিতে উপনীত হয়। প্রথম মন—ইহা

ইন্দ্রিয়বোধের ছায়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বুদ্ধি—ইহাতে ঐ ছায়াটীকে নিশ্চয় করিয়া ধরিয়া লয়। তৃতীয় অহংকার—ইহাতে ঐ ছায়া অহংজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়। জীবের অতীত স্মৃতিগুলিই অহংজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া আমাদের স্মৃতিগুলিই আমাদের সকল জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যেই প্রধান অংশ অভিনয় করে। আমাদের সাধারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর স্মৃতির ছাপ পড়িয়া উৎপন্ন হয়। আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়া থাকে।

দার্শনিক বার্গসোঁ যদিও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে স্মৃতির আরোপকে স্বপ্নরচনার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কেবল 'স্মৃতি' বলিলে ঠিক অর্থবোধ হয় না। বরং 'সংস্কার' বলিলে অনেকটা ঠিক বলা হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা যেমন সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই সকল সঞ্চিত সংস্কার উহাদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সেই সংস্কার বশে আমরা দৃষ্টবস্তু সম্পূর্ণ না দেখিয়াই অথবা শ্রুত বিষয় সম্পূর্ণ না শুনিয়াই তাহার একটা ধারণা করিতে পারি। অবশ্য সাধারণ জাগ্রৎ জ্ঞান এবং স্বপ্নে অনেক প্রভেদ আছে। জাগ্রদবস্থায় যে সব স্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালীন অবস্থা, প্রয়োজন, ক্রিয়া ইত্যাদি আবেষ্টনী (environment) দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নে বহির্জগতের কোন বন্ধনই নাই। তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে কোন একটা স্মৃতি আপনার সহিত জুড়িয়া দিল, কিন্তু ঠিক মিল হইল না দেখিয়া আরও পাঁচটা স্মৃতি দৌড়াইয়া আসিল। এইরূপ অনেক স্মৃতি জুটিয়া ভূতের নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার উপর আমাদের মনের উন্নতি শক্তি, বিবেচনা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সজাগ হইয়া গোল থামাইবার চেষ্টা করিয়া আরও গোলমাল বাড়াইয়া দিতে লাগিল, কিম্বা নিজের সন্তোষের জন্য এই সব গোলমালের এক অপরূপ ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিল। এই সকল কারণেই স্বপ্ন অসংলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নে যে সকল স্মৃতি

দৃশ্যের আকার ধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই সাধারণ স্মৃতি অপেক্ষা আমাদিগের অহংকারের সহিত একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধটী অনেক স্থলে এত নিগূঢ় যে আমরা উহাকে সাধারণ জ্ঞান দ্বারা ধরিতে পারি না। আবার এই নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত স্মৃতিগুলি যখন স্বপ্নাবস্থায় আসে তখন তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়া আসে যে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের যে কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। ইহা আমরা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনায় ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

স্বপ্নে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয়, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়প্রসূত। কথাটী সাধারণ ভাবে সত্য হইলেও যে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য তাহা বোধ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"তুমি যে কোন জড় বিজ্ঞান লও না কেন, তাহাতে যতই অগ্রসর হইবে, দেখিবে ইহা ক্রমশঃ জড় হইতে অজড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।" * চক্ষুর সম্মুখে যে বর্ণচিত্র দেখার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে—যাহা অনেক পণ্ডিতের মতে স্বপ্নের উপাদান—তাহারই অনুরূপ চিত্র হইতে আবার ব্যক্তি বিশেষে স্ফটিক দৃষ্টি (crystal vision) উৎপন্ন হয়। স্ফটিক দৃষ্টি আমাদের দেশে নখদর্পণ প্রভৃতির দ্বারা প্রচলিত আছে। এই স্ফটিকদৃষ্টি পুরাকাল হইতে অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এতকাল ইহা একপ্রকার কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। জড়বাদের ভিতর দিয়া তাঁহারা ইহার কোনও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ইহা দূরদৃষ্টির মতন অজড় রাজ্যের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্ফটিক দৃষ্টি কাহাকে বলে? একটা স্বচ্ছ স্ফটিক বা একগ্লাস জল, কিম্বা আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে এমন কোন উজ্জ্বল দ্রব্যের

* The Science and Philosophy of Religion.

দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, যাহাদের স্ফটিক দৃষ্টির ক্ষমতা আছে তাহারা নানারূপ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি দেখিতে পায়। এইগুলি স্বপ্নের ছবির মতন বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মিলাইয়া যায়। ইহাদের অনেক দৃশ্য কল্পনাপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। আবার কতকগুলি ঘটনার জাগতিক ঘটনার সতি এরূপ আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে দর্শকের দূরদৃষ্টির ক্ষমতা সূচিত হয়।

মিসেস্ ডি— নামক এক পাদরী মহিলার এই স্ফটিক দৃষ্টি আছে জানিয়া প্রফেসর হিস্লপ মনস্তত্ত্ব সভার পক্ষ হইতে ইঁহাকে পরীক্ষা করেন। মিসেস্ ডি—স্ফটিক দৃষ্টির সময় বড়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিতেন। প্রফেসর হিস্লপ কিছুদিন ধরিয়া মিসেস্ ডি—স্ফটিক দৃষ্টিতে কি কি দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসেস্ ডি—র একদিনের স্ফটিক দৃষ্টির দৃশ্য উল্লেখ করা যাইতেছে। *

(১) একটী তুষার শৈল (Iceberg) জলে ভাসিতেছে।

(২) একটী পাহাড়ের উপর হইতে একজন লোক মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছে।

(৩) বালিসে মাথা রাখিয়া একজন হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, কেবল তাহার মাথাটা দেখা যাইতেছে।

(৪) মিসেস্ ডি—র মাতার মুখ।

(৫) একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানের সহিত ঘুমাইতেছে। তাহাদের গলা পর্য্যন্ত চাদরে ঢাকা।

(৬) মিসেস্ ডি—র একজন বন্ধু যে বাড়ীতে ছিলেন, সেইরূপ একটী বাড়ী। কিন্তু বাড়ীর লোকদের চেহারা মিসেস্ ডি—র অপরিচিত।

(৭) একটী গোরস্থান। এই গোরস্থানের প্রবেশ দ্বারটা মিসেস্

* Enigmas of Psychical Research—by Professor James H. Hyslop.

ডি—র পিত্রালয়ের নিকটস্থ একটী পরিচিত গোরস্থানের মত, কিন্তু ইহার ভিতরটী তাহা হইতে অনেক পৃথক। ইহাতে অনেক নূতন কবর ও মনুমেণ্ট রহিয়াছে, যাহা মিসেস্ ডি—র পরিচিত কবরে ছিল না। মিসেস্ ডি—র পিত্রালয় ওহিও (Ohio) নগরে অবস্থিত ছিল।

এই দৃশ্যটী দূরদৃষ্টিমূলক। মিসেস্ ডি— তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ যে কবর স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহাতে যথার্থ ই তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ নূতন কবর এবং নূতন মনুমেণ্টাদি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনাদি মিসেস্ ডি— তাঁহার পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিবার পর হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ইহার বিষয় কিছুই জানিতেন না। সেই সময় তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতা পীড়িত ছিলেন। মিসেস ডি—র ভগিনী তাঁহাদের ভ্রাতা বাঁচিবেন না মনে করিয়া তাঁহাদের নিজের বংশগত কবরস্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ভ্রাতার মৃত্যুর পর এই কবরে সমাহিত করিবার কথা মনে করিতেছিলেন।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে স্ফটিক দৃষ্টির সম্বন্ধে কতকটা আভাস দেওয়া গেল। এই বিষয়টী বিশেষ কৌতূহলকর হইলেও ইহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে বলিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

গত ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, সন ১৩২৫, বেলুড়স্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর জন্মতিথিপূজা ও ১২ই মাঘ, রবিবার তদুপলক্ষে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই দিবসই স্বামিজীর তৈলচিত্র লতাপুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া মঠপ্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তিটী ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল। তিথিপূজার দিন দিবাভাগে স্বামিজীর পূজা ও ভোগরাগ এবং রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ পূজাঅর্চ্চা, ভজন ও হোমাদির অনুষ্ঠান হয়। পূজা ও হোমান্তে শুভ-ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কয়েকজন যুবক আজীবনব্রহ্মচর্য্য পালনরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামিজী ইহার অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং বলিতেন ভারতের উন্নতির জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাঁহার বার্ত্তা বহন করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চার করুন, ইহাই ভগবৎ সমীপে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পরবর্ত্তী রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতে ভক্ত এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সমাগম হইতে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৭।৮ সহস্র ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন ভজন ও ভগবানের নাম গানে মঠে আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্তবৃন্দ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামিজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাতঃকাল ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভজন ও পূজাদিতে অতিবাহিত হয়। মধ্যাহ্নে দুই সহস্রেরও অধিক দরিদ্র নারায়ণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। বৈকালে ব্রহ্ম শ্রীবশিষ্ঠ ভারতী মনোজ্ঞ এবং হৃদয়-স্পর্শী ভাষায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আয়ার, বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর উপদেশাবলীকে (১) আত্মবিশ্বাস, (২) সৎসাহস, (৩) কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং (৪) সেবাধর্ম্ম, এই চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া অল্প কথায় উহাদের প্রত্যেকটী সকলকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। অতঃপর ধর্ম্মপুরীর সদাশয় ডেপুটী কলেক্টর মান্যবর শ্রীযুক্ত এন্, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার "স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যগঠনকারী উপদেশ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত জনসমূহকে প্রসাদ বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট্ হলে স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। বেলা ৩টার সময় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বৃহৎ হলটী শ্রোতৃবৃন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি স্মৃতিসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলীর' অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রনাথ নন্দী বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তৎসঙ্গে সোসাইটীর এবং আহূত সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলে মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর সোসাইটীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র

দত্ত মহাশয় সোসাইটীর গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় স্বামিজী-প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে প্রফেসর শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় ইংরাজীতে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বামিজী সম্বন্ধে দুইটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধদ্বয়ে স্বামিজীর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হওয়ায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজ বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সভার ভার অর্পণপূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহারাজ বাহাদুরকে সোসাইটীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, আলোয়ারের সর্দ্দার মুন্সী জগমোহনলাল (হিন্দীতে), শ্রীযুক্ত জলধর সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ রাজা মিয়া স্বামিজীর বহুমুখী প্রতিভার নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুই চারিটী কথা বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সভাভঙ্গ হয়। তখন রাত্রি ৭॥টা।

সভার কার্য্য দীর্ঘ চারি ঘণ্টা ব্যাপী হইলেও শ্রোতৃবৃন্দের ঔৎসুক্যের হ্রাস হয় নাই। ইহা তাঁহাদের স্বামিজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

লাহোর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামিজীর জন্মতিথিপূজা ও উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথির দিবস দরিদ্রনারায়ণগণকে ভোজন করান হয়। ২৮শে জানুয়ারী উৎসব দিবসে ভাই নন্দগোপালের মন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট

পাঠ করা হইলে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ নেরাঙ্গ; শ্রীযুক্ত নানকচাঁদ, বার-এট্-ল, দয়াল সিংহ কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস, সি, রায়, এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতাদিও উৎসবের একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল।

উক্ত সেবাশ্রমটী ইং ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে, স্বামী সেবানন্দের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের উদার শিক্ষা এবং সেবাধর্ম্মের প্রচারই উহার উদ্দেশ্য। সেইজন্য সেবাশ্রম হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। নানাবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিত সেবানুষ্ঠানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা; দরিদ্র ব্যক্তিগণের বাড়ী যাইয়া রোগী দেখিয়া আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা; যাহাদের দেখিবার কেহ নাই এরূপ অসহায়, পথঘাটে পরিত্যক্ত রুগ্ন ব্যক্তিগণকে আশ্রমে লইয়া আসিয়া সেবা করা; দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত পরিবারগণকে সাধ্যমত সাহায্য করা ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজের বেতন, পাঠ্যপুস্তক ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাহায্য করা। এই সকল স্থায়ী কার্য্য ব্যতীত এই দুই বৎসরের মধ্যেই আশ্রমের সেবকগণ লাহোর মাষ্টিগেটে অবস্থিত আতুরাশ্রমে ৪ মাস কাল আতুরগণের সেবা ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় বহু ব্যক্তির সেবা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত কাশী, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, কনখল, বাঙ্গালোর প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও অন্যান্য স্থানে স্বামিজীর জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৫শে ফাল্গুন, সন ১৩২৫, ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯১৯, রবিবার বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চতুরশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে। ঐ শুভানুষ্ঠানে জনসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

মানভূমে দুর্ভিক্ষ।

মানভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; বিশেষতঃ পুঞ্চা ও হুড়া প্রভৃতি থানার লোক অন্নাভাবে কঙ্কালসার হইয়াছে। এই বৎসরের প্রারম্ভে আমরা সেবক পাঠাইয়া এই সব স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা বিশেষরূপে যাহা জানিয়াছি তাহাই নিম্নে পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতেছি—

গত বর্ষে অনাবৃষ্টি হেতু এ জেলায় চাষ আবাদ ভালরূপ হয় নাই। অপর দিকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে দেশে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। আর যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেছে কিন্তু গৃহে পরিবার পরিজনের কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ক্ষুধার তাড়নায় বহুলোক ঝরিয়া কয়লার খনিতে কাজ করিতে যাইতেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ, তাহাদের খাটিয়া খাইবার উপায় নাই; আর কয়লার খনিতে কত লোকেরই বা জায়গা হইবে? জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা। আমাদের একজন সেবক পুঞ্চা থানায় সেবা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তবে মিশনের তহবিলে বেশী টাকা না থাকায় সেবকগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এদিকে বস্ত্রাভাবেও লোকের লজ্জা নিবারণ করা বিশেষ দায় হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিলার অধিবাসীদের সাতিশয় দুরবস্থার

কথা জানাইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে বন্যা ও অনাবৃষ্টিতে রবি ও আমন শস্য নষ্ট হওয়ায় তথাকার লোকেরাও পুনঃ পুনঃ আবেদন করিতেছে। এই বিপদ্ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অর্থ অথবা নূতন কিম্বা পুরাতন বস্ত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড়মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া অথবা ম্যানেজার উদ্বোধন, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

গঙ্গাসাগর মেলা।

গত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানোপলক্ষে যাত্রিগণের সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে ৩৫ জন সেবক প্রেরিত হইয়াছিল। কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা শুশ্রূষা এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করাই মিশনের সেবকগণের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। অন্যান্যবারের ন্যায় এ বৎসরও কলেরা হাঁসপাতালে প্রথমে ৪টী রোগীর স্থান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত ব্যাধির প্রকোপ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে অবশেষে হাঁসপাতালে ১৬টী রোগী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং মেলায় যাহাদের দেখিবার কেহই ছিল না এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও হাঁসপাতালে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই কারণে মিশনের সেবকগণকে দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এক দল হাঁসপাতালের রোগিগণের চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, অপর দল ঘরে ঘরে যাইয়া চিকিৎসা করিয়া আসিতেন এই শেষোক্ত রোগিগণের সেবার ভার তাঁহাদের আত্মীয়গণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। মেলাস্থল ব্যতীত ষ্টীমারে যাতায়াতের সময়ও অনেক কলেরা রোগীর সেবা করিতে হইয়াছিল।

মেলায় এবং ষ্টীমারে যে সকল রোগীর সেবা করা হইয়াছিল নিম্নে তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

তিন দিনে ৩৭ জন রোগীকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়, তন্মধ্যে ১১ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া যায়, ১০ জন মারা যায় এবং বাকী ১৬ জনকে নৌকায় করিয়া ডায়মণ্ড হারবার হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসা হয়।

৬৪ জন ব্যক্তিকে তাহাদের বাসায় যাইয়া চিকিৎসা করা হয়, তন্মধ্যে ২ জন মারা গিয়াছে, বাকী সকলে অনেকটা সুস্থ অবস্থায় তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত বাড়ী ফিরিয়াছে।

মেলা হইতে ফিরিবার সময় হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার, 'ষোড়শী'তে ৩১ জনের কলেরা হয়। তাহাদের সকলকেই মিশনের সেবকগণকে সেবা শুশ্রূষা করিতে হইয়াছিল। ষ্টীমারখানি কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ৭ জন মারা পড়ে এবং বাকী সকলকে ষ্টীমার-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

মেলায় চিকিৎসা করিবার জন্য মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং মিশনকে সমুদয় এলোপ্যাথিক ঔষধপত্রাদি দান করেন। মেলাস্থলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, সবডিভিসনল অফিসর্ ও ওভারসিয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ মিশনের সেবকগণকে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শাসমল তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মেসার্স হোর-মিলার এণ্ড কোং ১০ খানি এবং মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং ২৪ খানি পাস দিয়া সেবকগণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা ইঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নিম্নে গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্যের হিসাব প্রদত্ত হইল। জমা—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ১১৭৴১৫, মেলায় সংগৃহীত ২॥৫ মোট—১১৯৸০।

খরচ—গাড়ী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, মুটে প্রভৃতির জন্য ১৮॥৵৫; জিনিষপত্র লইয়া যাইবার ভাড়া ২।৫, সেবকগণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ২।৴১০, সেবকগণের ষ্টীমারে ও মেলায় খাই-খরচ ৭৮॥৵৫। ঔষধ, পথ্য এবং ডাক্তারী যন্ত্রাদি বাবদ ১৫।১০, ডাক খরচ ৵০, কেরোসিন

তৈল ইত্যাদি ৸৴৫, দুইজন বিপন্ন ব্যক্তিকে দান ১৷৽, মোট—১১৯৸৽।

পূর্ব্বে যে বস্ত্রবিতরণের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে।

কুমিল্লা ৫৭ জোড়া; পালং (ফরিদপুর) ৫৮ জোড়া; মাহিলারা, বরিশাল ৩০ জোড়া; ধোপরাপাশা, ঢাকা ২৭ জোড়া; ইটনা, যশোর ৬৬ জোড়া; দ্বারহাটা, হুগলী, ৩৫ জোড়া; কুমিল্লা ৩৩ জোড়া; কলিকাতার একটী দুঃস্থ পরিবার, ২৷৽ জোড়া; মঠবাটী, খুলনা ৩০ জোড়া, দাঁতন, মেদিনীপুর ৩১ জোড়া; দক্ষিণেশ্বরের জনৈক দুঃস্থ পরিবার ১খানি, বাঁশবেড়িয়ার জনৈক দুঃস্থ পরিবার, ১খানি; তমলুক, মেদিনীপুর ৩০ জোড়া; বাইশাআড়ি, বরিশাল ২৫ জোড়া; মানভূম দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১৫৫ জোড়া; সামন্তখণ্ড, মেদিনীপুর ২৫৷৽; বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে, ১৫৫ জোড়া।

নোওয়াখালী জেলার রামগঞ্জ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ৬ খানি গ্রামের ৫৭ জন ইনফ্লুএন্‌জা রোগীকে মিশনের দুইজন সেবক ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা করিয়াছেন। একজন ব্যতীত অপর সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্রও প্রদান করা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে ইনফ্লুএন্‌জা ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে ঔষধ দেওয়া হইতেছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৪৯৭ জন ঔষধ লইয়া গিয়াছেন।

চৈত্র, ২১শ বর্ষ।

শ্রীবিবেকানন্দ।*

পূজ্যপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ,

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বহুসভায় নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ মহাপুরুষের নাম সংস্পৃষ্ট এই মহতী সভায় আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে সম্মান দান করিয়াছেন, মুখের একটা কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাহার প্রতিদান হয় না। এই জন্য আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহি না, কেবল বলিতে চাহি যে, আপনাদের এই উদার অনুগ্রহে আমিই ধন্য হইয়াছি। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগলাভ আমাদিগের মত কামকাঞ্চন লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাগরসঙ্গমে গঙ্গাবগাহনের ন্যায় পাপহর এবং পবিত্রকর। এইজন্য পূর্ব্ব হইতে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুনিতে এবং পারি যদি কিছু শিখিতে। অতএব যাঁহারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ আলোচনা প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা।

আজ যে পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত, তাহার উচ্চতা গগনভেদী, প্রসার অনন্ত, গভীরতা অতলস্পর্শী।

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সভার সভাপতি কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ।

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

সুগভীর সাগরের আধারে হিমাচলের ন্যায় পুঞ্জীকৃত কজ্জল ভরিয়া পৃথ্বীর ন্যায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সারদা যাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, কোথায় সেই অপারগুণসিন্ধু শঙ্করপ্রতিম ত্যাগীশ্বর, বাগ্মী যতিপ্রবর শ্রীবিবেকানন্দ আর কোথায় আমার মত বিষয়-বিষ-কীট, অধম অজ্ঞ জন? আজ যে নামের গৌরব-সৌরভ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিলে জিহ্বা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শত হৃদয় মাতিয়া উঠে, সেই নামধেয় মহাপ্রাণ, প্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা আমি কি বলিব? যিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ—এই আমার ধর্ম্ম" তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, তাঁহার এই পবিত্রবাণী কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিলে মানব ধন্য হয়। সন্ন্যাসীর মুখে ভক্তি মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যায় যে, শ্রীবিবেকানন্দের উক্ত লোকহিতকর অনুষ্ঠান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ জ্ঞানে নর-সেবাধর্ম্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত সাধনার বিভিন্ন পথ মাত্র।

কালের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাজন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূতচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে অহৈতুকী প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা তাঁহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে অম্লান পারিজাতের ন্যায় চির-পরিস্ফুট—প্রেম এবং লোকহিতৈষণা ইঁহাদের সকল কার্য্যের প্রেরণা। পরের জন্য জীবন ধারণ—ইঁহাদের প্রতি শ্বাসবায়ু পরার্থে উৎসর্গীকৃত। প্রেমের শক্তি ত্রিলোকে অপরাজেয়। এই ক্ষুদ্র জীব নর—ক্ষণভঙ্গুর কলেবর—নিশ্বাস পবনের উপর যার জীবন নির্ভর,

সে দেবত্বের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—প্রেমে। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতা স্বর্গসুখাভিলাষী, আর ঐশী বিভূতিমণ্ডিত প্রেমিক কেবল আত্মদানপ্রয়াসী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্র—যার বলে তিনি ত্রিলোকবিজয়ী—সেই অশনি, নরমুনি দধীচির লোকহিতায় অস্থিদানে নির্ম্মিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাত্র। মাতা, পিতা, সতী, স্বদেশপ্রেমিক, ভক্ত—যাঁহাদের জন্য ধূলিধূসরা বসুন্ধরা রত্নময়ী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই প্রেম, স্বার্থ-ত্যাগ বা আত্মবলিদানের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত, নশ্বর মানবজীবনে প্রেম পরম ঐশ্বর্য্য—কেননা, এই প্রেমই সাম্য, সৌখ্য, সৌভ্রাতৃত্বের মূল এবং অদ্বৈতজ্ঞানপদ্ম বিকাশের তপনস্বরূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য-বিভূষিত বিবেকানন্দের এই প্রেমই ছিল শ্রেষ্ঠসম্পদ্। প্রেমিক নরবর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বিচরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিপুল মানবসমাজ স্বার্থপর নরপশুর মৃগয়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া উষ্ণশোণিত পান করিতেছে! কে বলে ইহা তাঁহার প্রাণারাম প্রেমময়ের প্রেমের সংসার? না—না—কখন না! ইহা নরমেধযজ্ঞস্থল! প্রেমিকহৃদয় সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যে প্রেম তাঁহার পরম প্রেমাস্পদের পূজার জন্য প্রাণের নিভৃত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহা দান করিলেন নরসেবায়। প্রেম তাঁহার ধর্ম্ম, লোকহিত—সাধনা, মোক্ষ—নরসেবা।

কিন্তু এই সেবাধর্ম্ম কি প্রকৃতপক্ষে মোক্ষধর্ম্মের বিরোধী? যে ভারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, মুমুক্ষু মানব যেখানে শরীর পরিগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত, যাহার জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, মোক্ষমূলক অদ্বৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অদ্বৈতসাধনা যাহার সনাতন ধর্ম্ম, সেখানে এ নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন কালের। এ দেশে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন নূতন নহে। যুগে যুগে অবতারপ্রমুখ যুগাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক তাহাই সাধিত হইয়াছে।

এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে তপ, জপ, যোগ-সাধনা, বিবেক-বিচার দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অতীব দুঃসাধ্য। সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেবা বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বপ্রেম অদ্বৈতপ্রেমেরই রূপান্তর। মানব মাত্রেই সচ্চিদানন্দের প্রকট বিগ্রহ। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুব্রহ্মের পূজা শাস্ত্রবচনে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতন বিগ্রহ মানবসেবায় তাহা না হইবে কেন?

ইউরোপে বহুস্থানে নরসেবা ধর্ম্ম আচরিত হয় কিন্তু তাহা নারায়ণ জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্ম্মের আচরণে সেব্য সেবকের মধ্যে গুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিয়া অদ্বৈতজ্ঞান বাধিত হয়। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করে,—"সা চাতুরী চাতুরী।"

বাস্তবিক—পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র ঐহিক মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষে পরম হিতকর। ইউরোপীয় মনস্বিগণের মত সংসারের দুঃখ দৈন্য পাপ দূর করিয়া ভূতলে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের স্থাপনা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে সুসভ্য মানব যে দানবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল জলধারার ন্যায় নররক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল সে সকরুণ কাহিনী ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত।

যতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠায় মানব প্রকৃতি হইতে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি হিংস্রবৃত্তিনিচয় নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইবে ততদিন ভূতলে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশকুসুমের মত সুদূরপরাহত। স্বার্থ বিসর্জ্জনে, একতাবন্ধনে পৃথিবীর দুঃখ তাপ দৈন্য মোচন করা যদি কখন সম্ভবপর হয়, সমগ্র মানব-

জাতি এক পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যদি কখন কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বপ্রেম বা অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানই একতার মূলমন্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, মোক্ষ সাধনের এই তিন সনাতন মার্গ। ভক্তি দুর্ল্লভ, জ্ঞান দুঃসাধ্য। প্রায় ষষ্ঠিবর্ষ এই ঘোর রহস্যময় সংসারে বিচরণ করিয়া, প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া বুঝিয়াছি যে, ঈশ্বর, আত্মা, মায়া প্রভৃতি ত অনেক দূরের কথা—এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ জগতে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। আমি কিছুই জানি না, কিছু বুঝি না; এমন কি অন্যাপেক্ষা যাহাকে আমার জানা বুঝা অধিকতর সম্ভব, সেই আমাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, কম বুঝি। যে আবাল্য দীর্ঘসাধনায় শাস্ত্র উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা অতীব দুঃসাধ্য। এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিষ্কাম কর্ম্মমার্গ, বিশেষতঃ শ্রীবিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে কেবল কর্ম্ম মার্গানুগত নরনারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী এবং জ্ঞানকর্ম্ম আবরণে মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল দুর্ব্বলকে বল, নিরন্নকে অন্ন, পীড়িতকে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা দাও, খঞ্জকে চলিতে শিখাও, অন্ধকে দৃষ্টি দান কর, আত্মা যার মোহতিমিরাবৃত তার অন্ধকার ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দাও, আর ভয়ার্ত্তকে বল—অভীঃ! আমি সেবার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, আমার মনে হয়, এই নিষ্কাম কর্ম্মই আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই চির দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ, ইহার জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল নরনারী, আর সর্ব্বোপরি,

জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যময়ী এই ভূমির বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্য দেখিলে কার না মনে হয় যে, এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত, স্বার্থৈকলক্ষ্যবিড়ম্বিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! যেখানে করাল অত্যাচার আপনার তাণ্ডবনর্ত্তনশ্রান্তিতে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! যেখানে শোকের আতিশয্যে হাহাকার স্তব্ধ, বিয়োগ-বিধুরার উষ্ণশ্বাস বহনে সমীর শ্রান্ত—মহাকাশ ভারাক্রান্ত! যেখানে অস্থিমালিনী মেদিনীর রক্তকলেবর অশ্রুধারায় ধৌত হইতেছে! সেই শ্মশানভূমে আর্ত্ত শোকার্ত্ত এখনও যারা জীবিত আছে সেই হতভাগ্যগণ প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমবাণীর জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে—তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বলিতে হইবে যে—"হিংসায় হিংসা জয় করা যায় না, ঘৃণায় ঘৃণা জয় করা যায় না, বিদ্বেষে বিদ্বেষ জয় করা যায় না! ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ জয় হয় কেবল প্রেমে।" জলধির গর্জ্জন লঙ্ঘিয়া গম্ভীর মেঘমন্দ্রে অমর সন্ন্যাসীর এই অবিনশ্বর বাণী হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হউক। সকল স্বার্থ বলি দিয়া সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রেমের বিজয় নিশান করে নির্ভীক অন্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবনসংগ্রামে যে ভীত তাহাকে বলিতে হইবে—অভীঃ—ভয়? কিসের ভয়? পূজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—"ভয়ই মৃত্যু!" বীরের মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শতবার মরে!

আজ কোথায় তুমি মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী! তোমার সেই গৈরিক-বসনাবৃত গৌরবপুঃ পরিগ্রহ করিয়া, যে নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় জগৎ জয় করিয়াছিলে, সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয়া তোমার আজানুলম্বিত বরবাহু তুলিয়া দিঙ্মুখ মুখরিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষে আর একবার বল—অভীঃ!—

বল—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

এস সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক নরবর! ভারতের এই ঘোর আধ্যাত্মিক নিশায় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আর একবার উদিত হও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করিয়া জীবন ধন্য করি।

নীরব প্রচার।

(প্রফেসার শ্রীনলিনীকান্ত সেন গুপ্ত, এম, এ)

হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ এই নশ্বর জগৎকে মায়াপঙ্কতজ্ঞান মানব চির-আবাসভূমি জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব সুখশান্তি বিধানে সতত চেষ্টা করিতেছে। সংসারসুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য স্বার্থপর হওয়াই সম্ভব কিন্তু যাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চিরশান্তির আশায় সর্ব্ব অনর্থের মূল সংসার-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় বিজন অরণ্যে, পর্ব্বতগুহায় অথবা গোপনে লোকালয়ে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কি সাধারণ মানবের ন্যায় স্বার্থপরতা বিদ্যমান আছে? এই জগৎ আজ নূতন সৃষ্ট হয় নাই অথবা ইহার প্রহেলিকা আজ প্রথম মানব নয়নে পতিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অনেক চক্ষুষ্মান্ লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক লোক মায়াময় সংসারের লোককোলাহল হইতে দূরে গোপনে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া অমর-ধামে গমন করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে এই সব মহাপুরুষের নাম লিখিয়া রাখে নাই। আমরা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রমুখ কতিপয় অবতারপুরুষের কথা শুনিতে পাই, কারণ, তাঁহারা জীবের দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে জ্ঞান বিতরণ কার্য্যে নিজ জীবন

উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থতা ও পরদুঃখকাতরতা হেতু জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জীবের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আর যাঁহারা নীরবে ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন কিন্তু প্রকাশ্যে জীবের দুঃখমোচন করেন নাই তাঁহারা কি স্বার্থপর নামে অভিহিত হইবেন? ঈশ্বরকল্প অবতারপুরুষগণের কথা ছাড়িয়া দিলে যে সব মহাপুরুষ জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থ বলিয়া ধর্ম্মজগতে উচ্চাসন পাইবার অধিকারী সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা কেবল নিজ নিজ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া নীরবে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহারা কি স্বার্থপর বলিয়া গণ্য হইবেন?

সাধারণ জাগতিক ব্যাপার আমরা যে বুদ্ধিতে বিচার করি, এই সকল অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপও কি আমরা সেই বুদ্ধিতে বিচার করিব? যাঁহারা সংসারকে ত্রিতাপের আলয় দেখিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় যে ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য ব্যথিত হয় না এ কথা কেমন করিয়া বলিব? তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে যে জগতের শুভকামনা করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে হইলে এই সব মহাপুরুষগণের সঙ্গ করিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের যে কি অলৌকিক প্রভাব তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইঁহারা নির্জ্জনে নীরবে বসিয়া যে শুভচিন্তা করেন তাহার প্রভাব কখনও ব্যর্থ হয় না—তাহা অলক্ষিতভাবে জীবের মঙ্গল সাধন করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা চিন্তার শক্তি কতদূর, তাহা জানেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, যদি তাঁহারা কোন গুহায় গমন করিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটা বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটী

চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সেই চিন্তাগুলি পর্ব্বত ভেদ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়া আসিবে, তৎপরে কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন কোন লোক উৎপন্ন করিবে, যে ব্যক্তি অবশেষে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবে।" শুনা যায়, ঋষিগণের তপোভূমিতে হিংস্রক জন্তুগণ হিংসা ভুলিয়া পরস্পর মিত্রভাবে বিচরণ করে; এরূপ স্থলে অতি পাষণ্ড সমাগত হইলেও তাহার মনে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে এবং অশান্ত হৃদয়ে শান্তি অনুভব করে। গাজীপুরের পওহারী বাবার কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি কখনও প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন নাই, এমন কি, কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা নিজ জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, এরূপ মহাপুরুষ যদি জীবকে শিক্ষা দিতেন, দেশ বিদেশে যাইয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন, তাহা হইলে জগতের অধিক উপকার হইত। আমাদের মনে এইরূপ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই—তিনি সকলকে প্রকাশ্য প্রচার করিতে পাঠান না এবং তাঁহার বিশেষ আদেশ ব্যতীতও প্রচার কার্য্য চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "চাপরাস না পাইলে লোকশিক্ষা দেওয়া চলে না"।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে এই বাণী পুনরায় সফল হইয়াছে, ইহা আজকাল অনেকেই মনে করেন। অবতার যতদিন নরদেহে বিচরণ করেন, ততদিন স্বয়ং ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন এবং স্বধামে প্রস্থান করিলে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের উপর ধর্ম্মপ্রচারভার ন্যস্ত হয়। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গ অবতারের লীলাসহায়ক—ইঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে খ্যাত। পুরাকালের ঋষিগণ অবতারের লীলা প্রচারের জন্য ধরাধামে তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হন। ইঁহারা নিত্যমুক্তের থাক্। ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া উদার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক তৎপ্রচারের ভার তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উপর দায়স্বরূপে অর্পণ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই সব মহাপুরুষ যদি প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া স্বধামে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যাঁহারা আদর্শ মহাপুরুষ, জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য যাঁহাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আগমন, তাঁহারা যদি নীরবে প্রস্থান করেন, তবে তাঁহাদিগের ধরাধামে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? স্বামী যোগানন্দ প্রমুখ দুই এক জন মহাপুরুষ—যাঁহারা অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে ঐরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। স্বার্থান্ধ মানব আমরা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির অণুমাত্র দিয়ে দেখিলে বিচলিত হইয়া উঠি এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভগবানের কার্য্যের উপরও দোষারোপ করিতে ছাড়ি না! প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অজ্ঞানতাই ঐরূপ সিদ্ধান্তের কারণ। আমরা যদি সুবুদ্ধি ও বিবেক সহায়ে ইঁহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে অন্য মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে পাই। স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াও প্রকাশ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যদি আমরা বারেক আলোচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি নীরবে আমাদিগকে কি সুন্দর শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা এখানে বিবৃত করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

স্বামী যোগানন্দ এঁড়িয়াদহ নিবাসী এক সৎব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধি বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। পৃথিবীতে আসিয়া, যেন কোন এক অপরিচিত রাজ্যে আসিয়াছেন, এরূপ মনে হইত। এজন্য লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মে নাই। কৈশোরে পদার্পণ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের অদ্ভুত

ত্যাগ, ঈশ্বরানুরাগ ও ভক্তিপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে আদর্শ মহাপুরুষজ্ঞানে তদনুসারে নিজ জীবন গঠিত করিবার বাসনা তাঁহার মনে বলবতী হয়। তিনি সদাসর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান ভজন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে পিতামাতা মনে করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ দিলে সম্ভবতঃ তাহার সংসারে মন বসিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। স্বামী যোগানন্দ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতৃভক্ত সন্তান বিবাহ করিয়া পিতামাতার মান রক্ষা করিলেন। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে ইহজীবনে অধ্যাত্ম-জীবন-লাভের সমুদয় আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিলেন এবং লজ্জায় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইতে বিষম সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার ভক্তের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরম স্নেহসহকারে বলিলেন, "হারে, তুই বিবাহ করিয়াছিস্ তা কি হইয়াছে, আমিও বিবাহ করিয়াছি। যদি তোর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস্, আমি ঠিক করিয়া দিব। আর যদি তোর সংসার ভাল না লাগে ত বল্ আমি তোর মায়া খাইয়া ফেলি।" স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের শেষ কথায় সায় দিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মায়ার বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর সহিত একদিনের জন্যও কায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই কিম্বা কখন স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করেন নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন স্বামী যোগানন্দকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলেন যে, স্বামী যোগানন্দ একবার শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর স্ত্রীর নিকট শয়ন না করিয়া সমস্ত রাত্রি ছাদে পাদচারণা করিয়া বেড়াইয়া

ছিলেন এবং প্রত্যুষে সকলে উঠিবার অগ্রে তথা হইতে প্রস্থান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদের ভিতর যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।"

স্বামী যোগানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, যদি আপাতমধুর পরিণামবিষ সংসার সুখে মন একবার বদ্ধ হয়, তাহা হইলে চিরশান্তিলাভ সুদূরপরাহত হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অমৃতত্বের অধিকারী হইতে হইলে অনিত্য সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা ভগবৎলাভের অন্তরায় বীরের ন্যায় মমতাবিহীন হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার জীবন স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছে—"হে মানবগণ, তোমরা বিষয়ভোগে সুখ পাও বটে কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক। যদি তোমরা সেই আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে চাও, তবে আর ব্রহ্মানন্দের সন্ধান পাইবে না। সেই সামান্য আনন্দের লোভে পড়িয়া শারীরিক ও মানসিক মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিও না। যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে চাও, বীরের ন্যায় অচল অটলভাবে থাকিয়া মায়ার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাও।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের পর শ্রীযুত যোগীন সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী যোগানন্দ নামে খ্যাত হন। তিনি সার্থক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—যে মন দ্বারা ভগবান্ লাভ করিতে হইবে সে মনকে তিনি কখনও সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইতে দেন নাই—সদা আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বামী যোগানন্দ স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন যে পঞ্চভূতসমষ্টি এই দেহ কিছুই নহে—আত্মাই আসল বস্তু, কিন্তু দেহ ধারণ করিলে ক্লেশভোগ অনিবার্য্য। এইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলিলেন, তাঁহাকে এবার একেবারে মুক্তি দিতে হইবে। সাধারণ জীব হইতে এই নিত্যমুক্ত শ্রেণীর প্রভেদ বিস্তর। জীব জ্ঞানলাভে মুক্তির অধিকারী হয় কিন্তু যাঁহারা অবতারের সহচর, তাঁহাদের মুক্তি নাই—

অবতারের সঙ্গে বারে বারে তাঁহাদের আগমন করিতে হয়। স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরকে বলিলেন, "আমি আর আসিতে পারিব না—এইবারকার শিক্ষাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমায় একেবারে মুক্তি দিতে হইবে।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন—"ওরে, আর এক-বার আস্‌তে হবে।" পিতার উপর পুত্র যেমন অভিমান করে ঠাকুরের উপর সেইরূপ অভিমান করিয়া স্বামী যোগানন্দ বলিলেন, "না আমি আর আসিতে পারিব না, আমায় মুক্তি দিতেই হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের মানবদেহের অন্তর্ধানের পর হইয়াছিল।

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। দেহের যন্ত্রণা হইতে লাগিল, তথাপি একদিনের জন্যও ঠাকুরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন না। তিনি জানিয়াছেন দেহটা কিছু নয় সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের ন্যায় দেহের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন নাই। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তিনি অচল অটল ধীর স্থির রহিলেন। স্থির করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মুক্তিবর লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সংকল্প জানিতে পারিয়া শয্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"তুমি জান কি, ছয়মাস ধরিয়া ক্লেশ পাইতেছ? কেন ভাই আর কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে দুঃখ দাও—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় সম্মত হও, ঠাকুরের সঙ্গে আবার আসিতে অমত করিও না। তাঁর পাঁঠা যদি তিনি লেজের দিকে কাটেন ত কার কি?" স্বামী যোগানন্দ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি, আমি ছয়মাস ধরিয়া শয্যাগত রহিয়াছি? আচ্ছা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; তিনি এ দাসকে যাহা বলিবেন, এ দাস তাহাই করিতে প্রস্তুত।" এই বলিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আত্মনিবেদন করিয়া মহাসমাধিগত হইলেন এবং তাঁহার নিকট প্রস্থান করিলেন।

গেলিলিও।

(প্রফেসার শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ)

সে প্রায় তিন শত বৎসরের কথা। যখন সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দু ও মুসলমান এক করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষেও নানাস্থানে জ্যোতিষশাস্ত্রের বেশ চর্চা ছিল, স্থানে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির গতি দেখিবার জন্য মানমন্দির ছিল। এখনও এই সব মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই সময়ে ইতালি দেশে পাইসা নগরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গেলিলিও জন্মগ্রহণ করেন (১৫৬৪-১৬৪২)। গেলিলিওর পিতা বড়ই অঙ্কশাস্ত্র ও গান বাজনা ভাল বাসিতেন; সেইজন্যই বোধ হয় অঙ্কশাস্ত্র ও কলকব্জায় তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল। অবশ্য সে সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের এত উন্নতি হয় নাই এবং তখন রেলগাড়ী, কলের জাহাজ, চটের কল, হাওয়াগাড়ী এ সব কিছুই ছিল না। কিন্তু যাহা ছিল তাহা লইয়াই তিনি কাল কাটাইতেন। গেলিলিওর পিতা ছেলেকে বেশ লেখাপড়া শিখাইবার পর ব্যবসা বাণিজ্য করিবার পরামর্শ দিলেন এবং লেখাপড়া শিখিয়া কাপড়ের কারবার করিবে এইরূপই ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। গেলিলিও লেখাপড়া শিখিতে স্কুলে যাইলেন। এই সময়ের সকল স্কুলই পাদরীগণের হাতে। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া গেলিলিও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গেলিলিওর পিতা অঙ্কশাস্ত্র অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বড়ই ভয় করিতেন, কারণ অঙ্কশাস্ত্র শিখিয়া কি হইবে? পেটের অন্ন জুটিবে না! এ সময়ে যাঁহারা অঙ্কশাস্ত্র পড়াইতেন তাঁহারা দিনে আট আনার অধিক রোজগার করিতে পারিতেন না। কিন্তু চিকিৎসা করিয়া দিনে অন্ততঃ দুইটা টাকাও ত পাইবে। কিন্তু পিতার মতলব সব ভাসিয়া গেল। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে যাইয়া গেলিলিও ঘড়ির পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ডাক্তারেরা রোগীর নাড়ী

টিপিয়া পরীক্ষা করে কিন্তু মিনিটে ঠিক কতবার নাড়ী নড়িতেছে তাহা কেমন করিয়া হিসাব করিবে? এখন সকল ডাক্তারই ঘড়ি দেখেন কিন্তু গেলিলিওর আগে ঘড়ি ছিল না; তিনি পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করিয়া নাড়ী দেখার কল আবিষ্কার করিলেন (আমরা পেণ্ডুলামের কথা পরে বলিব)। গেলিলিওর পিতা যখন দেখিলেন যে তাঁহার ছেলে চিকিৎসা শিখিতে গিয়া অঙ্কশাস্ত্র পড়িতেছে এবং নাড়ী পরীক্ষা করিতে গিয়া নাড়ী দেখার কল বাহির করিতেছে, তিনি তখন বাধ্য হইয়াই গেলিলিওকে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়িতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়াই গেলিলিও সেই সময়কার মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি পাইশা নগরে অধ্যাপকের পদ পাইলেন, কিন্তু এ কাজ লইয়া তাঁহার বড়ই মুস্কিল হইল। তাঁহার আগেকার পণ্ডিতগণের মতামত যাহা তিনি ছাত্রদিগকে বুঝাইতেন তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে ভুল বলিয়া ধারণা হইত। গেলিলিও তাঁহার নিজের ধারণাই ছাত্রদিগকে শিখাইতেন। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বড় বড় পণ্ডিতগণের কথা তিনি মানেন না, একথাটা আর চাপা রহিল না, সহরময় প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সময় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেই লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল, তাঁহারাই দেশের মধ্যে গণ্যমান্য পণ্ডিত। গেলিলিও তখন যুবাপুরুষ, তাঁহার কথা কেহই স্বীকার করিল না, বরং অন্য পণ্ডিতগণের কথা উড়াইয়া দিতেছেন বলিয়া তাঁহার অনেক শত্রু হইল। কিন্তু গেলিলিও কি করিবেন, তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিত সমাজে বিচার প্রার্থনা করিলেন। কি বিষয় লইয়া বিচার হইবে তাহার একটু আভাস এইখানে দিয়া রাখি।

গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত এরিস্টটলের সময় হইতে গেলিলিওর সময় অবধি এই দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন যে, কোনও দ্রব্য যতই ভারী হইবে, তাহা শূন্য হইতে ততই শীঘ্র শীঘ্র পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ তুমি যদি তোমার

বাটীর ছাদ হইতে একটি এক সের দ্রব্য ও আর একটি পাঁচ সের দ্রব্য এক সময়ে শূন্যে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে পাঁচ সের দ্রব্যটি এক সের দ্রব্য অপেক্ষা, পাঁচগুণ শীঘ্র জমিতে পড়িবে। পদার্থ যতগুণ বেশী ভারী হইবে সে ততই শীঘ্র শীঘ্র মাটিতে পড়িবে। কিন্তু গেলিলিও দেখিলেন যে এমতটি একেবারেই ভুল। মানুষ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ভুল শিখিয়া আসিতেছে। তাই তিনি তাঁহার নিজের ছাত্রদিগকে সত্য মত শিখাইতে লাগিলেন। গেলিলিও শিখাইলেন যে, যদি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ শূন্যে এক স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে কোনটি বা হাল্কা, কোনটি বা ভারী, কোনটি বা খুব ভারি, তাহা হইলে তাহারা কেহই আগু পেছু আসিবে না—সকলেই এক সময়ে মাটিতে আসিয়া পড়িবে। পদার্থ দশগুণ ভারী বলিয়া যে উহা দশগুণ শীঘ্র আসিবে তাহা নয়; পাঁচ সের ভারী পদার্থ যে সময়ে মাটিতে পড়িবে, দশ সের ভারী পদার্থও যদি এক সময়ে ও একই স্থান হইতে শূন্যে ছাড়া হয়, ঠিক সেই সময়ে মাটিতে আসিয়া পৌছিবে। এই চমৎকার কথা শুনিয়া পণ্ডিতগণ বড়ই রাগিয়া গেল। ২০০০ বৎসরের সত্য গেলি-লিও অমান্য করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা করিল ও ঐ সত্যের প্রমাণ চাহিল। গেলিলিও তখনই সম্মত হইলেন এবং পাইসা নগরের একটি খুব উচ্চ বাটীর চূড়া হইতে এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। গেলিলিওর প্রাণে কোন ভয় নাই—তিনি দেশশুদ্ধ শত্রু দেখিয়াও অটল রহিলেন, কারণ, তিনি জানেন তিনি নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন এবং চিরকালের জন্য সেই পুরাতন মতটিকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল। এক দিকে কেবল গেলিলিও একাকী আর অপর দিকে দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকগণ। গেলিলিও দুইটি ভারি গোলক অর্থাৎ বল লইয়া গেলেন। এই বল দুইটি তিনি বিচারকদিগের হাতে দিলেন। তাঁহারা অতি সাবধানে ওজন করিয়া দেখিলেন যে, একটির ওজন আর একটির ঠিক দ্বিগুণ

এবং বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হইয়াছে, ভারী বলটি মাটিতে দ্বিগুণ আগে পড়িবে এবং দ্বিতীয়টি অনেক পরে পড়িবে—কোন্ মত সত্য এখনই তাহা দেখা যাউক।" বল দুইটি সেই মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় লইয়া যাওয়া হইল এবং জনসাধারণ মন্দিরের নীচে জমা হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে যেই সংকেত করা হইল অমনি দুইটি বল একই সময়ে একই স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পাইসার সেই মন্দিরের চূড়া খুব উচ্চ, কাজেই বল মাটিতে পড়িতে কিছু সময় লাগিল এবং সকল লোকই বেশ দেখিতে পাইল যে, বল দুইটি একই সঙ্গে নামিতেছে এবং একই সময়ে মাটিতে ধুপ করিয়া পড়িয়া গেল। আগু পেছু কোনটিই পড়িল না। বল দুইটি আবার চূড়ার উপরে পাঠান হইল এবং বার বার ফেলিয়া দেওয়া হইল কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহারা একই সময়ে মাটিতে পৌঁছিল। গেলিলিওর জয় হইল বটে কিন্তু কেহই তাঁহার সুখ্যাতি করিল না—অন্তরে অন্তরে সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং সুবিধা পাইলেই যাহাতে তাঁহাকে জব্দ করিতে পারে এমত চেষ্টা করিতে লাগিল। গেলিলিও পদার্থের গতির নিয়ম প্রমাণ করিলেন বটে কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সে সত্য মতটি কেহই স্বীকার করিল না।

এইবার গেলিলিও পুরাণ জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া পড়িলেন এবং বহু পুরাণ মতটি* খণ্ডন করিয়া দিলেন। যে মত এতকাল চলিয়া আসিতেছিল সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ, তাহা না বলিলে আমরা গেলিলিওর অসাধারণ বুদ্ধি ও ধৈর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

আজকাল অনেকেই জানেন যে সূর্য্য আকাশের একস্থানে আছে, আর তাহার চারিধারে পৃথিবী আর পৃথিবীর মত বড় বড় গ্রহ এবং ইহাপেক্ষাও অনেক বড় বড় গ্রহ সূর্য্যের চারিধারে অবিরত ঘুরিতেছে। যাহারা সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহাদের 'গ্রহ' বলে

* Ptolemaic and Copernican system.

আর যাহারা গ্রহকে বেড়িয়া ঘুরে তাহাদের 'উপগ্রহ' বলে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। সূর্য্য যে সৌরজগতের মাঝখানে আছে, আর গ্রহগণ যে তাহাকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে একথা আগে কেহই স্বীকার করিত না। মিশর দেশের মহারাণী ক্লিয়োপেট্রার পিতৃপিতামহের সময় হইতে গেলিলিওর সময় পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত যে, পৃথিবীই মাঝখানে আছে আর সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহগণ পৃথিবীকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। যদি কেহ বলিত যে একথা সত্য নয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মূর্খ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত এবং নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিত। আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনিয়া আসিতেছি যে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাই ততটা আশ্চর্য্য বোধ করি না। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এটা অবাক্ হইবার কথা কিনা? এই ভয়ানক বড় পৃথিবীটা, গাছ পালা, পাহাড়, মানুষ ইত্যাদি লইয়া দেশ বিদেশ, বড় বড় সমুদ্র ঘাড়ে করিয়া বোঁ বোঁ করিয়া লাটুর মত ঘুরিতেছে আর আমরা তাহার উপরেই বাস করিতেছি, অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; এটা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? মানুষ কি হঠাৎ একথা বিশ্বাস করিতে পারে? তাহারা বলিয়া থাকে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে ত আমাদের মাথা নীচের দিকে চলিয়া যায়—আমরা পড়িয়া যাই না কেন? লোকে এখনই বিশ্বাস করিতে পারে না সুতরাং আগে যে একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত তাহাতে আশ্চর্য্য কি। গেলিলিও জন্মাইবার প্রায় ৫০ বৎসর আগে প্রুশিয়া দেশের এক মহাপণ্ডিত কুপার্ণিকাস্ এই মত উল্টাইয়া দেন। ইঁহার শিষ্য কেপ্লারও এই মত স্বীকার করেন এবং যে নিয়মে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা আবিষ্কার করেন। আগেকার পণ্ডিতেরা বলিত যে পৃথিবী ঠিক কেন্দ্রে আছে এবং আর আর গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্য গোলাকার পথে পৃথিবীকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। কেপ্লার তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, পৃথিবী ত মাঝখানেই নাই, সূর্য্যই মাঝখানে আছে, আর গ্রহগণ গোলাকার পথেও ঘুরিতেছে না। তাহারা সূর্য্যের

চারিধারে ডিম্বাকার পথে ঘুরিতেছে। গোলাকার পথের একটি কেন্দ্র ঠিক মাঝখানে আছে, ডিম্বাকার পথের তেমনি দুইটি কেন্দ্র আছে কিন্তু মাঝখানে কোন কেন্দ্রই নাই। সূর্য্য ইহার ভিতর এক কেন্দ্রে আছে। কেপ্লার এই মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বুধগ্রহের গতি দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার নূতন সত্য মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার করিল না। কেবল গেলিলিওই তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহা আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেপ্লার এমনি শুধু চোখে বুধগ্রহকে দেখিতেন কিন্তু গেলিলিওর আর এক সুবিধা হইয়াছিল, শুধু চোখে তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই। তিনিই নিজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সাধারণ 'অপেরা গ্লাস' যাহাকে বলে ইহাই গেলিলিওর আবিষ্কার। যদি কোন দূরের পদার্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যেন সেই দূরের পদার্থটি তোমার অনেকটা নিকটে এগাইয়া আসিয়াছে। কোন পদার্থ কাছে আসিলে তাহাতে কি আছে তাহা অনেকটা বুঝা যায়। মনে কর, তুমি মাঠের এক কোণে দাঁড়াইয়া আধ মাইল দূরের একটি বট গাছ দেখিতেছ। উহাকে হয়ত কেবল বটগাছ বলিয়া চিনিতে পারিবে। কিন্তু তাহার ডালপালা আলাদা করিয়া চিনিতে পারিবে না। সেই বট গাছ যদি অর্দ্ধেক পথ এগাইয়া আসে তাহা হইলে তাহার ডালপালা আলাদা আলাদা দেখিতে পাইবে। এমন কি হয়ত ডালে যে পাখীটি বসিয়া আছে তাহাও দেখিতে পাইবে। এই দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া দেখিলে পদার্থকে কাছে বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে, কেমন করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের হঠাৎ আবিষ্কার হইল তাহা বলিতেছি।

হলাণ্ড দেশে জানসেন নামে (কেহ কেহ বলেন উহার নাম হান্স লিপার্সে) এক চসমাওয়ালা বাস করিত। একদিন তাহার বালিকা কন্যা দুই রকমের দুইখানি চশমার কাচ (একখানির মাঝটা মোটা ধার পাতলা—আর একখানির ধার মোটা মাঝটা

পাতলা) লইয়া খেলা করিতেছিল—এটা ওটা সেটা কত জিনিষই তাহার ভিতর দিয়া দেখিতেছিল। একবার দুই হাতে দুইখানি কাচ ধরিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাবা, দেখ, দেখ, কি মজা হইয়াছে—আমাদের দোকানের সামনে দিয়া কত মানুষ, ঘোড়া চলিয়া যাইতেছে, দূরের রাস্তা কত এগাইয়া আসিয়াছে!" চশমাওয়ালা সেই কথা শুনিয়া উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটি নলের দুই দিকে দুই রকমের দুইখানি কাচ আঁটিয়া লইল ও উহার ভিতর দিয়া দূরের জিনিষ দেখিতে লাগিল—এই যন্ত্রটিই দূরবীক্ষণ হইল। চশমাওয়ালা যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক্ হইয়া যাইল। তাহার মনে হইল যেন দূরের একটা গাছ তাহার জানালার বাহিরেই রহিয়াছে, দূরের মানুষ যেন তাহার দোকানের সামনে দিয়াই চলিয়া যাইতেছে। এই কথা ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং মিডল্‌বার্গ সহরের একজন প্রসিদ্ধ চশমাওয়ালা ঐ রকম তিনটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া হলাণ্ড দেশের রাজাকে উপহার দেন (১৬০৮)।

এই বৎসর গেলিলিও ভিনিস নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ঐ দূরবীক্ষণের কথা শুনিলেন। দুই রকমের কাচ উহাতে ব্যবহার করা হইয়াছে শুনিয়াই তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং নিজের হাতেই তাঁহার মনোমত একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। গেলিলিওর পূর্ব্বে আর কেহই দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি দেখে নাই; দূরবীক্ষণ সাহায্যে যে জ্যোতিষশাস্ত্র কত উন্নতি করিতে পারে তাহা গেলিলিওই প্রথমে বুঝাইয়াছেন।

নিজের হাতে প্রথম দূরবীক্ষণ তৈয়ারী করিয়াই গেলিলিও চাঁদ দেখিতে লাগিলেন। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু কলঙ্ক যে কি কেহই জানিত না। আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছি যে, চাঁদে এক বুড়ী কুলগাছ নাড়া দিতেছে এবং দিনরাত কুলগাছ তলায় বসিয়া আছে। গেলিলিওই প্রথম বুঝিলেন যে, যেটা বুড়ী ও কুলগাছ বলিয়া মনে

হয় সেটা পাহাড় ও পাহাড়ের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। চাঁদে কেবল বড় বড় পাহাড় ও বড় বড় গহ্বর। চাঁদের নিজের কোন আলো নাই, সূর্য্যের আলো যেমন পৃথিবীতে আসিতেছে, সেই রকম চাঁদেও পড়িতেছে। সূর্য্য উঠিলে যেমন মাটিতে গাছের ছায়া পড়ে, এবং যত বেলা হয় ততই সে ছায়া আস্তে আস্তে সরিয়া যায়, সেই রকম চাঁদেও বড় বড় পাহাড়ের ছায়া সরিয়া যায় এবং সেই ছায়ার মাপ হইতে গেলিলিও পাহাড় কত উচ্চ তাহা ঠিক করিলেন। ইহার পর গেলিলিও দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহ ও উপগ্রহ দেখিতে লাগিলেন। খালি চোখে শুধু শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহগণকে আমরা নক্ষত্রের মতন মিট্ মিট্ করিতেছে দেখিয়া থাকি। রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইলে গ্রহগণের আকার ঠিক নক্ষত্রের আকারের মতই মনে হয়, সাধারণ লোকে তফাৎ বুঝিতে পারে না। গেলিলিও দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহকে দেখিতে লাগিলে (8th Jan, 1610) তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে আর মিট্‌মিটে নক্ষত্র নাই। বেশ বড় গোল যেন একখানি জলজলে রূপার থালা রহিয়াছে, এই রূপার থালার মাঝে আবার কাল কাল দাগ। এই বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা অনেকগুণ বড়! পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, গেলিলিও দেখিলেন যে বৃহস্পতির তেমনি চারিটি চন্দ্র আছে। আমাদের কেবলমাত্র একটি চাঁদ, কখন পূর্ণিমা, কখনও অমাবস্যা হয় কিন্তু বৃহস্পতির কি মজা, কখনও অমাবস্যা নাই—কখনও একসঙ্গে দুই চাঁদ, কখনও তিন চাঁদ, কখনও চারিটি চাঁদ উদিত হইতেছে।

গেলিলিও যখন এই সকল আবিষ্কার প্রকাশ করিলেন, তখন লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কুপার্ণিকাসের শিষ্যগণ বড়ই আহ্লাদিত হইল বটে কিন্তু পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ বড়ই রাগিয়া যাইল। এই সময়ে পাদরীরাই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদের মতই মত—অন্য মত সব মিথ্যা ও বুজরুগী বলিয়া জানিতে হইবে।

একে গেলিলিও প্রচার করিয়াছেন যে সূর্য্য ঘুরিতেছে না, পৃথিবী ও গ্রহগণই ঘুরিতেছে, তাহার পর আবার তিনি দূরবীক্ষণ দিয়া বৃহস্পতিকে স্বচক্ষে দেখিলেন, আবার তাহার চারিটি চাঁদও দেখিলেন—একথা পাদরীগণ সহ্য করিতে পারিল না। একথা ত তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লেখা নাই! তবে কেমন করিয়া তাহা সত্য হইতে পারে? গেলিলিওর স্পর্দ্ধা দেখিয়া পাদরীগণ তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা বলিল, "কি! এতদূর তোমার আস্পর্দ্ধা; প্রত্যেক মানুষের ও জন্তুর সাতটি জানালা আছে, যেমন দুই চোখ, দুই কাণ, দুই নাক ও এক মুখ, স্বর্গেরও তেমনি সাত জানালা থাকিবে—তাহার বেশী কখনই হইতে পারে না। এই দেখ, বৃহস্পতি আর শুক্র ইহারা আদরের নক্ষত্র, বুধ আর শনির কুদৃষ্টি আছে, সূর্য্য আর চন্দ্র ইহারা আলোক দেয়, এবং মঙ্গল কোন কাজেই লাগে না। ইহা ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখা যায় না, সুতরাং তাহারা নাই। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা তোমার চোখের ও যন্ত্রের দোষ—শয়তান তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে, এবং সেই শয়তানকে তোমার ঘাড় হইতে নামাইয়া দিতে হইবে!" এবার গেলিলিওর আর রক্ষা নাই। অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার দ্বারা তিনি কতই নূতন জ্ঞান প্রকাশ করিলেন, হাজার বৎসরের পুরাতন মত উল্টাইয়া দিলেন, সূর্য্যের ভিতর দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন, তাহাতে কাল কাল দাগ আছে, আবার সেই দাগ প্রতি বৎসরে বদলাইয়া যাইতেছে কিন্তু পাদরীরা তাঁহাকে ছাড়িল না। শয়তান ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। পাদরীরা কাল কাল পোষাক পরিয়া মুখে মুখোস পরিয়া মাটির নীচে অন্ধকার ঘরের ভিতর বিচার করিত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজকদের 'পবিত্র বিচারালয়ে' তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই বিচার নামমাত্র, এ বিচার কাজীর বিচার অপেক্ষাও ভয়ানক। ইহাদের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ইহাদের হাতে পড়িয়া কেহ আজীবন অন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেহ অন্ধকূপে

মরিয়া গিয়াছে, কেহ বা আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। ইহারা গেলিলিওকে কারাগারে রাখিয়া দিল। তিনি যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে বলা হইল, এমন কি, নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার দেহের উপর অত্যাচার করিবার ভয় দেখান হইল কিন্তু গেলিলিও অসীম ধৈর্য্যধারণ করিয়া সকলই সহ্য করিলেন, কিছুই অস্বীকার করিলেন না। এই রকম মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিচার হইত। কখনও তাঁহাকে দুই তিন মাস ধরিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে রাখিয়া দেওয়া হইত। এই রকম ১৬১৬ খ্রীঃ অবধি চলিয়াছিল। অবশেষে পাদরী বিচারকেরা বিচার করিলেন যে, গেলিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা যে কেবল মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, একেবারেই অসম্ভব এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এ মত স্বীকার করিলে মানুষ নাস্তিক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের নামে এ মত একেবারেই চলিতে পারে না। অনেক অপমান সহ্য করিয়া গেলিলিও নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে সহর হইতে দূরে আপন আবাসেই থাকিতে বলা হইল এবং পুনরায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন পুস্তক লিখিতে নিষেধ করা হইল। এইখানেই তাঁহার কষ্টের শেষ হইল না। এক চক্ষে দূর-বীক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে সেই চোখটি হারাইলেন, পরে অপর চোখটিও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। জীবনের শেষভাগ তাঁহাকে কাজে কাজেই অন্ধ অবস্থার কাটাইতে হইয়াছিল। গেলিলিও বিবাহ করেন নাই, তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গেলিলিওর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে আরও দুই একটি আবিষ্কারের কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঘড়ির 'পেণ্ডুলাম' গেলিলিওর ছেলেবেলাকার আবিষ্কার। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি একদিন পাইসার মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে একটি কাঁসার আলোক শৃঙ্খলে ঝুলান ছিল—উহা এখনও পাইসার মন্দিরে বর্ত্তমান আছে। গেলিলিও

দেখিলেন যে, ঝুলান আলোকটি আস্তে আস্তে এদিক্ ওদিক্ করিয়া দুলিতেছে, কখন অল্প দুলিতেছে, কখন বা বেশী দুলিতেছে। অনেকক্ষণ দেখিবার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অল্পই দুলুক অথবা বেশীই দুলুক একবার এদিক্ হইতে ওদিক অবধি দুলিতে যেটুকু সময় লাগিতেছে তাহা বরাবরই সমান। একবার পুরা দুলিতে যে সময় লাগিতেছে, আর একবার তাহার কমবেশ হইতেছে না। এইটি লক্ষ্য করিয়া গেলিলিও বাটী ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এইত বেশ একটা সময় হিসাব করিবার নিভুর্ল উপায় পাওয়া গেল। এখন ইহা কেমন করিয়া কাজে লাগান যাইতে পারে তাহাই দেখা যাউক। গেলিলিও বাটী আসিয়া লম্বা লম্বা সূতার একদিকে ভারী ভারী ভাঁটা বাঁধিয়া পেরেকে ঝুলাইয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন যে সূতা যদি এক সমান লম্বা থাকে তাহা হইলে ভাঁটা কম বেশী ভারী হইলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাহারা সকলেই একবার দুলিতে একই সময় লয়। একবার দুলিতে যে সময় লইবে ১০০ বার দুলিতে তাহার ১০০ গুণ সময় লইবে। আর সূতা ছোট করিয়া দিলে একবার দুলিবার সময়ও কম হইয়া যায়। ইহাই গেলিলিওর আবিষ্কৃত 'পেণ্ডুলাম'। একটি পেণ্ডুলামের দুলিবার সময় ঠিক ধরা বাঁধা আছে, তাহার কম বা বেশী হইবে না। এখন গেলিলিওর ঘড়ির কথা বলিব।

আমরা যাহাকে ঘড়ি বলি, এরকম ঘড়ি গেলিলিওর সময়ে ছিল না। খানিক সময়, যেমন ১০ মিনিট কি ১৫ মিনিট সময়ের মাপ ছিল। বালির অথবা জলের ঘড়ি ব্যবহার হইত। দুইটি পাত্র উপর নীচে করিয়া জোড়া থাকিত, এবং মাঝখানে একটী ছিদ্র থাকিত। খানিক বালি অথবা জল উপরের পাত্রে রাখিলে চুর চুর করিয়া নীচের পাত্রে পড়িতে থাকিত এবং সব বালি বা জল পড়িতে একটা সময় লইত। আবার উল্টাইয়া দিলে আবার পড়িত। এই রকমে একটা সময়ের মাপ হইত। এই বালির ঘড়িতে একটা মোটামুট সময়ের আন্দাজ হইত মাত্র।—খুব সঠিকভাবে অল্প সময় মাপিবার

উপায় ছিল না। কিন্তু পেণ্ডুলামে তাহা হইতে পারে। গেলিলিওর পরে ঘড়িতে এই পেণ্ডুলাম লাগান হয়।

শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী ও তাহাদের উৎপত্তি।

(শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

এই রাজ্য সমষ্টির সংখ্যা ২৮। ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্য আছে এবং এই পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলি তাহাদের মধ্যে কোন্ অংশ অধিকার করে এবং তাহারা পঞ্জাব ছোট লাটের কোন্ কোন্ প্রতিনিধির অধীনে বর্ত্তমান আছে সে বিষয় প্রথমে জানা আবশ্যক।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ৫টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—

(১) পাতিয়ালা, ভাওয়ালপুর, ঝিন্দ, নাভা—ইহারা ফুল্‌কিয়ান ষ্টেটের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীন।

(২) কপুর্থলা, মালেরকোটলা, মণ্ডি, সুকেত্ ও ফরিদকোট, জালন্ধর বিভাগের কমিশনারের অধীন।

(৩) শিরমুর, কালসিয়হ, লোহারু, দুজ্ঞানা ও পাতন্দি, দিল্লীর কমিশনরের অধীন।

(৪) চম্বা লাহোর বিভাগের কমিশনারের অধীন।

(৫) শিমলার অধীন পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি শিমলার ডেপুটী কমিশনারের অধীন।

ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মুলতান ও ডেরা-গাজী-খাঁর কমিশনারদ্বয়ের অধীন আছে।

এই স্বাধীন ও অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে শিমলার অধীন পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি এযাবৎকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। যদিচ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নরপতিগণ সামান্য ভূম্যধিকারী কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলেই কয়েক সহস্র রাজস্ব-সম্বলিত ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীও রাজ্যেশ্বর রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এরূপ ভূম্যধিকারী অসংখ্য আছেন কিন্তু তাঁহাদিগকে গণনার মধ্যেই আনা হয় না, কারণ, পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল রাজ্যেশ্বর ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হইলেও প্রায় সকলেই রাজবংশীয়। বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস থাকিলে বাঙ্গলারও অনেক জমিদার প্রাচীন রাজবংশ হইতে আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিতে পারিতেন।

যাহা হউক এই রাজ্যগুলি সংখ্যায় ২৮টি যথা—বিলাসপুর, বসাহর বা বাসহর, নলাগড় (হিন্দোর), কেঁওথাল, বাঘহাল, বাঘহাট, যুব্বল, কুমারসেন, ভজ্জি, মৈলো, বাল্‌সান, ধামি, কুটহর, কুনিহর, মঙ্গল, বিজা, দ্বারকুটি, তরোচ, সঙ্গরি, কানি, দাস্তি, কোটী, থিওগ, মাধান, ঘোন্দ, রতেশ, রইন, এবং ধাদি।

এই রাজ্যসমষ্টি ইংরাজ রাজের অধীনে Hill States নামে পরিচিত। ইহাদিগের অধ্যক্ষ (Superintendent) শিমলার ডেপুটী কমিশনরের অধীন। শিরমূর বর্ত্তমান সময়ে শিমলার ডিপুটী কমি-শনরের অধীন না হইলেও ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী পার্ব্বত্য স্বাধীন রাজ্য এবং এক সময়ে ইহা Hill Statesর অন্তর্গত হওয়ায় আমা-দের বক্তব্য স্থানীয় হইতে পারে।

এই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও বহু পুরাতন, কিন্তু হিমালয়ের হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ কবে লোকবসতির উপযুক্ত হইয়া উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী হইয়াছে তাহার সম্যক্ ইতিহাস পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, মনোহারিত্বে এবং নির্জ্জনতায় তপোবনবিহারী তাপসদিগের আশ্রমস্থানীয় হইয়া আসি-

য়াছে। ক্রমশঃ লোকে সভ্যতার প্রসারণের সহিত এই স্থানের খনিজ বিভবের আকর্ষণেই হউক বা রাজনৈতিক অন্য যে কারণেই হউক এই সকল স্থান ক্রমে জনসমাজে সুপরিচিত হওয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছে। আমাদের দেশের একটা প্রধান দোষ, এ দেশের লোকেরা কোন যুগেই আপনাদের সম্যক্ ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। আমাদের ইতিহাস অপর দেশের নিঃস্বার্থপর মহাত্মাগণের প্রাণান্তপণ চেষ্টায় জানিতে পারি। জেনারেল কানিংহ্যাম তাঁহার Ancient Geography of India এবং Archeological Survey Reportsএ এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের কতক কতক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিবরণ অসম্পূর্ণ হইলেও অনেক বিষয় জানা যায়। রামায়ণের কৌলুট, বিষ্ণুপুরাণের কুলুট এবং হিংংসিয়াঙ্গের Kui-lu-to তাঁহার মতে কাংগ্রা প্রদেশের কুলু নামক স্থানকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। বহু পুরাকাল হইতে এমন কি বৌদ্ধযুগের মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্ব হইতেও এ সকল প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের বিদ্যমানতা স্থির করিতে পারা যায়। রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় রাজপুত জাতি মহাভারতের সময়ের পূর্ব্বে চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ হইতে আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিয়া থাকে। ঐ রাজপুত জাতিই পরে এই সকল প্রদেশ বন্যার মত প্লাবিত করিয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত অত্রস্থ রাজবংশগুলি আপনাদের উৎপত্তি সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এবং মহাভারতোক্ত জাতিবিশেষ হইতে অনুসরণ করিয়া থাকে। কানিংহাম যে Katoch জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে কোন ক্ষত্র জাতি বলিয়া ধরিতে পারা যায়। বহু পুরাকাল হইতে কাংগ্রা এই সকল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া আসিতেছে। মহাভারতের "ত্রিগর্ত্ত" প্রদেশকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইদানীং কাংগ্রা * ও তাহার অধীন রাজ্যগুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

* দুঃখের বিষয় এতদিন পরে কাংগ্রার প্রাচীন দুর্গ ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে।—লেখক।

কাল্পনিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগেও প্রমাণ-সিদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায়। গ্রীস রাজ্যের দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও পঞ্চনদের উত্তরস্থিত পার্ব্বত্যরাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দিগ্বিজয়ী শিলাদিত্য উত্তরে সমস্ত পার্ব্বত্য রাজ্য এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা তাঁহার ইতিহাসে বলেন কান্যকুব্জের সমৃদ্ধির সময় কোন কান্যকুব্জাধিপতি কুমায়ুন হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্যগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। হিয়ংসিয়াঙ্গের সময় পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি স্বাধীনতা হারাইয়া জালন্ধরাধিপতির সামন্ত রাজ্যরূপে বিরাজমান ছিল। হিয়ংসিয়ঙ্গ কিউলুটু নামক যে প্রধান রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিকেরা তাহাকে বর্ত্তমান কুলু, বাঙ্গাল, বসাহর, মণ্ডি, সুকেত ইত্যাদি রাজ্যের সমষ্টিরূপে স্থির করিয়া থাকেন।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার নির্ণয় সম্বন্ধে ইদনীন্তন কালে প্রবল চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Civilisation in Ancient India নামক পুস্তকে বলিয়াছেন ৮০০ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ উজ্জয়িনীর গৌরব হ্রতমান হওয়ার পর হইতে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতের বিশেষ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি তাহাকে অন্ধকার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের সময় উত্তর ভারত প্রায় সমস্তই রাজপুত জাতির অধীন ছিল এবং ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে সেই সময় হইতেই এই সকল প্রদেশে রাজপুত জাতির প্রভাব সমধিক ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। Hill State গুলির প্রায় প্রত্যেক রাজবংশের আদিপুরুষকে এই সময় হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান অধিকারে এই সকল রাজ্য অধিকাংশ স্থলে দেওয়ানী বা জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল। শাহজাহান ও আরঙ্গজেবের বহু পত্রাদি এখনও ঐ সকল প্রদেশে পাওয়া যায় যাহাতে পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দকে দেওয়ান বা জমিদার রূপে সম্ভাষণ করা হইয়াছে।

আবার অনেক সময়ে তাহারা সম্রাটের অধীনে রাজকার্য্যেরও অংশবহন করিয়াছেন। মহম্মদ গজনবীর প্রথম ভারতাক্রমণ হইতে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পর পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে দিল্লীশ্বরের রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভাগ্যনেমীর আঘাতে বহুবার তাহাদের অদৃষ্টপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সময়ে জালন্ধরের রাজশক্তি অন্তর্হিত হইয়া কাংগ্রা পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির কেন্দ্রস্থলরূপে বরিত হইয়াছিল। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গজনবী কাংগ্রার বিখ্যাত নগরকোট মন্দিরের ধনৈশ্বর্য্যের সংবাদ পাইয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে তোগলকবংশীয় সম্রাট্ ফিরোজউদ্দিন একবার পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের মিলন ও সাম্যনীতি পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিকে একেবারে রাজশক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফেরিস্তা তাহার কিছু সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তদবধি এই সকল প্রদেশ মোগল সম্রাটের সামন্ত-রাজ্যরূপেই অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। অধীনতা কাহারও প্রিয় হয় না। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পার্ব্বত্য নৃপতিগণ একবার অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হন। এই সময় হইতেই এই সকল স্থান সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। রাজপুতনার উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি ও নিদাঘে রাজধানী আগ্রার জ্বালাময়ী উত্তপ্ত বায়ুর সহিত হিমালয়ের ফলপুষ্পশোভান্বিত. শীতল ও শ্রান্তিনিবারক সমীরণস্নিগ্ধ উপত্যকাভূমিগুলির তুলনায় সম্রাট্ বড়ই প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেন। এমনকি চম্বা, কাংগ্রা, মণ্ডি এই সকল স্থানের কোন একটি স্থানে তাঁহার গ্রীষ্মরাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীর চিরকালই আপনার গৌরব মস্তকে বহন করিয়া সম্রাটকে আকর্ষণ করিয়া লয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে পার্ব্বত্য নরপতিগণ বিশেষ ক্ষমতালাভ করিয়া অর্দ্ধস্বাধীনরূপে

আপনাদের রাজত্বে বাস করিতেন। নূরপুরের * রাজা জগৎসিংহ এই সময়ে পার্ব্বত্য নৃপতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ক্ষমতা, শৌর্য্য ও মহৎগুণে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। রাজা জগৎসিংহের পৌত্র রাজা মানসিংহ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার একজন প্রধান মনসবদার হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাংগ্রার রাজা ঘেমন্ত সিংহ আহমদ্ শাহ দুরানী কর্ত্তৃক শতদ্রু হইতে ইরাবতী (রাবি) পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন। রাজশক্তির পতনের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ স্বীয় স্বীয় প্রদেশেই সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইতে লাগিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ইহলীলা সম্বরণ করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজের শনৈঃ শনৈঃ ভারত-সিংহাসন অধিকার করা পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের ইহাও একটি অন্ধকার পর্য্যায়। এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশবাসী আক্রমণ-কারীর অত্যাচারে মোগলের সঞ্চিত ধনরত্ন বার বার লুণ্ঠিত হইয়াছে। সুশাসনের অভাবে ও রাজ্যের এই অব্যবস্থিত অবস্থার সময় অনেকেই দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সুযোগ ও সুবিধা পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই ও এই অবসরে তাহারাও আপনাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আহমদ্ শাহ দুরানীর দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণের সময়—নবাব সৈয়ফ আলি

---

* নূরপুর বর্ত্তমান কাংগ্রা জিলার অন্তর্গত নূরপুর মৌজার প্রধান নগর। কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের নামানুসারে ইহার নূরপুর নাম-করণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাট্ নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীরের নামেই প্রসিদ্ধ।

খাঁ পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির শাসনকর্তা ছিলেন। রাজ্যের হস্তান্তরের সহিত তাঁহারও ক্ষমতার হস্তান্তর হয় এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে * তাঁহার মৃত্যুর সময় সংসার চন্দ্র কাংগ্রার অধিপতি ছিলেন। এই সংসার চন্দ্রই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রধানস্থানীয়, কারণ, তাঁহার সময় হইতেই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে।

নবাব সাহেবের মৃত্যু হইলে সংসার চন্দ্র কাংগ্রা দুর্গ অবরোধ স্থাপনে বিলম্ব করেন নাই, কিন্তু দুর্গের ধ্বংস সাধনে তাঁহার ক্ষমতায় সঙ্কুলান না হওয়ায়—সর্ব্বত্রে সকল সময়ে যেমন হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপ স্বার্থবলিদান অপেক্ষা স্বার্থসাধনই তাঁহার নিকট কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। সংসার চন্দ্র মন্দ লোক ছিলেন না। তাৎকালীন পার্ব্বত্য নৃপতিগণমধ্যে গুণে ও ক্ষমতায় উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে উহা অনেক সময় নিজের ও আশ্রিতবর্গের বিপদের কারণ হইয়া উঠে। বহুকাল হইতে পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ কাংগ্রার করদ রাজ্যরূপেই অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। কাংগ্রাদুর্গ জয়পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে কাংগ্রা সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী ঐ সকল রাজ্যের অধিপতি হইবার বাসনা সংসার চন্দ্রের মনে বলবতী হইতে থাকে। সংসার চন্দ্র কাংগ্রাদুর্গ স্বয়ং জয় করিতে না পারায় তাৎকালীন সমৃদ্ধিশালী শিখদের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সে সময়ে একবারও তাঁহার মনে হয় নাই যে গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য বিজাতি বা বিদেশীকে গৃহ মধ্যে আনিলে কোন পক্ষেরই গৃহমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সে বিশেষ বাধ্য থাকে না। সংসার চন্দ্র রণজিৎসিংহের

* Barnes' Settlement Report. Sir L. Griffin তাঁহার Punjab Chiefs নামক পুস্তকে নবাবের মৃত্যুকাল ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ধরিয়াছেন, এস্থলে Barnes সহিত তাঁহার ঐক্য হইতেছে না।

অধীনে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সরদার জয়সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে তিনি এবম্বিধ সুযোগ ত্যাগ না করিয়া সরদার গুরু বক্স সিংহকে সংসার চন্দ্রের সাহায্যার্থে পাঠান। গুরুবক্স সিংহ তাঁহার জাতীয় প্রকৃত্যানুযায়ী ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সংসার চন্দ্রের জন্য নহে, স্বীয় প্রভুর জন্য এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর কাংগ্রা তাহার ন্যায্য অধিপতির অধীনে আসে।

সংসার চন্দ্র এতদিন পরে তাঁহার কল্পনার পরিণতি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ তিনি মোগল রাজসভার অনুকরণে তাঁহার রাজসভায় করদ রাজগণের বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজাধিরাজকে সম্মান প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত করেন। যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে স্বীয় অবস্থানুযায়ী সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে হইত। ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর প্রায় সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াও তাঁহার ক্ষোভ নিবৃত্তি না হওয়ায় মহা-রাজ রণজিৎসিংহের রাজ্য সীমান্তে তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হোসিয়ারপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন; সেখানেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বত্য রাজ্য বিলাসপুর বা বর্ত্তমান কৈহলুয়রের উপর আপতিত হন। কৈহলুয়রের তাৎকালীন অধিপতি রাণা মহাচন্দ্রসিংহ সে অপমানের প্রতিফল প্রদানে সক্ষম না হওয়ায় গুর্খাদিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া পাঠান। এই নিদারুণ ঘটনা পার্ব্বত্যরাজ্যের ইতিহাসে অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে বিভাগরেখার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই অবসরে এতৎ প্রদেশে গুর্খাদিগের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাসমর ভারত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। কিরূপে হিমালয়ের স্বাধীন নেপালরাজ ও

অসাধারণ বিক্রমশালী নেপালীকে ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাও জানিবার বিষয়। স্বাভাবিক নিয়মে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে একদিন উন্নতি বা সৌভাগ্যের শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইয়া থাকে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" এই প্রাচীন ভারতে কত জাতি কত রাজ্য ও রাজরাজেন্দ্রগণ একদিন অভ্যুদয়ের শিখরদেশে অবস্থিত ছিলেন—আজ তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জানিতে হয়। নেপালের জীবনেও ঐরূপ একদিন আসিয়াছিল। পূর্ব্বে নেপাল কয়েকজন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৯ খ্রীঃ পৃথ্বীনারায়ণসিংহ গুর্খা জাতির অধিপতি ছিলেন। ইঁহারই সময় হইতে নেপালের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সময়। এই সময় তিনি রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং তাঁহার জীবিতকাল মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি নেপালকে উন্নতির উচ্চ সোপানে রাখিয়া যান। ১৭৭১ খ্রীঃ তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার দুই পুত্র প্রতাপসিংহ ও বাহাদুর সিংহ। প্রতাপসিংহ অধিক দিন পিতৃসিংহাসন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭৭৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রতাপসিংহের পুত্র রণবাহাদুর সিংহ ১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করেন। এই সময়ে গুর্খাগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাদৃপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ গুর্খাগণ নেপাল হইতে বহির্গত হইয়া একদিকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্য্যন্ত অপর দিকে তিব্বত পর্য্যন্ত একাধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল। পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি সে সময়ে একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। নেপাল পক্ষে বীরাগ্রগণ্য অমরসিংহের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। পার্ব্বত্যরাজ্যের অধিকাংশ তাঁহারই বাহুবলে জিত। নেপালযুদ্ধের সময় তিনিই ইংরাজদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কাংগ্রাধিপতি সংসারচন্দ্র যখন বিলাসপুর আক্রমণ করেন সে সময়ে বিলাসপুরাধিপতি অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী ক্ষমতাশালী গুর্খাদিগকেই আহ্বান করিয়া পাঠান। গুর্খাগণ এ

সুযোগ ত্যাগ করে নাই। সংসারচন্দ্র যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীঃ বৈশাখ মাসে মহলমোরীর নিকট প্রথম যুদ্ধেই সংসারচন্দ্র পরাজিত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিন বৎসরকাল গুর্খাগণ এতদ্প্রদেশে যৎপরোনাস্তি লুণ্ঠন করিতে থাকে। সংসার চন্দ্র কিছুতেই ইহাদের দমন করিতে না পারায় অবশেষে আবার রণজিৎসিংহের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন। শিখরাজ এবারও এ সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। ১৮০৯ খ্রীঃ শ্রাবণ মাসে কাংগ্রার সমতলভূমিতে শিখরাজের ভুবনবিখ্যাত খাল্‌সা সৈন্যের সহিত গুর্খা-দিগের লোকধ্বংসকারী এক যুদ্ধ হয়। বহু আয়াস ও কৌশলের পর শিখসৈন্য গুর্খাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধ শেষের সহিত সংসারচন্দ্রের স্বাধীনতারও শেষ হয় এবং তাঁহার অধঃপতনের সহিত তাঁহার রাজ্যের ও সামন্ত রাজন্যবর্গেরও অধঃ-পতন সাধিত হইতে থাকে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সমস্ত পার্ব্বত্য রাজ্যেই আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে বিলম্ব করেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বৈষ্ণব-দর্শন।

(শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, এম এ)

পূর্ব্বভাষ।

(১)

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম কোন্ সময় হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার যথাযথ ক্রম জানিবার কোন বিশেষ উপায় নাই। বৈদিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম থাকিতে পারে —কিন্তু তাহার কোনরূপ বিবরণ অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। ইহার পরযুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল একথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালীন

বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। প্রত্যুত বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিলে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া বাতুলতার কার্য্য এই যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম-পদ্ধতি অথবা বৈষ্ণব-দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই। তবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সে সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের দিক্ দিয়াই দেখ আর ভক্তির দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে নিবদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান জ্ঞানেরও যেমন চরম, ভক্তিরও তেমনই চরম। কিন্তু সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভেদে এই বাক্যের অনুভবের পার্থক্য আছে, আর সেই অনুভব লইয়া চিত্ত-বৃত্তির প্রবাহেরও পার্থক্য আছে। উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয়ে ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মনিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমেই সবিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উক্ত দার্শনিক হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপথেই শ্রুতিবাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

'সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সবিশেষ ব্রহ্মকেই ভক্তিমার্গের ভিত্তি করিয়াছেন।...জীব ও জগৎ লইয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। জীব ও জগৎ লইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব ও জগৎ লইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সাধনা ও অনন্তলীলা। সেই সাধনা ও সেই লীলার সাধারণ নাম বৈষ্ণব-দর্শন বা ভক্তি।'

ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ। যাস্কের নিরুক্তের উপর দেবরাজ যজ্বের নির্ব্বচন টীকায় দেবতাদিগের সংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে—"দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ" অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারাই দেব।

আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনা-কাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বলদেবপ্রমুখ বেদান্তদর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষৎকেই তাঁহাদের মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ ও চতুর্ব্বেদশিক্ষায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। নীলকণ্ঠ মহাভারত-ভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তা নয়। বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভক্তিশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ "এই যে সমস্ত সত্যের কথা বলা হইল এগুলি যদি এরূপ মহাত্মার নিকট কীর্ত্তিত হয় যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি আছে—এবং ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইবে।" এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলা হইয়াছে। অধুনা আমরা যাঁহাকে ভগবদ্‌বিগ্রহ বলিয়া থাকি শ্বেতাশ্বতরের 'দেব' বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই উপনিষৎখানি অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের পরবর্ত্তী কালের—কিন্তু ভগবদ্‌গীতার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। আমার মনে হয়, এই শ্লোকের ভক্তি শব্দ হইতেই পারিভাষিক ভক্তিশব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আর এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নূতন ধর্ম্মমত বুঝাইবার জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে অনেক সময় তৎকালপ্রচলিত শব্দ হইতেই পরিভাষা প্রণয়নের রীতি দেখা যায়। তখন সেই পরিভাষার অর্থ পুরাতন অর্থকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া না দিলেও ইহার নূতনত্বের একটা বিশিষ্ট বিশেষত্বই বজায় রাখিয়া দেয়।

এমন কি পাশ্চাত্য গ্রীক ধর্ম্ম বা রোমানক্যাথলিক ধর্ম্ম অথবা English Evangelical Schoolএও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে ভক্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষতঃ নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে মুমূর্ষু ভীষ্মের উক্তিতে, সংজ্ঞাত্মক ভক্তি শব্দের উল্লেখ আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র ভক্তিরই উপদেশ আছে তা নয়, তবে সংস্কৃত সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় গীতার পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ ভক্তিতত্ত্ব কোথাও উপদেশ করা হয় নাই। ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে ভক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট ভক্তিশব্দ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেরূপে বিকসিত হইয়াছিল এবং তাহা যেরূপে প্রচলিত ছিল ভগবদ্‌গীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হইলেও ইহাই তাহার বিশেষত্ব। উপনিষদ্‌নিচয়ে মন, সূর্য্য, চন্দ্র বা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অন্ন প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার কথা আছে। অনুরাগের সহিত এইরূপ উপাসনা দ্বারা উপাসিতব্য পদার্থকে এত বড় করিয়া এমনই গৌরবান্বিত করিয়া তোলে যে তাহাতে উপাসকের হৃদয়ে তদ্‌বস্তুর প্রতি একান্ত প্রশংসা—ভালবাসার উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্‌ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" (১।৪।৮)

এই অন্তরতম আত্মা পুত্র, ধন এবং অন্য সমস্ত যাহা কিছু তদপেক্ষা প্রিয়।

এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে—

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তহৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।

স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"—"ইনি সেই মহান্ অজ আত্মা যিনি প্রাণাদির মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অন্তরাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সকলের বশী, সকলের শাসক, সকলের অধিপতি। সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিয়া তিনি সাধু বা অসাধু হন না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি লোক-সমুদয়ের পরস্পর সংযোজক সেতু এবং তিনিই ইহাদের সম্ভেদ নিবারণ করিয়া ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বেদবচন দ্বারা যজ্ঞ, দান ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন তিনি মুনি হইয়া যান। প্রব্রাজিগণ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না—তাঁহারা বলিতেন—যখন আমরা এই আত্মাকে পাইয়াছি, এই লোক বাসের জন্য পাইয়াছি তখন প্রজা লইয়া আমরা কি করিব? এই জন্যই তাঁহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।" এখন বলুন দেখি, যখন এই প্রাচীন জ্ঞানিগণ সেই ভূমা ব্রহ্মে অবস্থিতি করিবার জন্য, তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য, পৃথিবীর সকল সুখস্বাচ্ছন্দ পরিবর্জ্জন করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা কিসের প্রেরণায় এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন? ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রণোদিত না হইয়া কি ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? 'ভক্তি' শব্দ স্পষ্ট না থাকিলেও ভক্তিভাব যে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে ও মানব-হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শনজনিত আনন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত

ওজস্বিনী উক্তির মূলে কি এমন কোন ভাব নাই যাহা ভক্তিপদ-বাচ্য? আর ঋগ্বেদের ঋকৃগুলি যখন উদাত্তস্বরে উদগীত হইয়াছিল তখন ঋগ্-রচয়িতা ঋষিদিগের হৃদয়ে ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি একটা ভক্তির ভাব, ভালবাসার ভাব সর্ব্বদা জাগরূক ছিল ইহা কে অস্বীকার করিবে? "দ্যৌ তুমি আমার মন্দ ঘুচাইয়া দাও"—"পিতা যেমন পুত্রের সুলভ তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ সুগম হও।" সেই অদিতি—অসীমই আমার দ্যৌ, অন্তরীক্ষ—অদিতি আমার পিতা, মাতা, পুত্র:—"অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা পিতা পুত্রঃ" (ঋক্ ১।৮৯।১০)। দ্যৌ আমার জনিতা পিতা—"দ্যৌর্মে জনিতা পিতা" (ঋক্ ১।১৬৪।৩৩)।

এই যে প্রার্থনা এগুলি কি প্রতিপন্ন করিতেছে? যদিও পরবর্ত্তী যুগের যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ড এই সমস্ত ঋষিবচনের ভাবগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া শুধু মুখস্থ সূত্রে পরিণত করিয়াছিল, তথাপি এই ঋগ্বচন-গুলি প্রথমে ঈরিত হইবার সময় ঋষিদিগের হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছিল তাহার ক্রম ভঙ্গ হয় নাই—তাহা বরাবরই চলিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য থমকাইয়া থাকিলেও সেই ভাব পুনরায় আশ্চর্য্যভাবের সহিত মিলিত হইয়া উপনিষদের সময় দেখা দিয়াছিল। তবে এই ভাবের অস্তিত্ব যে উপনিষদের পূর্ব্বে ছিল না একথা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মুণ্ডক উপনিষদ্ ঋক্‌সংহিতার ১।১৬৪।২০ ঋকের পুনরুক্তি করিয়া রূপকের ভাষায় বলিয়াছে—"দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায় তখন সে তাহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।"

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্যমহিমানমিতিবীতশোকঃ॥

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে এবং কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ শ্লোকে উপদেশ করিতেছে—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্।"

'এই আত্মাকে প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই বরণ বা পাইবার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসনা তাহা দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার নিকটে আপনার স্বরূপ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

বৃহদারণ্যক (৩।৭) ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদেও (৩।৮) এইরূপ ভক্তিভাবদ্যোতক শ্লোক আছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপনিষদের সময় এইরূপ একটী মত প্রচলিত ছিল যে জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন এবং জীবাত্মা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য লালায়িত। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবদ্গীতার ঐকান্তিকধর্ম্মের সমস্ত উপকরণই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিক সাহিত্যে নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য ভালবাসা অর্থে ভক্তিশব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। গীতা যে সর্ব্বদর্শনসমন্বয় গ্রন্থ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গীতাতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত হইয়া সপ্রমাণ করিতেছে যেন এই দুইটী মত পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ ছিল।—

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।"

'তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা সাংখ্যের অন্তর্গত, এক্ষণে যোগশাস্ত্রে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর।' গীতা যে পদ্ধতিতে লিখিত তাহাতে ইহাকে দর্শন-সমন্বয়-গ্রন্থ বলা অন্যায় নয়। তবে ইহাতে সর্ব্বোপরি একটী নূতন তত্বের বীজ উপ্ত আছে—তাহা মাত্র

অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই তত্ত্বটী ভগবদ্‌বিগ্রহে ভক্তি। এ ভক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি নয়—ইহা সবিশেষ ভগবানের প্রতি। গীতা ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেরই কথা অন্যত্র বিবৃতি করিয়াছে। কিন্তু ভক্তি সম্পর্কে সগুণ ব্রহ্মকেই বিশেষ করিয়াছেন। বাস্তবিক "অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্কম্প, প্রশান্ত নিথর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচিবিক্ষুব্ধ স্পন্দন তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ। একই ব্রহ্ম কখনও নির্গুণ—কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম-মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ-সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ—নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা, পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাগ। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।" (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ১৪ পৃঃ) পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতায় ভক্তিবাদের অঙ্কুর মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে পরযুগের বিস্তৃতি বা উচ্ছ্বাস আদৌ নাই সত্য, তথাপি ইহা যে ধর্ম্ম ও দর্শনের চিন্তাধারায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে গীতাই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়েই ভক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর এই অধ্যায়ই বিরাট্‌রূপ দর্শনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়। বিরাট্‌রূপদর্শনের পর ভক্তি ব্যতীত বোধ হয় আর কোন বিষয়ের অবতারণা যুক্তিযুক্তও হয় না। যাহা হউক এই অধ্যায়ে "ভক্তি" শব্দের মাত্র দুইবার উল্লেখ আছে, আর সমগ্র গীতায় এই শব্দের উল্লেখ ১৪ বার মাত্র (৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোকে, ৮ম—১০, ২২; ৯ম,—১৪, ২৬, ২৯; ১১শ—৫৪; ১২শ—১৭, ১৯; ১৩শ—১০; ১৪শ—২৬; ১৮শ—৫৪, ৫৫, ৬৮)। অবশ্য ভজ্ ধাতু নিষ্পন্ন 'ভক্ত' ও 'ভজামি' পদের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া

যায়। সাগ্রহ পূজার্থেই ভজ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভক্তি শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। একটী অর্থ (১) পূজনীয় বিষয়ে অনুরাগ, পূজা, সেবা। এটী সামান্য অর্থ। আর একটী অর্থ পারিভাষিক—(২) ভগবানে বিশেষরূপ অনুরক্তি। গীতায় উল্লিখিত ১৪টী উদাহরণে ভক্তি এই পারিভাষিক অর্থে সকল স্থানে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয় না। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে সম্ভবতঃ পারিভাষিক অর্থে ভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই। ৯ম অধ্যায়ের ২৬ ও ২৯ শ্লোকে ভক্তি বিশেষরূপ পূজানুরক্তি অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকের সমস্তটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না :

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" ২৯

পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ; আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

এই শ্লোকে ভক্তির অর্থ অন্যরূপ। ইহার যদি পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এখানে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। গীতার এই শ্লোকটী পড়িলেই যে, ময়ি প্রভৃতি পদের প্রতিই প্রথম লক্ষ্য হয়। ভক্তিযোগাধ্যায়ে ভক্তির ব্যাখ্যা আমাদের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই। এইখানে এবং অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়; কিন্তু কোথাও এরূপ উক্তি নাই যে ভগবান্ মানুষের প্রিয়, আর মানুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আত্মাকে ভগবানে অর্পণ এবং আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুর ভগবানে সমর্পণ—ইহাই গীতার ভক্তি। পরস্পরের প্রীতির আদান প্রদানের ব্যাপারও গীতাতে অভিব্যক্ত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ, আর গীতার ভক্তিই ভক্তির প্রথম তরঙ্গ। ইহার পর সহস্র বৎসরের মধ্যে ভক্তির অভিব্যক্তির আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। গীতার সময় বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর। গীতা-রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কৃষ্ণতত্ত্বে আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। গোপাল-কৃষ্ণের পূজার নিদর্শন কবি ভাসের কাব্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছি। গোপালকৃষ্ণের পূজা অবলম্বন করিয়াই ভক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে সাহিত্যে সেই অভিব্যক্তির লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। গোপালকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই দ্বিতীয় তরঙ্গের ভক্তির অভিব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের প্রবৃত্তি। দ্বিতীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে বলিবার মত বিশেষ কিছু উপাদান, উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই—সুতরাং সে সম্বন্ধে অধুনা নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির নানারূপ ব্যাখ্যা, বিবৃতি, বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই

সময় হইতেই ধর্মে আবেগ—উচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি। দক্ষিণ ভারতে "শ্রীরামচন্দ্র" ভক্তদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—উত্তর, মধ্যভারত ও বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণ—দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম কর্ণাটে 'বিট্‌ঠল" সাধক ভক্তদিগের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের বিবৃতিব্যঞ্জক যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে নারদপঞ্চরাত্র ও স্বপ্নেশ্বর টীকাসমন্বিত শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তিসূত্র বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নারদপঞ্চরাত্র মহাকাব্যের ধরণে একখানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে যে নারদকে সাধ্য সাধনা করিয়া কৈলাসে পাঠান হইল। উদ্দেশ্য, তিনি গিয়া শিবের সহিত কৃষ্ণপূজার প্রয়োজন সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আসিবেন। কৈলাসে একটী বেশ দৃশ্যের অবতারণা। পৌরাণিক সমস্ত দেবতাকে লইয়া কৃষ্ণের স্তুতিগান। এখানি ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবশ্য পাঠ্য পুস্তক—ইহাতে বহু কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রার্থনার একটা প্রকাণ্ড বিবরণ আছে। এইগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থখানিকে নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের রচনাভঙ্গী একেবারে হীন ও জঘন্য। নারদ যখন বনভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা করিতেছেন, তখন ৮৪ প্রকার বৃক্ষের বিবরণ ইহাতে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ, প্রত্যেক শ্লোকে এত পুনরুক্তি এরূপ বিকট রকমের অলঙ্কার যে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়াও নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া থাকা যায় না।

তারপর ভক্তিসূত্রের কথা। সূত্রকার বা টীকাকারের সময় জানিতে পারি নাই। এই সূত্রগ্রন্থ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেই রচিত হইয়াছিল। সূত্রকার ভক্তির ভাব সম্পূর্ণ ভাবে কীর্ত্তিত করিয়াছেন। সূত্রগুলি যদিও প্রাচীন সূত্রের আকারে রচিত তথাপি ইহা যে ১১শ খ্রীষ্ট শতকের পূর্ব্বের গ্রন্থ নয় তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার বিশ্বাস সূত্রকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি। প্রথম সূত্রেই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। "অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা"—কোন কোন সংস্করণে আছে—'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।'

ইহার টীকা হইতেছে, "অথেত্যধিকারার্থো নানন্তর্য্যার্থঃ। আনন্তর্য্যং হি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নস্য আনিন্দ্যযোন্যধিক্রতেব ক্ষ্যমাণত্বাৎ।"—ভক্তি লাভের জন্য প্রারম্ভে বেদপাঠ বা যোগাভ্যাস প্রভৃতির আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে—"ঈশ্বর ইতি প্রকৃতাভিপ্রায়ং। আরাধ্যবিষয়ক-রাগত্বমেব সা" আরাধ্য বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। ঈশ্বরে পরানুরক্তির নামই ভক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই দুই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর-বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই পরানুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরম প্রেম। "নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ"—ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বিকা চিত্তবৃত্তির নাম, ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন। বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ২০শ অধ্যায়ে ১৯, ২০ ও ২১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "হে ভগবান্, আমি যে কোনও প্রকার জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে, অবিবেকীদের বিষয়ে যেমন প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী প্রীতিই অবিচলিত হয়।"

এখানে যে প্রীতি পদের উল্লেখ আছে, ঐ প্রীতি-অর্থে বৈষ্ণবগণ "সুখনিরত রাগ" বুঝিয়া থাকেন। ভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব; সুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না।

ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় নূতন আকারে নিরক্ষর ও নির্ম্মমহৃদয় ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল এই সময় সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৈষ্ণব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান করিলেন। বৈষ্ণব এই সময় বৃন্দাবনের 'শ্রী' ভাল করিয়া উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদের নিকট তীর্থের সার এবং আশ্রমের

শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙ্গালার বাহিরে ইতঃপূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম নূতনশ্রেণীর স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালার সীমার মধ্যে এক বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিল।—বাঙ্গালা ভাষার উপাদান দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এই শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার মাটিতেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকথাকে কেন্দ্র করিয়া গৌরনিতাই প্রেম ও ভক্তির চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভক্তিতরঙ্গ ছুটিয়াছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্যনামে পূজা সেই সময় হইতে চলিতে লাগিল। উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র ও গুর্জর প্রদেশে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদার নাথ হইতে যে পথ গিয়াছে তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণভারত মাদ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ একক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির প্রচার দক্ষিণভারত হইতেই উত্তরভারতে প্রথমে হইয়াছিল। দক্ষিণভারতের পূর্ব্বে পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও ছিল না। এখানকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্ম্ম গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বৈষ্ণবধর্ম্মই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যানবস্তুগুলিকেও বেশ রসান দিয়া লইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় যেথানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণ মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণ মূর্ত্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারিলাটের উপরে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন ইহা সেই নারায়ণ মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও পুনর্বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ নারায়ণ মূর্ত্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবিম্ব।

("বনফুল")

জলহীন পাত্র ছিল—ছিলনাক' কিছু
　　জলভরা কিন্তু তাহা হ'ল যেইক্ষণে
আকাশের শশীলেখা অমনি সেথায়
　　হাসিয়া উঠিল যেন আপনার মনে!

হৃদয় নীরস ছিল মরুভূমি সম
　　প্রেমের মধুরধারা নামিল যেমনি
নিমেষে হৃদয় মাঝে শত সুষমায়
　　পরমেশমুখশশী ভাসিল অমনি!

ছুটী।

("বনফুল")

দুদিনের ছুটী যায় দুদিনে ফুরায়ে
কারো দ্রুত—কারো অতি ধীরে
শত বাধা শত দুখ দলিয়া হেলায়
যায় তাহা আসেনা ত' ফিরে।

জগতের স্বার্থদ্বন্দ্ব কামনার মাঝে
মানবের নাহি অবকাশ
পরলোকে কামনার বাসনার জ্বালা
সেখানেও আশা ও নিরাশ!

জগতের কাছে যবে মরণের কাছে
হৃদয়ের কাছে যবে ছুটী
পূর্ণ অবকাশ তবে মানবের কাছে
সব বাধা সব ভয় টুটি'।

জগত চাহে না যবে—আসেনা মরণ
মায়াহীন হৃদয় যখন
সেই ত' রে অবকাশ – মহামুক্তিময়
সুখময় শান্তিময় ক্ষণ!

ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমন কি কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে যাহাতে এই দুইটী নিয়মের ব্যভিচার হয় না? আমার মতে, হইতে পারে। আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, আমাদিগকে সামান্যীকরণবাদ (Principle of Generalisation) ও অভিব্যক্তিবাদ (Principle of Evolution) এই দুইটীর সহিত উহার সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে। আমাদিগকে এমন এক চরম সাধারণ-তত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে, যাহা শুদ্ধ যে নিখিল সামান্যীকরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকতম তত্ত্ব হইবে তাহা নহে, পরন্তু আর যাহা কিছু সমস্তই তাহা হইতে উদ্ভূত দেখাইতে হইবে—উহা তাহার সর্ব্বনিম্ন পরিণামের সহিত একপ্রকৃতিক হওয়া চাই। সর্ব্বোচ্চ, চরম, মূলকারণের সহিত সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী কার্য্যের কোন পার্থক্য থাকিবে না - তাহারা একই পদার্থের পরস্পরসম্বদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তের ব্রহ্মে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। কারণ, ব্রহ্মই চরম ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব—মানবমন আর ইহার উপরে উঠিতে পারে না। ইহা সর্ব্বগুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিরপেক্ষ সত্তা। আমরা দেখিয়াছি, সত্তাই মানবীয় সাধারণতত্ত্ব-কল্পনার চরম সীমা। 'চিৎ' শব্দে আমাদের লৌকিক জ্ঞানকে বুঝায় না—উহা তাহার সারস্বরূপ—যাহা মানবজাতি বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর নানাবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসমূহের সারকে লক্ষ্য করিয়াই 'চিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাই সেই জগদতীত চরম সত্য—উহাকে বিজ্ঞান বা সম্বিদ্ বলা যাইতে পারে। চিৎশব্দে উহাই বুঝাইতেছে এবং এইখানেই আমরা বিভিন্ন জাগতিক পদার্থসমূহের স্বরূপতঃ একত্ব

উপলব্ধি করি। আধুনিক বিজ্ঞান পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষাই দিতেছে বলিয়া মনে হয় যে, আমরা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে এক। আমরা শারীরিক ভাবে পৃথক্ একথা বলা ভুল। তর্কের খাতিরে যদিই বা আমরা জড়বাদী হই, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমুদয় জগৎ এক জড়সমুদ্র—তুমি আমি সেই সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত সদৃশ। প্রত্যেক আবর্ত্তে রাশি রাশি জড়পরমাণু প্রবেশ করিয়া আবর্ত্তের আকার ধারণ করিতেছে, আবার জড়পরমাণুরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। আজ আমার শরীরে যে জড়পরমাণু রহিয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হয়ত তাহা তোমাতে, সূর্য্যে, অথবা কোন উদ্ভিদ্‌শরীরে বিদ্যমান ছিল—এইরূপে তাহারা ক্রমাগত স্থানপরিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং তোমার শরীর আমার শরীর বলিয়া আর কি রহিল?—শরীর হিসাবে আমরা এক। চিন্তা সম্বন্ধেও এইরূপ। এক অনন্তবিস্তার চিন্তাসমুদ্র রহিয়াছে—তোমার মন, আমার মন উহার বিভিন্ন আবর্ত্ত সদৃশ। আপনারা কি এখনই দেখিতে পাইতেছেন না, কিরূপে আমার চিন্তা আপনাদের ভিতর এবং আপনাদের চিন্তা আমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে? আমাদের সকলের জীবন এক অখণ্ড বস্তুমাত্র—চিন্তাজগতেও আমরা এক। আরও ব্যাপকতর সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইলে দেখা যায় যে, জড় ও চিন্তার পশ্চাতে তাহাদের প্রাণবস্তুস্বরূপ সুপ্ত চৈতন্যসত্তা রহিয়াছে। এই একত্ব হইতেই সমুদয় বহুত্বের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা স্বরূপতঃ এক ছাড়া কখনও দুই হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বতোভাবে এক—শারীরিক হিসাবে এক, মানসিক হিসাবে এক এবং যদি আমরা চৈতন্য-সত্তায় আদৌ বিশ্বাস করি, তাহা হইলে চৈতন্য হিসাবেও যে আমরা এক তাহা বলাই বাহুল্য। এই একত্বরূপ একমাত্র সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান দিন দিন প্রমাণ করিতেছে। উহা গর্ব্বিত লোককে বলিতেছে, ঐ ক্ষুদ্র কীটটীও যাহা তুমিও তাহাই,—ভাবিও না যে, তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা কিছু—তোমরা উভয়েই এক। কোন এক পূর্ব্ব জন্মে তুমিই ঐ কীট ছিলে এবং তুমি যে মানবজীবনের গর্ব্ব

করিতেছ ঐ কীটই ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া সেই মানবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রের এই মহান্ সিদ্ধান্ত—সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব, যাহাতে আমাদিগকে সমুদয় সত্তার সহিত এক বলিয়া শিক্ষা দেয়—ইহাই আমাদের জীবনে বিশেষ শিক্ষা করিবার বিষয়। কারণ, আমরা অনেকেই উচ্চতর প্রাণিগণের সহিত এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে অতিশয় আনন্দ বোধ করি কিন্তু কেহই নিম্নতর প্রাণিগণের সহিত এক হইতে চাহে না। মানুষ এরূপ নির্ব্বোধ যে, যদি কাহারও পূর্ব্বপুরুষ পশুপ্রকৃতিক, দস্যু, এমন কি, পরস্বাপহারী ভূস্বামীও হয় অথচ সমাজে তাহাদের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদিগকে নিজ নিজ বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি দরিদ্র সচ্চরিত্র লোক হন তবে তাহারা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সুখের বিষয়, দিন দিন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে, দিন দিন সত্যের অধিকতর প্রকাশ হইতেছে এবং ইহাই ধর্ম্মের বিশেষ লাভ। আমি আজ আপনাদিগকে যে অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাও ঠিক এই শিক্ষা দিতেছে। আত্মাই সমুদয় জীবজগতের সারস্বরূপ; তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, শুধু তাহাই নহে, তত্ত্বমসি—তুমিই তিনি, তুমি ও জগৎ অভিন্ন। যে আপনাকে অপর হইতে এক চুলও পৃথক মনে করে সে তৎক্ষণাৎ দুঃখ ভোগ করে। যাঁহার এই একত্ব বোধ আছে—যিনি জগতের সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম চরম সামান্যীকরণ ও অভিব্যক্তিবাদ দ্বয়ের সহিত স্বীয় সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের সকল প্রকার দাবী পূরণ করিতে পারে। কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাইবে—এই তত্ত্বটী জগতের অন্যান্য দার্শনিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা বেদান্তেই অধিকতর পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের ঈশ্বর অর্থাৎ

ব্রহ্মের বাহিরে আর কিছু নাই—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সমস্তই যে তিনি। তিনি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—তিনি নিজেই এই জগৎব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি…"

তিনি এইখানে রহিয়াছেন। তাঁহাকেই আমরা দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি। তাঁহাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি, বিচরণ করিতেছি—তাঁহার সত্তাতেই আমরা সত্তাবান্। নিউটেষ্টামেণ্টে এই ভাবের কথা আছে। ঈশ্বর ওতপ্রোতভাবে জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—তিনিই নিখিল পদার্থের সার, প্রাণ, আত্মস্বরূপ। তিনি যেন এই জগতে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। তুমি আমি সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের ক্ষুদ্র কণিকা, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রবাহ, ক্ষুদ্র প্রকাশ এবং তাঁহারই ভিতর থাকিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। মানুষে মানুষে, দেবতায় মানুষে, মানুষে প্রাণীতে, প্রাণী ও উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তরে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই, কারণ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের প্রকাশ মাত্র—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার মধ্যে অল্প প্রকাশ, তোমার মধ্যে হয়ত বেশী প্রকাশ কিন্তু উভয়ের মধ্যে একই জিনিষ প্রকাশিত হইতেছে। তুমি ও আমি একই প্রবাহের বিভিন্ন বহির্নির্গমন দ্বারস্বরূপ, আর এই প্রবাহই ঈশ্বর। সুতরাং তুমিও স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তোমারও ইহা জন্মগত প্রাপ্ত অধিকার, আমারও তাহাই। তুমি হয়ত মহা পবিত্র দেবতা, আর আমি হয়ত অতি ঘৃণিত পিশাচ কিন্তু তথাপি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আমার জন্মগত প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং তোমারও তাহাই। তুমি আজ আপনাকে অধিক অভিব্যক্ত করিয়াছ; দুদিন অপেক্ষা কর, আমিও আপনাকে আরও অধিক অভিব্যক্ত করিব, কারণ, সবই যে আমার ভিতরে রহিয়াছে। দেখুন, জগতের এই বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় কার্য্য হইতে বাহিরে অবস্থিত করণান্তরের কল্পনা করা

হইতেছে না—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসমষ্টিকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তবে কি ঈশ্বর জড় ? না, কখনই নহে, কারণ, ঈশ্বরকে যখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অনুভব করি তখন তাঁহাকে জড় বলি ; যখন বুদ্ধির ভিতর দিয়া অনুভব করি তখন তাঁহাকে মন বলি এবং যখন তাঁহাকে আত্মার মধ্য দিয়া দর্শন করি তখন তিনি চেতন বলিয়া দৃষ্ট হন। তিনি জড় নহেন পরন্তু জড়ের মধ্যে যাহা সত্য তাহাই তিনি। এই চেয়ারখানির মধ্যে যাহা সত্য তাহাই তিনি, কারণ, দুইটী জিনিষ লইয়া চেয়ারখানি গঠিত হইয়াছে। প্রথম, বাহিরের কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, দ্বিতীয়, আমার মন ইহাতে আর কিছু অর্পণ করিয়াছে এবং এই দুইটী জিনিষ মিলিত হইয়া চেয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র যে সত্তা অনন্ত কাল ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার উপরেই ইন্দ্রিয়সমূহ চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ী, জগৎ, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। আচ্ছা, তবে আমরা সকলেই যে এই একই চেয়ারখানিকে দেখিতেছি, আমরা সকলেই যে সেই সচ্চিদানন্দ প্রভুর উপরে একইরূপ ছবি অঙ্কিত করিতেছি ইহার কারণ কি ? সকলেই যে একই চিত্র অঙ্কিত করিবে তাহার কোন কারণ নাই—তবে যাহারা একই প্রকার চিত্র অঙ্কিত করে তাহারা সকলে একই স্তরে অবস্থিত এবং সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ও পরস্পরের অঙ্কিত চিত্রসমূহকে দর্শন করিতেছে। তোমার ও আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে যাহারা ভগবানকে আমাদের মত দেখে না, তাই আমরা তাহাদিগকে বা তাহাদের অঙ্কিত চিত্রসমূহকে দেখিতে পাইতেছি না। আবার, আপনারা সকলেই জানেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমূহ দিন দিন ইহাই প্রমাণিত করিতেছে যে, যাহা সূক্ষ্ম তাহাই সত্য, যাহা স্থূল তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র। যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে যদি কোন ধর্ম্মমত আধুনিক যুক্তি বিচারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তবে তাহা একমাত্র অদ্বৈতবাদ। কারণ, ইহাতে যুক্তির পূর্ব্বোক্ত

নিয়মদ্বয়ের কোনরূপ ব্যভিচার নাই। ইহা নিখিল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান নামরূপাতীত সত্তারূপ চরম সামান্যীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সামান্যীকরণ সগুণ ঈশ্বরে পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা কখনই চরম সামান্যীকরণ হইতে পারে না, কারণ, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলেই বলিতে হয়, তিনি পরম কারুণিক ও পরম মঙ্গলময়। কিন্তু এই জগৎটা একটা মিশ্রিত ব্যাপার—ইহার কতকটা ভাল কতকটা মন্দ। আমরা মনের মতন বাদছাদ দিয়া অবশিষ্টাংশের মধ্যে ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়া তাহাকেই সগুণ ঈশ্বর বলি। তোমরা যেমন বল সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই বুঝায়, সেইরূপ তোমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই বুঝায় না; তুমি আরও দেখিবে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানের ধারণাও করিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা যথার্থ চরম সামান্যীকরণ নহে। আমাদিগকে ইহারও পারে—নির্গুণে যাইতে হইবে। সেখানে এই জগৎ তাহার সমস্ত সুখ দুঃখ লইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; কারণ, জগতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই সেই নির্গুণ হইতে আসিয়াছে। যাহাতে অশেষবিধ অশুভ বর্তমান তাহা আবার কিরূপ ঈশ্বর? ইহার অর্থ এই যে, ভাল মন্দ একই পদার্থের বিভিন্ন ভাব—বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। গোড়া হইতেই এই ভয়ানক ভুল ধারণাটী চলিয়া আসিতেছে যে, ভাল মন্দ দুইটী পৃথক বস্তু—আলো ও অন্ধকারের ন্যায় ভিন্ন, পরস্পর স্বাধীন—তাহারা চিরকালই পৃথক্ আছে ও থাকিবে। আমি এমন একটী লোক দেখিলে বিশেষ খুসী হইব যিনি আমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারেন যাহা চিরকালই ভাল অথবা চিরকালই মন্দ। তিনি সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া বলুন দেখি যে, আমাদের জীবনের অমুক ঘটনাগুলি কেবলই ভাল, এবং অমুক ঘটনাগুলি কেবলই মন্দ। আজ যাহা ভাল কাল তাহা মন্দ হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ কাল তাহা ভাল হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা ভাল তোমার পক্ষে তাহা

মন্দ হইতে পারে। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য সকল জিনিষের ন্যায় ভালমন্দেরও একটা ক্রমাভিব্যক্তি আছে। এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে আমরা তাহার অভিব্যক্তির কোন এক অবস্থায় ভাল এবং অন্য কোন এক অবস্থায় মন্দ বলি। একটী ঝড়ে আমার কোন বন্ধুর প্রাণনাশ হইল—আমি উহাকে মন্দ বলিলাম কিন্তু হয়ত উহা বায়ুমণ্ডলস্থ জীবাণু বিনাশ করিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণরক্ষার কারণ হইল। তাহাদের কাছে উহা ভাল—আমার কাছে উহা মন্দ। সুতরাং ভালমন্দ উভয়ই আপেক্ষিক—প্রাতিভাসিক জগতের ব্যাপার। আমরা যে নির্গুণ ঈশ্বরের কথা বলিলাম তাহা আপেক্ষিক ঈশ্বর নহে—সুতরাং ভাল কি মন্দ কিছুই বলা যায় না। ইহা প্রপঞ্চাতীত পদার্থ, কারণ, ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে। তবে ভাল জিনিষটা মন্দ অপেক্ষা ইহার নিকটতর অভিব্যক্তি।

(ক্রমশঃ)

"অনন্তং ব্রহ্ম"

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বিল এল)

উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত, এ সকল ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ। যাহা সত্য তাহাই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা, যাহা জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ছাড়া সবই অজ্ঞান, অবিদ্যা। যাহা অনন্ত তাহাই ব্রহ্ম—একমাত্র ব্রহ্মই অনন্ত, আর সব সান্ত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মের অনন্ত ভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনন্ত বা Infinite সম্বন্ধে ধারণা করা অতি দুরূহ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণা করাও যেমন দুরূহ, অনন্ত সম্বন্ধে ধারণা করাও সেইরূপ

কঠিন *। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে অনন্তের ধারণা করা যায় না; যাহার ধারণা হয় তাহা খুব বৃহৎ একটা বস্তু হইতে পারে কিন্তু তাহা অনন্ত নহে, তাহার একটা সীমা থাকিবেই। অনন্ত কাল এবং অনন্ত আকাশের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

অনন্ত নির্ব্বিকার—অনন্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, হইতে পারে না। অনন্ত হইতে যদি কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অনন্ত। কারণ, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা যদি সান্ত হয়, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট সান্ত এবং উদ্ধৃত সান্তের সমষ্টি সান্তই হইত, অনন্ত হইতে পারিত না। অনন্তের সহিত আরও কিয়ৎপরিমাণ পদার্থ যোগ করিলে যোগফল অনন্তই থাকে। অনন্তের অর্দ্ধেক অনন্ত। অনন্তের দ্বিগুণও অনন্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে যোগ, বিয়োগ, ভাগ, গুণ প্রভৃতি ব্যাপার অনন্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, অর্থাৎ অনন্ত নির্ব্বিকার। সেইরূপ ব্রহ্মও নির্ব্বিকার। ব্রহ্ম হইতে যদিও সমুদয় জীব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম যেরূপ ছিলেন, সৃষ্টির পরও ব্রহ্ম ঠিক সেইরূপ থাকেন, কোনও বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

ভগবানেরই এক অংশ জীবসমষ্টি হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাতে কিন্তু ভগবানের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ, তিনি অনন্ত। যিনি অনন্ত তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। কেবল পরিমিত অংশ গ্রহণ করিলেই যে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা

---

* বেদান্ত মতে কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করার অর্থ ঐ বস্তুর আকারে মনকে আকারিত করা। সান্ত মনকে অনন্ত ব্রহ্মের সমান আকার প্রাপ্ত করান যায় না। এ জন্য সান্ত মনকে ধ্বংশ না করিলে (যাহাকে বলা হইয়াছে "মনসোঽপ্যাপ্য নীভাবে") অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে না।

নহে, ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ (অনন্ত পরিমাণ) অংশ গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা উপনিষদে স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

সেই পূর্ণ (অনন্ত) ব্রহ্ম হইতে, পূর্ণ (অনন্ত) গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা দুর্ব্বোধ্য হইলেও গণিততত্ত্ব-বিদ্‌গণ জানেন যে অনন্ত হইতে অনন্তের বাদফল অনন্তই হইতে পারে (Infinity minus Infinity may be equal to Infinity.) অবতারবাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহা এই তত্ত্ব দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ বলা হয়, ব্রহ্ম যখন নিরংশ তখন তিনি অবতাররূপ গ্রহণ করিলে সমগ্র ব্রহ্মকেই অবতাররূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অবতারের বাহিরে ব্রহ্ম থাকিতে পারেন না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও ব্রহ্ম সমগ্র ভাবেই অবতীর্ণ হন তথাপি অবতারের শরীরের বাহিরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অনন্তরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"।

ইহা ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব নহে।

আমরা শুনিয়াছি যে ভগবান্ সকল পদার্থের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। যিনি অনন্ত তিনি কি করিয়া সান্ত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে বিরাজ করিবেন? কেমন করিয়া যে বিরাজ করেন তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যত ক্ষুদ্রই পদার্থ হউক তাহার মধ্যে যে "অনন্ত" বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। একটি বস্তুকে যদি আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে থাকি তাহা হইলে বস্তুটি যতই বেশী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবে অংশগুলির সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইবে; অবশেষে অংশগুলি যখন নিরতিশয় ক্ষুদ্র হইবে, তখন অংশগুলির সংখ্যা নিরতিশয় বৃহৎ (অর্থাৎ

Infinity) হইবে *। অতএব দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থের মধ্যেও অনন্ত নিহিত রহিয়াছে।

সান্ত পদার্থের মধ্যে যে অনন্ত নিহিত থাকে তাহা গণিতের একটি সহজ সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যায়। $\frac{১}{২}, \frac{১}{৪}, \frac{১}{৮}, \frac{১}{১৬}, \ldots$ এই ভাবে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইতেছে সে সংখ্যাগুলি যখন অসীম হইবে (Infinite Series) তখন তাহার যোগফল হইবে '১'। অতএব দেখা যাইতেছে যে, '১' এই সান্ত সংখ্যার মধ্যে অসীম ক্ষুদ্র সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সান্ত পদার্থের মধ্যেই অসীম বা অনন্ত নিহিত রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অসীম বা অনন্তই ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন পদার্থের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম বা অনন্তের স্বভাব অতি আশ্চর্য্য। সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ একান্ত বিভিন্ন। সচরাচর দৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের স্বভাব এরূপ যে, কোন পদার্থ হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলেই তাহার পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে কিয়দংশ (জীবসমষ্টি) এবং এমন কি পূর্ণ অংশ (অবতার) গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্বের ন্যায়ই তিনি অনন্ত ও নির্ব্বিকার থাকেন। উপনিষদ্ তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।

নিষ্কল অর্থাৎ নিরংশ, অখণ্ড। কিন্তু অখণ্ড হইয়াও তিনি নানা অংশে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

---

* নিরতিশয় ক্ষুদ্র অর্থাৎ Infinitely small অর্থাৎ Zero.

$$\frac{\text{A finite quantity}}{\text{Zero.}} = \text{Infinity.}$$

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিতেন যে, পদার্থকে ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে হয় যাহাকে atom বা পরমাণু বলে—যাহাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে এ কল্পনা যথার্থ নহে। অর্থাৎ atomকেও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যায়।

অবিভক্তমপি ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

অনন্ত হইয়াও তিনি ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মন সম্পূর্ণ ধারণা করিতে অক্ষম। অরূপ হইয়াও তিনি অনন্তরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, নিগুর্ণ হইয়াও তিনি অনন্ত কল্যাণগুণ-সংযুক্ত হইয়াছেন। তাই কবি গাহিয়াছেন, *

তুমি অরূপ সরূপ সগুণ নিগুর্ণ
দয়াল ভয়াল হরি হে।
আমি কিবা বুঝি আমি কিবা জানি
আমি কেন ভেবে মরি হে॥

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ২০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চতুরশীতিতম জন্মতিথিপূজা মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস ঠাকুরঘর ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্রপুষ্পমাল্যে এরূপ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে যিনি দেখিতেছিলেন তিনিই মুগ্ধ হইতেছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি সমুদয় অবতারগণের বিশেষ পূজা, স্তোত্রাদি পাঠ ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ ও কালী-কীর্ত্তন চলিয়াছিল। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতি হইবার পর ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালী পূজা আরম্ভ হয় ও শেষরাত্রে হোমান্তে পূজা সমাপ্ত হয়। অনন্তর শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথাবিধি হোম করিয়া মঠের ৭ জন যুবক ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও ১৮ জন যুবক পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন "নারায়ণ হরি" ধ্বনিতে মঠগগন মুখরিত করিতে ছিলেন তখন পূর্ব্বাকাশ নবারুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

* কবি রজনীকান্ত সেন।

পরবর্ত্তী রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মঠের দক্ষিণ-দিকস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র অতি মনোজ্ঞরূপে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল এবং আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায়, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কনসার্ট বাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কনসার্ট পার্টী, সুবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক সঙ্গীত সম্প্রদায় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনে মঠবাড়ী মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও মেসার্স হোরমিলার এবং কোং ষ্টীমারের সুবন্দোবস্ত করায় মঠে বহুসহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় দশ সহস্র লোক জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। এবারে স্ত্রী পুরুষের জন্য প্রসাদ বিতরণের পৃথক্ বন্দোবস্ত করায় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আহিরীটোলা নিবাসী যুবকবৃন্দ উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে সরবৎ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

উৎসব দিবসে মঠের সর্ব্বত্রই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যে মহাপুরুষের নামে এই বিপুল জনসংঘ সমবেত হইয়াছিল তাঁহার তিরোধানের এই স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শক্তির এইরূপ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব দর্শনে সকলেই যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু ভদ্রমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত, গোষ্ঠলীলা, কীর্ত্তন, ভজন ইত্যাদিতে সমস্ত দিনব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। একভাবে ভাবিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলকেই সমভাবে উৎসবে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব

সম্মিলন দেখিয়া সকলেরই প্রাণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় এমন একদিন আসিতে পারে যখন সকল প্রকার ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক উদার সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিবে।

প্রায় চারি পাঁচ শত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুই তিন সহস্র সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনও উক্ত দিবস অপরাহ্নে হইয়াছিল। ঢাকা ডিভিসনের কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত মহোদয় উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুত নীরদরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে মিশনের স্থানীয় সেবকবৃন্দ কর্তৃক কালীকীর্ত্তন গীত হয় ও পরে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, কনখল, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, রাঁচি, শিতাবলদ, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা বেলুড়স্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯১৮ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা নবাগত ও পুনরাগত রোগী সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৪৪৩ জন; তন্মধ্যে ৩৪৬০ জন নূতন রোগী। ইহাদের মধ্যে বেলুড় হইতে ১৪৭৯ জন, বালি ও বারাকপুর—৮৯৮, ঘুস্নুরি—৭৬৯, লিলুয়া—১৫২, শালিখা—৩৫, হাবড়া—১৯, শ্রীরামপুর—৩৪, উত্তরপাড়া—৫৩ এবং অন্যান্য স্থান হইতে ২১ জন আসিয়াছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা এ বৎসর রোগীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকেরা এখানে যেরূপ আগ্রহের সহিত চিকিৎসার্থ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, উক্ত ঔষধালয়ের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে ঔষধালয়ের মোট আয় ৩২২৷৵০ টাকা ও মোট ব্যয় ৬২৷১০ টাকা।

বালি মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগণ গত বৎসর ঔষধালয়ে ১২০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড সন্স সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ঔষধের অধিকাংশ বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা এই ঔষধালয়ে ঔষধ, ডাক্তারী যন্ত্র প্রভৃতি নানারূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন এবং যে সকল ডাক্তারগণ অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া চিকিৎসাদি বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিয়াছেন মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ঔষধালয়ের আয় অতি সামান্য। অথচ দিন দিন রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আয় অধিক না হইলে উহার কার্য্য সুচারুরূপে চলা অসম্ভব। দরিদ্র নারায়ণগণের সেবারূপ এই মহদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(মানভূম)

আমরা গতবারে মানভূম জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। সম্প্রতি আমাদের জনৈক সেবক উক্ত-স্থান পরিদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। উহা পাঠ করিলে তাঁহারা উহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—

"আজ গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। পাঁচখানা গ্রাম দেখিলাম তন্মধ্যে দুইখানা সাঁওতাল পল্লী। না খাইতে পাইয়া

সকলেই কঙ্কালসার হইয়াছে। মানুষ কত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে তাহা যদি স্বচক্ষে দেখিতে হয় তবে এ দেশে একবার আসা উচিত। গৃহে ধান নাই, চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। সুতরাং অন্ন ও জল, যে দুইটী প্রাণধারণের প্রধান সম্বল, তাহারই অভাব। তবে এরা খায় কি? খায় কুল আর তুষ ভেজে একরকম হালুয়ার মত করে। দেখিলাম তাহাই পাতায় করিয়া বালকগণ খাইতেছে। যুবক যুবতীরা কেহ বাড়ীতে নাই, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে কাজে গিয়াছে। গ্রামে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর নাবালক ছেলেমেয়েগুলি। সকল গ্রামেই একই প্রকারের দৃশ্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই দুচারটা কুল গাছ আছে। শুনিলাম এবার কুলও খুবই হইয়াছিল, এখন কিন্তু তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই প্রত্যেক গ্রামে লোকের মুখে ঐ এক কথাই শুনিলাম—"এই দুইমাস কুল খাইয়া কাটাইলাম এখন কি খাইব?" সত্যই বটে আমিও ভাবিয়া পাইলাম না যে, কুল ফুরাইলে ইহারা খাইবে কি?

বৃষ্টির একান্ত অভাবে ধানগাছ বাঁচাইবার জন্য পুষ্করিণীর জল ছেঁচিয়া প্রায় জলশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কাজে কাজেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কিরূপ ভীষণ জলকষ্ট হইবে তাহা কল্পনাতীত।

এদেশে সকলকে বিনাপরিশ্রমে খাদ্যাদি না দিয়া যাহারা কাজের উপযুক্ত তাহাদের দ্বারা পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খনন করাইয়া লইয়া চাউল সাহায্য করিলে উভয় পক্ষেরই লাভ। অভাবগ্রস্ত লোক কাজ করিয়া মজুরী পাইবে এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাবও দূর হইবে।

যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে তাহাদের কাজ মিলুক আর না মিলুক লোকেরা সুধু বলিয়া দেয়, "খেটে খাওগে" কিন্তু তাহারা যে কোথায় যাইয়া কি কাজ করিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। পুষ্করিণী খননাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে খরচ অনেক বেশী পড়িলেও ভবিষ্যতে গ্রামে জলের অভাব হইবে না, এ বিষয়ে কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে।

শীতের অবসান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শীতেও ইহাদের বস্ত্র ছিল না এখনও নাই। বড় মেয়েরা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে, ছোট ছেলে মেয়ে এবং পুরুষেরা কৌপীনধারী হইয়াছে, ইহারও অভাব হইলে মানভূমের বন ভিন্ন লোকালয়ে থাকা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

আমি যাহা দেখিতে আসিয়াছিলাম অর্থাৎ কত কষ্ট ও অভাব সহ্য করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা দেখা হইয়াছে। যাহা দেখিয়াছি ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

বাঁকুড়া জিলার ইন্দপুর থানার কয়েকখানা গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলাম—বাউরি, ভূমিজ এবং অন্যান্য নিম্ন জাতের মধ্যেই ভয়ানক কষ্ট দেখিলাম, তাহা ছাড়া শুঁড়ি, তাম্‌লি, তেলি প্রভৃতি জাতের মধ্যেও অন্নাভাব আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দপুরে যেমন দেখিলাম মানভূমেও সেইরূপ—পার্থক্যের মধ্যে সেখানে সরকার বাহাদুর প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে সে বিষয়ে কোন কথাই শুনিলাম না। মিশনের বাগ্‌দা কেন্দ্র হইতে মাত্র ১৮ খানা গ্রামে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। নিত্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কঙ্কালসার দেহবিশিষ্ট মানুষ "দে কিছু" "দে কিছু" বলিয়া উপস্থিত হইতেছে আর সেবকগণ অক্ষমতা জানাইয়া যাইতে বলিলে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। * * * *"

আমরা আশা করি, উল্লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া সহৃদয় দেশবাসিগণ কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ইহার আশু প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহাদের উপরেই এই কার্য্য সম্পাদনের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত যিনি যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক—অর্থ বা বস্ত্র হউক—তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :—

(১) প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণমিশন, মঠ, বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয়।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ)

মনুষ্যজীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু নিদ্রাবস্থায় গত হয়—বাল্য ও বার্দ্ধক্য অজ্ঞতা এবং জরাব্যাধিতে আচ্ছন্ন থাকে—ভোগলালসায় যৌবন ক্ষয় হইয়া যায়। এই অবস্থাগুলির সমষ্টিনাম "মানবজীবন।" সিদ্ধ বৈষ্ণব কবি তাই বলিয়াছেন ঃ—

আধ জনম হাম নিঁদে গোঁয়ায়নু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতনু,
তোঁহে ভজব কোন বেলা॥

অর্থাৎ জীবনের অর্দ্ধকাল নিদ্রায় গত হইল—বার্দ্ধক্য ও শিশুকাল জরা ও অজ্ঞতায় কাটিয়া গেল যৌবন ভোগলালসায় অতিবাহিত হইল। হে প্রভো! তোমাকে ভজন করিবার অবসর কোথায়?

বস্তুতঃ, মানবজীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় সাধারণ মানবজীবনই এইরূপ গতিশীল। কদাচিৎ কোন সাবহিত মহামনস্বীর জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় মাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়াই মানবজীবন বহিয়া যাইতেছে। এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানবজীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাহাকে আমরা জাগ্রৎ অবস্থা বলি, তাহাতেও আবার বহু অজ্ঞতার আবর্ত্তই দৃষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাদ, আলস্য, জাড্য, সংশয়,

বিকল্প ও বিপরীত-ভাবনা জাগ্রৎ ভূমির নিত্য সহচর। এগুলি যেন জাগ্রৎ সাগরের নিত্য ঘূর্ণীপাকস্বরূপ। এই জাগ্রৎ অবস্থাই (Conscious state) স্থূল ভোগভূমি—ব্যবহারিক "আমি-আমার-রাজ্য"। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ এই অবস্থায় পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও আয়ত্তে অবস্থান করে। যাহাকে শাস্ত্রে স্বপ্নাবস্থা বলে, তাহা ত প্রায় অজ্ঞতারই অনুরূপ। এই স্বপ্নাবস্থা (Semi-conscious state) খানিক জাগ্রৎ—খানিক সুষুপ্তির ছায়াময় ভূমিতে অবস্থিত। যেন জাগ্রৎরূপ দিবা ও সুষুপ্তিরূপ রাত্রির সন্ধিস্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের সন্ধিক্ষণ সূচনা করে। নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থা (Unconscious state) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই অবস্থাত্রয়ভূমিতে প্রবাহিত মানবজীবন প্রায় যেন অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য দিয়াই গতাগতি করিতেছে।

জাগ্রৎভূমে অবস্থান কালে আমরা জড়জগতের কতকগুলি রহস্য ভেদ করিয়া আপনাদিগকে ইদানীং কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। কতকগুলি কলকৌশল, কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য, কতকগুলি নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দেহের, দেশের, সংঘের ও সমাজের কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলা বিধান করিয়া মানবজীবন সুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সকল জাগ্রদাবিষ্করণে সাময়িক কথঞ্চিৎ সুখসুবিধা লাভ হইলেও ইহা জীবকে শাশ্বত সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি তর্কে ইহা বুঝাইতে হয় না। প্রতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করে। বহির্জগৎ—যাহা রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর কিছুই নহে—তাহার পশ্চাতেই মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। অন্তর্জগতের কোন সন্ধান না পাইয়া "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" পথে চিরকাল গতাগতি করিতেছে।

চিন্তাশীল আর্য্যঋষিগণ অন্তর্জগৎরহস্য ভেদ করিতে বহির্জগৎ যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন মানবজীবনের রহস্য ভেদ কল্পে প্রাচীন ঋষিগণ "আবৃত্তচক্ষুঃ"

হইয়াই যেন অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তরের নিয়মগুলি অন্তশ্চক্ষু না হইলে দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য অধুনাআবিষ্কৃত বাহ্য বিজ্ঞান রহস্য—যাহার বিশ্লেষণে ভূতপঞ্চক যেন ক্রীড়াপুত্তলিবৎ ঐহিক জীবনের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে—সেইগুলি আর্য্যঋষিগণ দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। তাঁহারা এই জীবনরহস্যভেদেই জীবনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যেমন একখণ্ড মৃদ্-জ্ঞানে সমগ্র মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মে, তেমনি একটী মানবজীবন বিশ্লেষণে, সমগ্র মানবজীবনরহস্য ভেদ হইয়া যায়। অন্তর্মুখে অবস্থিত আর্য্যঋষিগণ এই জন্য মানবজীবনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। ভারতের বিচার প্রণালী অন্তর্মুখ—আধুনিক জগতের বহির্মুখ। স্বামিজী একদিন লেখককে বলিয়াছিলেন, "তোরা যাকে কালী কালী ব'লে উপাসনা করিস্—ওদেশে দেখে এলুম, সেই কালীই কামানের মুখে গোলা লইয়া বসে রয়েছেন্।"

আমাদের শরীরটা যেমন নিকটে, আর কোন বস্তুই তেমন নয়। এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয়, মন, ও চৈতন্য বিরাজ করিতেছে। শরীরের চেয়ে সেগুলি আরো কাছে বা অন্তরে। সকলের চেয়ে কাছে বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্য—যাহা জীবের যথার্থ স্বরূপ। কাজেই সেই চৈতন্য সত্তার অন্বেষণে অন্তর্মুখী হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। তাই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—"আবৃত্তচক্ষুর-মৃতত্বমিচ্ছন্"। আবৃত্তচক্ষুর মানে হচ্ছে মনকে রূপরসাদি থেকে তুলে অন্তর্মুখ করা অর্থাৎ বহির্জগতের বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মতত্ত্বাভিমুখ করা। রূপরসাদির প্রলোভন ত্যাগ না হইলে—মনের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের ত্যাগ না হইলে—"আবৃত্তচক্ষুঃ" হওয়া যায় না। সুতরাং জীবতত্ব বা আত্মতত্ব অবগত হওয়া যায় না।

আত্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট মানবজীবনের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, জগতের মূল কারণ বা ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধেও এই অবস্থা-

ত্রয় ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা এই অবস্থা-ত্রয়াতীত এক তুরীয় বা অতিজাগ্রদ্ ভূমির (Super-conscious state) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বয়ং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁকার-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলি এই ওঁকার; এই ওঁকারই আবার ত্রিকালাতীত ও সর্ব্বজ্ঞ"। "ইহা চতুষ্পাৎ—ওঁকারের অকার জাগরিত স্থান—বহিঃপ্রজ্ঞ—বিশ্ব; উকার স্বপ্ন-স্থান—অন্তঃপ্রজ্ঞ—তৈজস্। মকার সুষুপ্তিস্থান—প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময়—প্রাজ্ঞ। তদতীত তুরীয় স্থান শান্ত—শিব—অদ্বৈত। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সহজে ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্য লইতেছি।
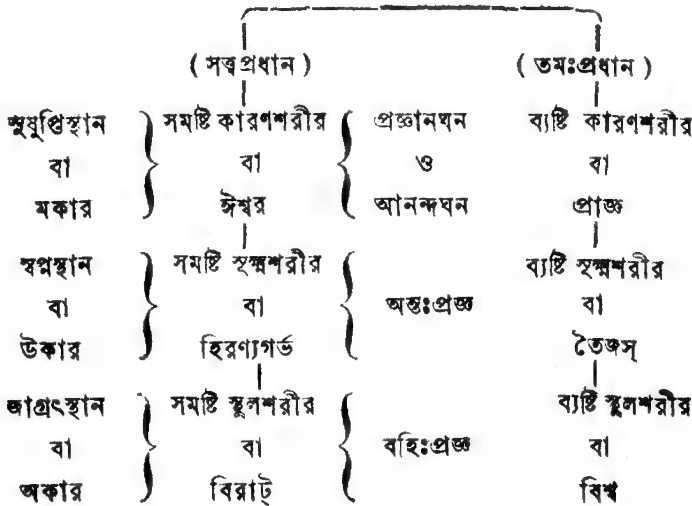
চিত্রের সমষ্টির দিক্ দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় ব্রহ্মই প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টি কারণশরীর বা ঈশ্বরতত্বে পরিণত হইয়াছেন। ইহা সুষুপ্তিস্থান হইলেও সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া জীব-সুষুপ্তির ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, পরন্তু প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। সত্ত্বপ্রধান ঈশ্বর মায়াধীশ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিয়ন্তা। এই ঈশ্বরতত্ত্বই বেদে লয়স্থান ও "অধ্যাত্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই সমষ্টিকারণতত্ত্বই রজোগুণপ্রাধান্যে যেন স্থূক্ষ্মশরীরী হিরণ্যগর্ভ রূপে পরিণত হইয়াছেন; হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ, ভাবী প্রকটিত জগৎ যাঁহার গর্ভে অবস্থান করে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি স্থূক্ষ্মশরীরাভিমানী দেবতাকে স্বপ্নস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, সূক্ষ্মভাবে যেন সকলি ভোগ করেন। অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থে অন্তরেই সংকল্পসম্পন্ন—বহিরালম্বনশূন্য। এই হিরণ্যগর্ভই গুণবিপাকে সমষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী বিরাট্ বা বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন। স্থূলজগৎ ভোগ্যরূপে অবস্থান করাতে ইনি বহির্বিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন—তাই বহিঃপ্রজ্ঞ।

ব্যষ্টি বা জীবপক্ষে (দক্ষিণের চিত্র দেখুন) বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীব তমঃপ্রধান বলিয়া তাহার সুষুপ্তিভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি কারণশরীর ঈশ্বরের ন্যায় প্রবুদ্ধ নহে। অতিজাগ্রৎভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাতে প্রায় তন্ময় হইয়াও জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বেদ তাই বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই ঘোর সুষুপ্তিতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না। এই সুষুপ্তি অবস্থাই জীবের কারণশরীর। শাস্ত্রে ইনি 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। রজস্তমঃপ্রধান প্রাজ্ঞই সূক্ষ্ম বা মনোময় শরীরে প্রকটিত হইয়া সংকল্পবান্ হন—তখন ইঁহাকে 'তৈজস্' নামে অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্ আবার অধিকতর তমঃপ্রধান হইয়া স্থূলশরীর ধারণ করিয়া থাকে ও স্থূলশরীরাভিমানী জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে 'বিশ্ব' বলা হয়। এই ত্রিবিধাকারে

অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক আত্মাই এই তিন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। গৌড়পাদীয় কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বোহ্যন্তঃপ্রজ্ঞশ্চ তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্থিতঃ॥"

জীব ও ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ ভূমিতে অবরোহণ ও আরোহণ চিন্তা করিয়াই গুণত্রয়বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ঈশ্বরেরও ত্রিমূর্ত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ কালত্রয় বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকের ত্রিত্ব কথিত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকরূপ ত্রিলিঙ্গ বিভাগ,--ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ ত্রিধা নাড়ীচিন্তা—নাভি, হৃদয়, ও মস্তকরূপ ত্রিধা ধ্যানস্থান নির্দ্দেশ,—জন্ম, প্রেতত্ব ও মৃত্যুরূপ অবস্থার ত্রিধা ভেদ নির্ণয় এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রতিবিম্ব কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

জীব বলিতে শাস্ত্রমতে উপাধিভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন তখন সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে তাঁহার বিরাট্ ও জীব (বিশ্ব) সংজ্ঞা হয়। উপাধির অপগমে উভয়েই এক অখণ্ড সত্তায় বা তুরীয় ভূমিতে এক হইয়া যায়। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব এক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। সুষুপ্তি কালে জীব ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেও মধ্যে অজ্ঞানের পর্দ্দা ব্যবধান থাকে, যাহা জীবাত্মার দৃশ্যরূপে প্রকাশ পায়। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন হইলেই জীবাত্মা শিবত্বে বা তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়া যায়। সুতরাং জীব ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়।

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নভূমে গমন করে, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ঘুমাইয়া পড়ে অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হয়—কিন্তু প্রাণ, মন, বুদ্ধি সবৃত্তিক থাকে। এই অবস্থায় জীব বাসনাময় শরীরে

অবস্থান করে ও জাগ্রৎকালীন ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত বাসনা বশে মনোময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া বিচরণ করে। মন যেন তখন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করে। ইহা ভাবী জাগ্রৎ ভূমির সূক্ষ্ম বীজস্বরূপ। এই মনোময় বাসনাকৃত শক্তি হইতে স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ বিজৃম্ভিত হয়। স্থূলদেহনিষ্ক্রান্ত মৃত জীবও এই সূক্ষ্ম শরীরেই স্বর্গ নরকাদিরূপ স্বপ্ন ভোগ করে এবং তৎপর স্থূল দেহ লাভ করিয়া জাগ্রৎভূমে আগমন করে। যেমন নিদ্রা হইতে স্বপ্নভূমি, স্বপ্নভূমি হইতে জাগ্রৎভূমিতে জীবের আগতি হয়, তেমনি সূক্ষ্ম বাসনাসম্পন্ন মৃত্যুরূপ স্বপ্নভূমি হইতে জীব জনন-প্রণালী নিয়মে জাগ্রৎরূপ স্থূলভোগ্য জগতে জন্মলাভ করে। স্বপ্নময় দেহই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম দেহ।

স্বপ্নভূমি হইতে জীব যখন সুষুপ্তিতে গমন করে তখন মন ও বুদ্ধির বৃত্তি (স্পন্দন) নিবৃত্ত হইয়া যায়; তখন জীবাত্মা একমাত্র অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে স্থির হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার 'কারণদেহ'। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া নিজের যথার্থস্বরূপ বা মহা-কারণ ব্রহ্মকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। বোধ হয় শাস্ত্রে এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরত্রয়কেই 'ত্রিপুরাসুর' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ত্রিপুরাসুর জয় করিলেই জীবের শিবত্বে অবস্থান ঘটে। এই জন্যই কি শিব বা তুরীয়ভূমি ত্রিপুরনাশন বলিয়া কথিত হইয়াছেন? সে যাহা হউক, মোট কথা এই যে, এই তিন অবস্থা বা ত্রিতয় দেহের অধ্যাস নিরাকৃত না হইলে জীব আপনার পরমার্থস্বরূপ (তুরীয় পদ) অবগত হইতে পারে না। তুরীয়ই জীবের যথার্থস্বরূপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভূমিত্রয়ের মধ্য দিয়া গতাগতি বশতঃ জীব যেন আপন স্বরূপ একবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের উপাধি লইয়া জীব দৈন্যদুঃখ-জন্মমৃত্যুরূপ অজস্র স্পন্দনে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন।

সুষুপ্তিকালে মরণমূর্চ্ছার ন্যায় জীব হৃদয়স্থিত "পুরীতৎ" নাড়ীতে গমন করে। জাগ্রতের অভিব্যক্তি স্থান যেমন চক্ষু, স্বপ্নের অভি-

ব্যক্তি স্থান যেমন কণ্ঠ, সুষুপ্তির স্থান তেমনি হৃদয় ও তৎস্থানস্থিত পুরীতৎ নাম্নী নাড়ী। এই সুষুপ্তিভূমি পরানন্দ তুরীয় ভূমির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জীব মনবুদ্ধির বৃত্তিশূন্যতা বশতঃ আপেক্ষিক জগতের সুখদুঃখ কিছুই জনিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে এই সুষুপ্তি অবস্থাকে 'আনন্দময় শরীর' বলা হয়। জীব নিদ্রোত্থিত হইয়া বলে "বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোন কিছুই জানিতে পারি নাই"। এই আনন্দ ও অজ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমানতা প্রতিজীবই প্রত্যহ অনুভব করে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপার্শ্বচর ছায়ারূপী অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই জন্যই কি শাস্ত্রে বলা হয় "অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হইতেছে" ?

অবস্থাত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উপাধিমণ্ডিত জীব প্রত্যহ এই অবস্থাত্রয় মধ্যে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রৎকালে স্বপ্নদর্শন অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। আবার অতিজাগ্রৎভূমে অধিরোহণ করিলে এই গৌরবান্বিত জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, অতিজাগ্রদবস্থার তুলনায় জাগ্রদবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সেইজন্য সর্ব্বোচ্চ স্তর তুরীয় ভূমি হইতে দৃষ্টি করিলে জীবজগৎ ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "জগন্মিথ্যা"। অথবা গীতায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

যাহারা জ্ঞানের চরম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহাদের চক্ষে ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য স্থূল জগতের রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে। আর বলে, "আহা! আমার ভোগের জন্য ঈশ্বর কি সুন্দর সৃষ্টিই প্রকটন করিয়াছেন!"

মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও অবরোহণ জানিতে ও

বুঝিতে হইলে মনের স্বরূপ কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। শাস্ত্র বলে, অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের মিলিত সত্বাংশে "অন্তঃকরণের" সৃষ্টি হয়। ইহাও জড় ভূতসমষ্টি মাত্র। বৃত্তিভেদে এই অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপে কথিত হয়। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও ধারণা ইহাদের ক্রমিক বৃত্তি। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু ইহাদের অনুগ্রাহক (চালক) দেবতা বলিয়া উক্ত হন। স্থূল জগতের রূপরসাভিঘাত ইন্দ্রিয়গোলকে পতিত হয়, তথা হইতে স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে অবস্থিত ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। সেই স্পন্দন আবার সূক্ষ্ম বিকল্পবৃত্তিক মনে আঘাত করে; মন আবার তাহা স্থিরসঙ্কল্প বুদ্ধিতে (determinative faculty) অর্পণ করে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলি জড়; তাহারা কেবল স্পন্দন-চালনের যন্ত্রবিশেষ মাত্র। বুদ্ধি সে স্পন্দন জীবাত্মার নিকট উপস্থিত করা মাত্র স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গতি ক্রমে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়কেন্দ্র, ইন্দ্রিয় গোলকাদি পথে বাহ্যবস্তুর স্বরূপে গমন করিয়া জীবাত্মার বস্তবোধ জন্মায়। যাঁহারা তারের খবরের রহস্য জানেন তাঁহারা বিষয়টা সহজে বুঝিতে পারিবেন।

সংবাদ প্রেরক যন্ত্রটী যেন ইন্দ্রিয়গোলক, তড়িৎবাহক তার যেন স্নায়ুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি সেই সংবাদ-গ্রাহক, আর যাহার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে তিনিই জীবাত্মা স্থানীয়,— তিনি সংবাদ পড়িয়া তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। অভিমানাত্মক জীবাত্মার বহির্জগতের জ্ঞান হইবামাত্র ভোগের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একটা স্থির হয়। ভোগের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়; ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হইয়া ক্রিয়াশক্তির সূচনা করে। সুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা ও অবশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। এখন দেখা যাক্, এই মন পূর্ব্বকথিত জাগ্রদাদি ভূমিত্রয়ে কিরূপে অবস্থান করে। তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই পারে না; কারণ, তন্নিম্ন প্রাজ্ঞভূমিতেই মন বৃত্তিশূন্য বা নিস্পন্দ, তদূর্দ্ধ ভূমিতে

যাইবার শক্তি নাই। এই জন্যই চতুর্থ ভূমির বর্ণনায় বলা হয়—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত ভূমিতে মন বৃত্তিশূন্য হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপতা প্রমাণিত হয়; এই জন্য মনের বুদ্ধিস্বরূপত্ব বা জ্ঞানস্বরূপত্বই (যাহা হইতে অহমিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়) সুষুপ্ত বা প্রাজ্ঞ ভূমির উপাধি। স্বপ্ন ভূমিতে সেই মনই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন আর জাগ্রৎ ভূমে সেই মনই ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া উপাধি লইয়া মন ক্রমে সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান করে—ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি বলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

মন বৃত্তিশূন্য বা স্থির হইলেই (একাগ্র হইলেই) তাহা আত্মার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই বুদ্ধি—যাহা অবিবেকিগণের দৃষ্টিতে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। "চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি-শ্চেতনেব বিভাতি সা" বলিয়া পঞ্চদশীকারও উল্লেখ করিয়াছেন। সুষুপ্তি ভূমিতে এই মন বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপে অবস্থান করিলেও অহমিকা বৃত্তির উচ্ছেদ হয় না। সমষ্টি পক্ষে সত্বপ্রবল অহমিকাবৃত্তিই সৃষ্টির আদি কারণ। ব্যষ্টি পক্ষে এই অহমিকা বৃত্তিমান্ জীবাত্মা অজ্ঞানের সাক্ষী হইয়া দ্বৈতমুখেই অবস্থান করে, গাঢ় সুষুপ্তিতে জীবাত্মার ধ্বংশ হয় না। কারণ, ব্যুত্থানকালে এই প্রসুপ্ত জীবকে বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পথে ফিরিয়া পূর্ব্বসংস্কার বশে সংসারভোগ করিতে দেখা যায়। এই জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহংজ্ঞানে উপলক্ষিত জীবাত্মা তাহার আভিমানিক সত্বা সুষুপ্তি বা মৃত্যুকালেও ত্যাগ করে না। সুষুপ্তি বা মৃত্যুর পর স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া জাগ্রদ্ভূমিতে আগমন করে। এই যুক্তিতে জন্মান্তরবাদও সমর্থিত হয়।

ইদানীং অতিজাগ্রৎ বা তুরীয়ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞজীব বা পরমাত্মা ঐ অবস্থায় কেবল অহংপ্রত্যয়গম্য "আমিত্ব" জ্ঞানে ভাসমান থাকেন, তখন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন অজ্ঞানমাত্র দ্বৈতদৃষ্টির কারণরূপে অবস্থান করে। সমষ্টিপক্ষেও

সত্ত্বপ্রবল মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। ঈশ্বরের মায়াউপাধি ও জীবের অজ্ঞান-উপাধি বিলয় হইয়া গেলে উভয়ই চিরন্তন চৈতন্য সত্তায় এক হইয়া যায়। জীবের এই অজ্ঞান দূর করিতে শাস্ত্র নানা সাধনার উপদেশ করেন। জ্ঞান পথের উপদেশ এই যে তুমি সদাসর্ব্বদা তোমার নির্ব্বিকার তুরীয় স্বরূপের চিন্তা কর। তোমার জীবত্ব তুরীয় স্বরূপেরই প্রতিবিম্বমাত্র। "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে এই তত্ত্বই অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। অহংপ্রত্যয়গম্য জীবাত্মা তুরীয় ব্রহ্মই বটেন কিন্তু মায়ায় আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি জীবকে ব্রহ্ম হইতে যেন বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। সদাসর্ব্বদা "অহংব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত করিতে পারিলে এই জীবাভাসরূপ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ভক্তি পথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সাধন সহায়ে অনিত্য বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়া জীব যখন ইষ্টে তন্ময় হইয়া আসে জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়া পড়ে। তখন "জ্যোতি-র্জ্যোতিষি সংযুতঃ" হইয়া জীব একত্বের চরমভূমিতে আরোহণ করে। যোগীও ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধ চক্রে আরোহণ জনিত উপাধিবিগত হইয়া সহস্রাররূপী তুরীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাভ করে। নিষ্কামকর্ম্মীও পরার্থে কর্ম্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ক্রমশঃ বর্জ্জন করে। সমস্ত উপাধিবিগমে যে তাহার অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে তাহা বিচিত্র কি? এই জন্য যে কোন পথে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবের শাশ্বত শান্তিভূমি তুরীয়পদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটে। কোন পথই এই জন্য হেয় হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে এই অতিজাগ্রদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ করিয়া তাহার খবর দিতে পারে কি না? শাস্ত্রাদি কি সে অবস্থার আভাস, না সম্পূর্ণ সত্য উক্তি? উপাধি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবার "আমি আমার রাজ্যে" আগমন করিবে? শঙ্করপ্রমুখ আত্মজ্ঞপুরুষগণ কেনই বা শাস্ত্রাদিকে

"অবিদ্যাবিষয়বৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ? এই সকল সন্দেহনিরাকরণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের অসাধারণ অনুভূতিই এই সংশয় অপনোদনে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। চরমানুভূতিদ্যোতক শ্রুতিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হইবার অযোগ্য। সাধারণ জীব চরমজ্ঞান ভূমি হইতে ফিরিবার শক্তি রাখেন না। 'নুনের পুতুলের' মত সমুদ্র জলে লীন হইয়া যান। কিন্তু পরমার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ ও দেবমানব মহাপুরুষগণ এই অতীত জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবহিতকল্পে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের বাক্যই বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "অবিদ্যাবিষয়বৎ" হইলেও জ্ঞানাতীত ভূমির আভাস তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে।

আর যাঁহারা সেই জ্ঞানাতীত ভূমির অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া জীবনধারণ করেন তাঁহারা যে বেদ-বেদান্ত কথিত তত্ত্বজ্ঞান হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্বলন্তজাগ্রৎ বিগ্রহ একথা সহজেই বোধগম্য হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্যাদি অমানব মহাপুরুষগণ এইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত ও পূজিত হন। পুনরাবর্ত্তন সংসারের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। ইদানীন্তন জগতেও এইরূপ এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল—যিনি সর্ব্বদা জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থান করিয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিবলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের নির্ম্মলাকাশে নবোদিত ভাস্করতুল্য তাঁহার উজ্জ্বল কিরণে দিক্ দেশ আলোকিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে ত পাঠক তাঁহার অমলধবল মূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া জন্মজরামৃত্যুসংকুল অবস্থাত্রয় অতিক্রম করতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা কর। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে সেই জ্ঞানাতীত ভূমি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে প্রদর্শন করাইয়া সংসারের ঘোর অন্ধকারে তুঙ্গ আলোকস্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী ও তাহাদের উৎপত্তি।

শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাংগ্রা যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে গোরক্ষপুর সীমান্ত লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত নেপালরাজের মনোমালিন্য হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহা যুদ্ধে পরিণত হয়। ইংরাজ সৈন্যের চারিটি বাহিনী চারিদিক হইতে নেপাল রাজ্য আক্রমণ করে। তন্মধ্যে General Ochterlony লুধিয়ানা হইতে এবং General Gillespie মিরাট হইতে। শিরমুরে অক্টারলোনী-বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার পথে অমরসিংহের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় জেনারল গিলেস্পির বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,এবং তিনি স্বয়ং ধরাশায়ী হন। এই সংবাদ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া পার্ব্বত্যরাজগণের সহায়তা বাঞ্ছা করিতে পরামর্শ দেন এবং তাঁহাদিগকে সসৈন্যে মিলিত হইতে অনুজ্ঞা* প্রদান করেন এবং আশ্বাস দেন যে, যদি তাঁহারা বিশ্বস্ততার সহিত ইংরাজের সহায়তা করিতে সম্মত হন তাহা হইলে যুদ্ধ শেষে তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং যে কোন ভবিষ্য শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রস্থানীয় হইবেন। দুই বৎসর লোমহর্ষণকারী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খ্রীঃ সেগৌলীর সন্ধিসূত্রে শান্তি স্থাপিত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কতক কতক স্থান আপনাদের ব্যবহারার্থে রাখিয়া সকলকেই সনন্দ দ্বারা স্বীয় স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান শিমলা ও শিমলা Hill Statesগুলির ইতিহাস এই

* Proclamation, dated the 17th October, 1814.

সময় হইতেই আরম্ভ। এযাবৎকাল এ সকল প্রদেশে শাসন-সুশৃঙ্খলার অভাব ও পরস্পর দ্বন্দ্ব-মালিন্যে বিচ্ছিন্নতাই ইহাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের বিঘ্নস্বরূপ ছিল। অর্থগৃধ্নুতার বশে অনেকেই এই সকল স্থানে পদক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্রিটিশরাজের আদর্শ শাসন-পদ্ধতির ছায়াতলে এই সকল প্রদেশ এখন শান্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আমরা এক্ষণে এই পার্ব্বত্যরাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ* সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এ সকল প্রদেশে দেশীয়গণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শিরমূর বা নাহান- গুর্খা সমরের সময় যৈশলমীর মহারাওল বংশীয় কর্ম্মপ্রকাশ সিংহ শিরমূর অধিপতি ছিলেন। সমরাবসানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ব্ববিধ অক্ষমতা নিবন্ধন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেপ্রকাশ সিংহকে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফতেপ্রকাশ ১৮৫০ খ্রীঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পৌত্র সমশেরপ্রকাশ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজরাজের যথেষ্ট সহায়তা করায় পুরস্কারস্বরূপ ৭টী ও পরে ১৩টী তোপধ্বনির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং G.C.S.I. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পৌত্র H. H. Maharaja Lt. Col. Sir Amar Prakash Singh, K.C.S.I. এক্ষণে বর্ত্তমান শিরমূরাধিপতি। ইহার পিতা রাজা সৌরীন্দ্রবিক্রম সিংহ ও খুল্লতাত লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল বীরবিক্রম সিংহের সময় হইতেই শিরমূরের বিশেষ যশোলাভ ও

* এই বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রামাণ্য পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (1) Massy's Chiefs and Families of note in the Punjab. (2) Sir L. Griffin's Punjab chiefs. (3) Aitchison's Treaties and Sanads. (4) Punjab Government Records, 1807 to 1857. (5) Punjab Gazetteer.

উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে আমরা এ বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছি। শিরমূর উত্তর দক্ষিণে ৪৩ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত। লোক সংখ্যা ১৩৫৬২৬ এবং রাজস্ব ৬ লক্ষ। মার্কণ্ড, গিরিগঙ্গা, টনস্‌ ও যমুনা নদী শিরমূরকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন নদী স্বর্ণরেণুবহুল। কাষ্ঠের মধ্যে শাল ও দেবদারুই উল্লেখযোগ্য। খনিজবিভবের মধ্যে লৌহ, তাম্র ও সীসক ধাতুর কথাই শুনা যায়। কৃষিউৎপন্ন গম ও ছোলা ইত্যাদির অধিকাংশই শিমলা ও ডেরাডুনে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার শ্লেট পাথর পার্ব্বত্যদেশে গৃহের আচ্ছাদনস্বরূপ টালির কার্য্য করিয়া থাকে।

বিলাসপুর বা কৈহলিয়র—৬ মার্চ্চ, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে রাজা মহাচন্দ্র সিংহ নিজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনিও রাজবারার রাজপুত বংশীয়। ইঁহার পিতৃপুরুষগণ কবে এবং কি সূত্রে এখানে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বংশের স্থাপয়িতা হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন হরিহর চন্দ্রের দুই পুত্র, একজন চম্বা জয় ও অপর বীরচন্দ্র বিলাসপুর প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি বীরচন্দ্রের বংশধরগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিলাসপুর অধিকার করিয়া আছেন। বর্ত্তমান রাজা H. H. Capt. Sir Bije Chand K.C.I.E., C.S.I. ১৮৮৯ খ্রীঃ জুন মাসে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন। বিলাসপুর অহিফেন, আদ্রক ও তাম্রকূটের জন্য বিখ্যাত। লোক-সংখ্যা ৯০৮৭৩ এবং রাজস্ব ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মাত্র। বিলাসপুর-বক্ষপ্রবাহিনী শতদ্রু তরঙ্গভঙ্গে দুকুল প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্রী ও সম্পদ্‌সমন্বিত করিয়া রাখিয়াছে। শিরমূর ও বিলাসপুরাধিপতি ইংরাজ অধীনে নিষ্কর সামন্ত শ্রেণীভুক্ত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সামন্তিক নিয়মানুযায়ী ইঁহাদিগকে সৈন্য সাহায্য করিতে হয়।

হিন্দোর বা নলাগড়—পূর্ব্বে নলাগড় বিলাসপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরচন্দ্রের দ্বাদশ অধস্তন অজিতচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা অজয় চন্দ্রকে নলাগড় প্রদান করেন। তদবধি বিলাসপুর রাজবংশের এই

শাখা হিন্দোর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ২০শে অক্টোবর, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে রাজা রামশরণ সিংহ করদ রাজারূপে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গুর্খাসমরবিশ্রুত মালনদুর্গ এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহা নিজ তত্বাবধানে সেনানিবাসরূপে রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে উহা প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান রাজা ঈশ্বরী সিংহ। লোক সংখ্যা ৫২৫৫১ ও রাজস্ব ১ লক্ষ ৩০ হাজার, তন্মধ্যে ৫ সহস্র মুদ্রা করস্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। এখানেও অহিফেনের চাস অধিক।

রামপুর বা বসাহর—৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে বর্ত্তমান রাজা সমশের সিংহের (১৯০৮) পিতা রাজা মহেন্দ্রসিংহ বসাহর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সনন্দের মুচলেখা অনুসারে বসাহর-রাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বে বাৎসরিক ১৫ হাজার ও এখন প্রায় চারি হাজার মুদ্রা কর দিয়া থাকেন এবং সামন্তিক নিয়মানুযায়ী যুদ্ধের সময় স্বশরীরে স্বীয় সৈন্যবল সহিত ইংরাজরাজের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত। উত্তর পূর্ব্ব দিকে রামপুর রাজ্য তিব্বত সীমান্ত-বর্ত্তী হওয়ায় কয়েকটি গিরিসঙ্কট উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে সিপ্‌কি পাস্ হিন্দুস্থান-তিব্বত পথের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহারই এক দিকের শৈলশীর্ষ হইতে শত দ্রুত গতি শতদ্রু চঞ্চল পথে নামিয়া আসিয়া পুণ্যভূমি ভারত স্পর্শ করিয়াছে। শতদ্রু বসাহর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া রাজধানী রামপুর বেষ্টনপূর্ব্বক ভজ্জি, বিলাসপুর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চনদে মিলিতা হইয়াছে। এখানকার দেবদার, কেলু, কায়েল, আখরোট ও অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষের বন প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত অরণ্যভূমি দশ সহস্র মুদ্রা বনকরের পরিবর্ত্তে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট ইজারা দেওয়া আছে। শতদ্রুবাহিত কাষ্ঠ সকল শিমলা ও পঞ্জাবের সকল স্থানে আনীত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। রামপুরে তিব্বত হইতে আনীত মেষলোমের এক বাজার বসে এবং তাহা হইতে প্রস্তুত রামপুরি চাদরের জন্য ইহা বহুকাল হইতে সভ্যসমাজে

পরিচিত। এখানকার চিনি পর্ব্বত এক সময়ে লর্ড ড্যাল-হৌসির ও পরে অন্যান্য রাজপুরুষগণের প্রিয় গম্যস্থান ছিল ও নিদাঘের তাপহরণ করিত। লোকসংখ্যা ৮০৫৮৩ এবং রাজস্ব ৮৫০০০ টাকা।

পূর্ব্বোল্লিখিত রাজ্যচতুষ্টয় সর্ব্ববিষয়েই প্রধান। অবশিষ্ট রাজ্য-গুলি দুইভাগে বিভক্ত—বড় ঠাকুরাই ও আধারা বা অর্দ্ধ ঠাকুরাই। ইহাদের অধিপতিগণ রাণা বা ঠাকুর নামে পরিচিত। কেঁওথাল, বাঘহাল, বাঘহাট, কুমারসে, ভজ্জি, মৈলোগ,, ধামী, কুটহর, কুনিহর, মঙ্গল, কোটি ও মাধান বড় ঠাকুরাই ও বাকিগুলি অর্দ্ধ ঠাকুরাই। ইঁহারা সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্যপালন করিয়া থাকেন, কেবল প্রাণ-দণ্ড শিমলার ডেপুটী কমিশনরের দ্বারা সমর্থিত করিয়া লইতে হয়। রাজ্যভার অধিকাংশ স্থলে বংশপরম্পরাগত উজীরগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। অহিফেন এখানকার একটী প্রধান ব্যবসায় এবং অহিফেন সেবন সম্বন্ধে এখানকার অধিবাসী ও রাণাগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজস্থানের রাণাগণকেও কখন কখনও অতিক্রম করিয়া থাকেন। আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—"ব্যাগার" পদ্ধতি (forced labour)। প্রত্যেক প্রজা রাজ্যের নিয়মানুযায়ী বৎসরের যে কোনও সময়ে আবশ্যক হইলে বিনা পারিশ্রমিকে রাণার আহ্বানে মজুরের কার্য্য করিতে বাধ্য। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। শিমলার কয়েক মাইল উত্তরে ভজ্জির রাজধানী সিওনীর উষ্ণ প্রস্রবণ (Hot Sulphur Spring) জগৎবিখ্যাত। রক্তদুষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত পীড়িতগণ এখানকার উৎসে কয়েকদিন স্নান করিলে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইংরাজশাসনের হিতজনক ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থার গুণে ও কোন কোন স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের সাহচর্য্যে ইহাদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধোপলক্ষে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজপুতগণ এখানে উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে বংশপরম্পরাগত প্রথাসকল আনিতে ভুলেন নাই।

সতীদাহ তাহাদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট প্রথা। স্বামীর চিতানলে সাধ্বীর এবং নরপতির সহিত প্রধান সর্দ্দারগণের সহমরণ পূর্ব্বে বহুস্থানে প্রচলিত ছিল।* ক্রমে রাজপুরুষগণের আদেশ ও আদর্শে ইহা ক্রম-পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হইয়াছে। ভারতে যবনাধিকারের সময় এবং ইংরাজ শাসন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও স্ত্রীবিক্রয় প্রথা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত ছিল। ওমরাহ ও আমীরগণের অন্তঃপুর ও ধনশালিগণের বিলাসোপকরণ পরিপূর্ণ করিবার জন্য এতদ্দেশ হইতে সুন্দরী যুবতীর ক্রয়বিক্রয়ের কথা বিশেষভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্রীতদাসীরূপেই গৃহীত এবং সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। কৈফিয়ৎস্বরূপ ইহারা বলেন, এতদ্দেশে দারিদ্র্যই এরূপ প্রথার একমাত্র কারণ। আত্মীয়-বর্গ এরূপ প্রথার সমর্থন কল্পে দারিদ্র্যেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। বংশমর্য্যাদাও এইরূপে ক্রয়বিক্রয়ের হাটে বলি দিতে ইঁহারা পশ্চাদ্‌পদ হয়েন না। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কিন্তু ইহার অন্যবিধ কারণ ও উপায়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এতদ্দেশে বিবাহ পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া যদি দেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের চির-কল্যাণময়ী জ্ঞান ও ধর্ম্মের পুণ্যকাহিনীসম্বলিত উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচারপূর্ব্বক ইহাদের মনে স্থায়ী বিশ্বাস উপচিত করিতে পারেন তাহা হইলে নীতি ও ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া সাধুব্যক্তিগণের ক্ষোভ বিদূরিত হইতে পারে। প্রবন্ধান্তরে এখানকার বিবাহ পদ্ধতির কিছু উল্লেখ করিয়াছি। অষ্টপ্রকার পরিণয় পদ্ধতির মধ্যে আসুর বিবাহই প্রধানতঃ এখানে প্রচলিত। বিবাহার্থী যুবক পত্নী লাভাশায় কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে বা কন্যাকে মূল্যস্বরূপ অধিক অর্থ অর্পণ করিতে না পারিলে পত্নীলাভে সমর্থ হয় না। বিবাহ এইরূপে একটী ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি কেহ কেহ যৌবনের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া নরশত

* Captain Kennedy's Report, dated the 6th July, 1824.

হইতে বারশত পর্য্যন্ত বা আরও অধিক অর্থ দিয়া পত্নীলাভ করিয়াছেন। তাহাও হয়ত অপর কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী। কাজেই সময় মত যৌবনোদ্গমে পুত্রকন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়ায় পরিণাম ফল যাহা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার এখানকার বিশ্বাস ও নিয়ম এই যে, কন্যা যতদিন পতিগৃহে বাস করে ততদিন সে স্বাধীনা এবং তাহার কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার কাহারও বিশেষ অধিকার ও আবশ্যকতা নাই। বিবাহপ্রথার যেরূপ স্বৈরগতি বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভও সেইরূপ সুলভ ও অনায়াসসাধ্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আর একটি কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কন্যাবিসর্জ্জন বা সূতিকাগারে সদ্যোজাতা কন্যাহত্যা (Female infanticide) বা দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থে কন্যারূপা আহুতি। ইদানীন্তন কালে এসকল কুপ্রথার পরিচয় প্রকাশ্যে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবাহপ্রথার এবং নীতি ও ধর্ম্মের ক্ষীণতা এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। অবশ্য ইহা সাধারণের মধ্যে। উচ্চবংশীয় রাজপুত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নিয়মের আচার প্রতিপালনে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন। যাহা হউক, যৌনসম্মিলনের এরূপ নিয়মতারল্য বর্ত্তমান থাকিলেও এখানকার অধিবাসিগণের গুণের সংখ্যা এত অধিক যাহা সকলেরই অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য। সাহস, বীর্য্য, সত্যভাষণ, পরিশ্রম ও শান্তিপ্রিয়তা ইহাদের মৌলিক গুণা-বলী। সাধারণতঃ অপরাধের সংখ্যা এত কম যে, Captain Kennedy এই গুণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার রিপোর্টের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, "In no part of the protected dominions, and I may give a wider scope and say the world, is there less crime known." চুরি, হত্যা, বিষয়বিবাদ বা দলা-দলি এত কম যে তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

নিউটন।

(অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ)

অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিউটন যে প্রকার আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়াছেন তাহা এক কথায় বলা যায় না। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, যদি নিউটন না জন্মিতেন তাহা হইলে আমাদের জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান শতাংশের একাংশও হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. নিউটন বাল্যকালে একরকম বোকা ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইংরাজ এবং নিউটন ইংলণ্ডে :৬৪২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরই গেলিলিওর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার অনেকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি নিজে চাষের কাজ করিতেন। বাল্যকালে নিউটন একটি সামান্যরকম স্কুলে পড়িতে যাইতেন বটে কিন্তু স্কুলে যাইয়া লেখাপড়া বড় কিছুই করিতেন না। বাটী আসিয়া হয়ত পাতলা কাগজ লইয়া বাতাসের ঘূর্ণি চাকা, জল তোলা চাকা, জলের ঘড়ি, রকমারী ঘুড়ী—এই সব তৈয়ারী করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া কাজে পাঠান হইল। বাজারে তরকারী বিক্রয় করিতে যাইয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বই পড়িতেন। লেখাপড়ায় ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া এই আত্মীয় তাঁহার লেখাপড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন এবং এই প্রকারে নিউটন ইংলণ্ডের বড় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

আমরা নিউটনের সংসারের কথা বেশী কিছু বলিব না—কারণ, তিনি বিবাহ করেন নাই। আজীবন অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান চর্চ্চাতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কি কি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই কতকটা অল্প কথায় বুঝাইব। প্রবাদ আছে যে, নিউটন গাছ হইতে আপেল ফল পড়িতে দেখিয়াই পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটা শুধু গল্পকথা নহে। ইহাতে অনেকটা সত্য আছে। এই সময়ে ফরাসী দেশে ভলটেয়ার নামে এক মহা পণ্ডিত ও লেখক বাস করিতেন। তিনি এই আপেলের কথাটি প্রকাশ করেন। ভলটেয়ার আবার নিউটনের ভাগিনেয়ীর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন; কাজে কাজেই কথাটি সত্য হওয়াই সম্ভব। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই আপেল গাছটি ঝড়ে পড়িয়া যায় এবং ইহার খানিকটা শুক্‌না কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।* হয়ত, ছেলেবেলায় তাঁহার সাম্‌নে একটি আপেল গাছ হইতে টুপ্ করিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে নিউটন ভাবিয়াছিলেন যে, সব পদার্থই যখন ছাড়িয়া দিলে মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা পৃথিবী সকল দ্রব্যকেই মাটির দিকে টানিয়া লয়। ইহাতে নিউটনের গুণপনা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেই শক্তিটি কি প্রকার, কি রকমে কাজ করে, তাহার মাপ কি, তাহা দ্বারা জগতে কি উপকার হইতেছে—এই সব নিউটনের আবিষ্কার বলিয়া তিনি জগৎপূজ্য হইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ জিনিষটা কি এবং নিউটন তাহার কি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আগে দেখা যাক্; পরে কি প্রকারে তিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দ্বারা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলিব। নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যে কোন দুইটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে টানিতেছে। তোমার ঘরে তোমার কলম দোয়াতকে টানিতেছে—আবার দোয়াত কলমকে টানিতেছে, তোমার আলমারি প্রদীপকে টানিতেছে, আবার প্রদীপ আলমারিকে টানিতেছে ইত্যাদি। সকলেই যখন টানাটানি করিতেছে তখন ঘরের ভিতরের ও বাহিরের সকল দ্রব্যই একস্থানে জড়সড় হইয়া তালগোল পাকাইয়া যায় না কেন? নিউটন বলিলেন, পদার্থ যত ভারী হইবে

---

* O. Lodge. Pioneers of Science—p. p. 180-181.

তাহার টানও তত বেশী হইবে। আমরা পৃথিবীর উপরে আছি। পৃথিবী একটি খুব বড় পদার্থ এবং খুব ভারী—কাজেই পৃথিবীর উপরে যতকিছু পদার্থ আছে—মানুষ, গাছ, পাথর, বাড়ী, ইট, আলমারী, কেদারা ইত্যাদি—তাহাদের চেয়ে পৃথিবী লক্ষ লক্ষ গুণ ভারী। সেই জন্যই সকল পদার্থের উপরে পৃথিবীরই টানের কাজ দেখা যায়—আর আর সব পদার্থের পরস্পরের টান দেখা যায় না। এই দেখ, চন্দ্রও একটি পদার্থ, পৃথিবী নিশ্চয়ই চন্দ্রকে টানিতেছে। পদার্থকে টানিলেই তাহা এগাইয়া আসে। তোমার হাতে একটি আম আছে। যতক্ষণ উহাকে হাতে ধরিয়া রাখিতেছ, ততক্ষণ উহা আসিতে পারিতেছে না। পৃথিবী টানিতেছে বটে কিন্তু উহা স্বাধীন নহে। হাত ছাড়িয়া দাও, দেখিবে উহা পৃথিবী অর্থাৎ মাটির দিকে পড়িয়া যাইবে। এখন, চন্দ্রকে যদি পৃথিবী টানিতে থাকে, তবে চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর দিকে ত পড়িতেছে না। এইবার নিউটনের আবিষ্কার সত্য কিনা তাহা প্রমাণ করিবার বড়ই সুবিধা হইল। কিন্তু এইটি বুঝাইবার আগে এই আকর্ষণ সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

আমরা বলিয়াছি যে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন পদার্থের উপরে জোর কমবেশী হয়—পদার্থটি যত দূরে থাকিবে জোরও ততই কম হইবে। কিন্তু কি হিসাবে কম হইবে? নিউটন সেই হিসাবটিও পরিষ্কার করিয়া নিরূপণ করিলেন।

মনে কর, পৃথিবী আর চন্দ্র পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। চন্দ্র যদি এগাইয়া পৃথিবীর ঠিক অর্দ্ধেক দূরে থাকে, তাহা হইলে ঐ জোর ২ গুণ হইবে না—২×২=৪ গুণ হইয়া যাইবে। চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব যদি তিন ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে ঐ জোর ৩ গুণ বাড়িবে না—৩×৩=৯ গুণ বাড়িবে। ঐ দূরত্ব যদি চারি ভাগের একভাগ হয়, জোর ৪×৪=১৬ গুণ বাড়িবে। এখন এই হিসাব ঠিক কিনা তাহার প্রমাণ কোথায়? চন্দ্রই তাহার

প্রমাণ। কিন্তু চন্দ্র কি পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে? নিউটন বলিলেন, চন্দ্র পৃথিবীর দিকে প্রতি মিনিটে ১৩ ফুট করিয়া পড়িতেছে। তোমরা বলিবে, সে কি রকম—চন্দ্র আবার পড়িতেছে কি রকম? চন্দ্র ত পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতেছে। নিউটন বলিলেন, এই ঘোরাটা কোথা হইতে আসিল? বল দেখি, চন্দ্র কেন ঘুরিতেছে? চন্দ্রকে কে ঘুরাই-তেছে? যদি পৃথিবী চন্দ্রকে আপনার দিকে না টানিয়া আনিত তাহা হইলে চন্দ্র ঘুরিতে পারিত না। চন্দ্রের আপনার সোজাসুজি একটা গতি আছে। তুমি যদি জোর করিয়া একটা ইট ছুড়িয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে ইটটা খানিক দুর অনেকটা সোজাসুজি যাইবে বটে কিন্তু অবশেষে উহা বাঁকিয়া মাটির দিকেই আসিবে। এখানে ইটটিকে জোর করিয়া ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইটের নিজের সাম্‌নের দিকে একটা গতি আছে, সেই গতিতে সে সোজাসুজি চলিয়া যায়। মনে কর, চন্দ্র নিজের গতিতে এক মিনিটে সোজাসুজি ক হইতে খ অবধি চলিয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর যদি চন্দ্রের উপর নিউটনের হিসাব মত আকর্ষণ থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র নিশ্চয়ই পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে। নিউটন তাঁহার হিসাব মত বলিলেন, চন্দ্র প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট করিয়া পড়িবে। চন্দ্র নিজের গতিতে সোজাসুজি খ স্থানে আসিত, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ ১৩ ফুট নিচের দিকে গ স্থানে নামিয়া আসিবে। অর্থাৎ খ হইতে গ অবধি প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট হওয়া আবশ্যক। এখন নিউটন দুরবীণ দ্বারা চন্দ্রের গতি মাপ করিয়া দেখিলেন যে, যাহা চক্ষে দেখা যাইতেছে তাহার সহিত আগেকার হিসাব মিলিতেছে না। হিসাব ১৩ ফুট হইতেছে কিন্তু মাপে ১৫ ফুট হয়। তাহলে কোন্‌টা ভুল?

এই রকমে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন নিউটন লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পিকার্ড নামে এক পণ্ডিত পৃথিবীর ব্যাস হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। নিউটন পৃথিবীর যত ব্যাস ধরিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা এই নুতন ব্যাসের মাপ কিছু কম। নিউটন তখনই এই পিকার্ডের মাপ লইয়া নুতন

করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন। হিসাব যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল ততই তিনি অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি এইবার ঠিক ১৩ ফুটই হইবে, ১৫ ফুট আর হইবে না। তিনি আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া যাইলেন, আর নিজের হাতে হিসাব শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা হিসাব করাইয়া লইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার হিসাব ঠিকই হইয়াছে। কারণ, মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্র প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট করিয়াই পড়িতেছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম নিউটন যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম সৌরজগতে লাগাইয়া আমরা পৃথিবীর ওজন, বৃহস্পতির ওজন, চন্দ্রের ওজন ইত্যাদি জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীর উপরে বসিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে যে গ্রহটি ঘুরিতেছে, তাহার আকার, গতি, ওজন ইত্যাদি আমরা বলিয়া দিতে পারি। নিউটন যদি তাঁহার হিসাব বাহির না করিতেন তাহা হইলে আমরা এ সব কিছুই জানিতে পারিতাম না।

নিউটন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তবে তিনি কেবল শক্ত শক্ত অঙ্ক লইয়াই সময় কাটাইতেন না। আলোক শাস্ত্রেও তাঁহার অনেক আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বৃষ্টির পর আকাশে রামধনু দেখিয়াছে। এই রামধনুকে লাল হইতে নীল অবধি যে কত রকম রং আছে তাহার ঠিকানা নাই। মোটামুটি অনেকেই বলেন যে সাত রকম রং আছে তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। সাত রকম না বলিয়া সাত শত রকম বলিলে বরং ভাল হইত। তবে মনে রাখিবার জন্য অনেকে সাত রকম রংয়েরই নাম করেন। এই রামধনুর রং কেমন করিয়া হইল এবং আকাশের মাঝ-খানে একেবারে এত রকম রংয়ের পর রং আসিলই বা কোথা হইতে, ইহার উত্তর নিউটনই সর্ব্বপ্রথমে দিয়াছেন। তিনি যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন তাহাই সোজা কথায় আমরা একটু বলিব।

সূর্য্যের আলোকে আমরা সাদা আলো বলি। আলোক অনেক

রংয়ের হয়—লাল, নীল ইত্যাদি। দেওয়ালীর রাত্রে অনেক রকম বাজী পোড়ান হইয়া থাকে। আকাশে হাউই ছোড়া হয় এবং তোমরা দেখিয়া থাকিবে, সেই হাউই আকাশে ফাটিয়া নানা রংয়ের তারা বাহির হইতেছে। তোমরা অনেকেই দীপক বাত্তি দেখিয়াছ। ইহা জ্বালিয়া দিলেই চমৎকার আলো হয়—লাল,নীল, সবুজ ইত্যাদি। আবার রংমশাল জ্বালিলে পরিষ্কার সাদা আলো হইবে। নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, এই যে রংমশালের সাদা আলো অথবা সূর্য্যের সাদা আলো, ইহার মধ্যেই সব আলো আছে। নিউটন সর্ব্বপ্রথমে লোককে জানাইলেন যে, সূর্য্যের আলোক একটি মাত্র রংয়ের আলোক নহে ; ইহাতে ঘোর লাল, ফিকে লাল, গাঢ় কমলা-নেবুর রং, হলুদের মত রং, ফিকে হলদে, সবুজ, আকাশের মত ব্লু রং, বেগুনের গায়ের রং, এবং নীল ইত্যাদি রংয়ের আলো আছে। যদি তুমি এই সব রংয়ের আলোক পৃথক্ করিয়া প্রস্তুত কর এবং সব আলোক এক জায়গায় একত্র কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, তোমার চক্ষে সাদা আলোক দেখাইতেছে। সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক, অনেক নক্ষত্রের আলোক এই রকমে সাদা দেখায়।

নিউটন কেমন করিয়া সাদা আলোর এই আশ্চর্য্য গুণ জানিতে পারিলেন তাহা বলিতেছি। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া যে সূর্য্যরশ্মি আসিতেছে সেই রশ্মিতে একটি তেশিরা কাচ ধরিলে দেওয়ালে রামধনুর মত কত রং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছে। নিউটন ঠিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াই এই আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা এত সোজায় হয় নাই ; এক কথায় বুঝান গেল বটে, কিন্তু নিউটন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক রাত্রি জাগিয়া, অনেক পরিশ্রম করিয়া তবে এই আবিষ্কারটি করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া বিজ্ঞান জগতে একটি সত্য হইতে আর একটি চমৎকার সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই নিউটনের সকল কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্য একথাটি আমরা আরও একটু বিশদভাবে বলিব।

গেলিলিও কি প্রকারে দুরকমের দুখানি চশমার কাচের মত কাচ লইয়া দূরবীণ গড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। নিউটনও আপন হাতে ঐ রকম দূরবীণ যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন কিন্তু একটু পৃথক্ রকমের। দূরবীণের ভিতরে বাহিরের পদার্থের যে ছবি পড়িল, তাহা দেখিয়া নিউটন সন্তুষ্ট হইলেন না। এই ছবি নিউটনের মনো-মত না হওয়ায় তিনি সেই কাচ বদলাইয়া ফেলিলেন এবং গোল গোল কাচ কিনিয়া স্বহস্তে ঘসিয়া মাজিয়া পালিশ করিলেন, অপরকে দিয়া করাইলেন না। কারণ, ইহা বড় সূক্ষ্ম কাজ। ইহার সূক্ষ্ম মাপ আছে এবং সেই হিসাবে করা চাই। তাহা না করিলে দূরবীণের ভিতর ঠিক ছবি পড়িবে না। নিউটন এই প্রকারে নূতন দূরবীণ তৈয়ার করিলেন বটে কিন্তু ইহার ভিতরের ছবিও স্পষ্ট হইল না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কাচের দোষ নহে, সাদা আলো ঐরূপ কাচের ভিতর দিয়া যাইলেই কিছু না কিছু অস্পষ্ট হইয়া যাইবেই। ইহা আলো ও কাচের সম্পর্ক। এই ধারণা করিয়াই তিনি তেশিরা কাচ লইয়া সূর্য্যের আলোক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং এই পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখ, দূরবীণের ভিতরে ছবি ভাল হইতেছে না দেখিয়া নিউটন কি কি নূতন সত্য প্রকাশ করিলেন। প্রথমে তিনি এক নূতন ধরণের দুরবীণ তৈয়ার করিলেন। এই দুরবীণটি ছোট বটে কিন্তু উহার দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছিল এবং উহা এখনও বিলাতে আলমারীর ভিতর মণিমাণিক্যের মত মূল্যবান্ মনে করিয়া সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, দূরবীণ ভাল করিতে গিয়া সাদা আলোর গুণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনিই বলিলেন যে, সাদা আলোর ভিতরেই সব রকম আলো আছে। লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী, যে কোন রকম আলো হউক না কেন, সবই এই সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরেই পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান কালের সুবিখ্যাত দার্শনিক হেন্‌রী বার্গসোঁ স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তিনি জড়বাদগ্রস্ত পাশ্চাত্যদেশে একটি নূতন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত বার্গসোঁর দর্শনের তুলনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উহা যে প্রধান ভিত্তিগুলির উপর স্থাপিত সেগুলি হিন্দুদর্শনের নিকট অবিদিত নহে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুদর্শন তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর ভাবে সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে।

বার্গসোঁর স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতগুলি যে একেবারে সত্য নহে এরূপ কথা বলা যায় না কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যাহা ঐ মত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বার্গসোঁর ব্যাখ্যার বাহিরেও স্বপ্নতত্ত্বের অনেক বিষয় আছে। বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

মনের মধ্যে মানসিক চিত্র সংগঠন আমাদের মানসিক ক্রিয়াবলীর মূল উপাদান। এই মানসিক চিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া আমাদের চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রকার মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

কোনও মনস্তত্ত্ববিদ্ এই মানসিক চিত্রাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) কোনরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া সৃজিত মানসিক চিত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Presentative বলা যায়।

(২) ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতিরেকে সৃজিত মানসিক চিত্র। এই

সব চিত্র যেন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়—কোনও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া সৃজিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Representative বলা যায়।

প্রথম শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমাদের মনের অধিকাংশ মানসিক চিত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বার্গসোঁর মতে,—স্বপ্নচিত্রও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি বলিয়াছেন, চক্ষু বুজিলে আমাদের মনশ্চক্ষে যেরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দেখি, তদনুরূপ অনুভূতি লইয়াই স্বপ্নচিত্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ যাহা আমাদিগের মনের মধ্যে স্বতঃ উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যাইতে পারে—

মনে করুন, আমরা বাহিরের অবস্থা ভুলিয়া, বাহ্য জগতের অনুভূতি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি। বাহিরের বা ভিতরের কোনওরূপ উত্তেজনা আমাদের মনকে উত্তেজিত করিতেছে না, কিম্বা মানসিক গতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে না। কিন্তু তথাপি সেই সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বস্তু, বিবিধ স্থান, কাল ও জীবনের অবস্থা, নানাপ্রকার ভাব ও চিন্তা, বহু অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা—এই সকলের বিচিত্র দৃশ্যাবলী আমাদের মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র ছায়াদৃশ্য আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনে আবির্ভূত হয় ও আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়। এই সব মানসিক চিত্রগুলিকে Representative বা স্বতঃপ্রসূত মানসিক চিত্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয়বোধপ্রসূত ও স্বতঃপ্রসূত এই উভয়বিধ অনুভূতির মধ্যে যে কোনরূপ প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, ইউরোপীয় মনীষিগণ এ কথা স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়বোধ অবলম্বন করিয়া যেরূপে মানসিক অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণার

দ্বারা একরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আমাদের দেহে ইন্দ্রিয়বোধ উৎপন্ন হইবার জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানবাহী স্নায়ুর (Special sensory nerves) প্রান্তভাগে বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক যন্ত্র (End organs) রহিয়াছে। যেমন, দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve) প্রান্তভাগ আমাদের চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বিস্তৃত হইয়া অক্ষিপর্দ্দা (Retena) সৃজন করিয়াছে। এই প্রান্তভাগে এমন যন্ত্র রহিয়াছে, যাহাতে আলোকরশ্মি পড়িলেই একরূপ আণবিক পরিবর্ত্তন হয়; ঐ আণবিক পরিবর্ত্তনের ফল দর্শন-স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্ককেন্দ্রের (Visual centre) উপর ক্রিয়া করে। এই মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়ার ফলে আমাদের দর্শন ঘটিত মানসিক অনুভূতি হয়। ঐরূপ শ্রবণ স্নায়ুর (Auditory nerve) প্রান্তভাগ আমাদের কর্ণপটহের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রান্তভাগে শ্রবণ যন্ত্র রহিয়াছে, যাহার উপরে বায়ুকম্পনের আঘাত হইলে একরূপ পরিবর্ত্তন হয়, যাহা শ্রবণ স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (Auditory centre) উপনীত হয় এবং এই মস্তিষ্ক কোষের উপর এমন ক্রিয়া করে যাহাতে আমাদের শ্রবণ বিষয়ক মানসিক অনুভূতি হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার ইন্দ্রিয়বোধঘটিত মানসিক অনুভূতি এইরূপেই ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু মনে করুন, আমরা চক্ষু বুজিয়া আছি, কিম্বা অন্ধকার ঘরে আছি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কোনও কার্য্য করিতেছে না, কিন্তু তথাপি আমাদের মনের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় ঘটিত মানসিক চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে কিম্বা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে যেরূপ স্ফটিকদৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছি সেইরূপ স্ফটিকদৃষ্টি হইতেছে। অর্থাৎ এই সময় আমার মনোমধ্যে এরূপ মানসিক ছায়াচিত্র দেখিতেছি যাহার সহিত বাস্তব জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিবেন যে, এরূপ স্থলেও মানসিক অনুভূতি

মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই সব মানসিক চিত্র, যাহা আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হয় বলিয়া মনে হয়, আমাদের লুপ্তস্মৃতির পুনর্জ্জাগরণ মাত্র এবং স্মৃতির এই পুনর্জ্জাগরণ মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে দুই একটি আপত্তি করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়বোধ প্রভৃত মানসিক অনুভূতির সঙ্গে যে মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার যোগ আছে, ইহা দেহবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পরীক্ষার দ্বারা অনেক পরিমাণে সমর্থিত হওয়ায় অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতিরেকে যে মানসিক অনুভূতি—যেমন, লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধার—এইরূপ কার্য্যের সহিত মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার সম্বন্ধ এপর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারা যায় নাই।

পাশ্চাত্য দর্শনের স্মৃতি বা memory, হিন্দুদর্শনের অন্তরেন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুদর্শন-মতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংজ্ঞানরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের চারি বিভাগের চারি প্রকার বৃত্তি বা কার্য্য আছে এবং এই অন্তরেন্দ্রিয় মৃত্যুর পরও জীবাত্মার সঙ্গে থাকে। সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে হিন্দুদর্শনমতে এই অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত এক নহে।

নিদ্রাবস্থা, হিপ্‌নটাইড্‌ অবস্থা, ধ্যানাবস্থা, স্ফটিকদৃষ্টির অবস্থা—এই সব অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ককেন্দ্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমিয়া (inhibited) যায়, কিন্তু তখন আমাদের স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক প্রখরতা লাভ করে। এমন সব বিস্মৃত ঘটনা, যাহা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় স্মরণ করা একরূপ অসম্ভব, তাহা এই অবস্থায় স্মরণ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়বোধালম্বী মানসিক অনুভূতি

যেরূপ ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কোষের (Brain cells) ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, ইন্দ্রিয়বোধ-নিরালম্বী মানসিক অনুভূতি সেইরূপ মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। হিন্দুদর্শনও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর অনুভূতিগুলি বহিরিন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিগুলি অন্তরেন্দ্রিয়ের চিত্তরূপ বিভাগের উত্তেজনাপ্রসূত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কল্পিত দর্শন (Hallucination) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

কল্পিত-দর্শন অনেকেরই জীবনে কখন কখন ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা দেখিয়া থাকেন, যেন একটি মূর্ত্তি কখন স্পষ্টভাবে, কখনও অস্পষ্টভাবে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া মিলাইয়া গেল। মনে হয় যেন ইহা চক্ষুর ভ্রম কিম্বা মনের কল্পনা মাত্র। কারণ, জড়জগতে উহার কোন বাস্তব সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কল্পিত-দর্শন অনেক সময় ভ্রান্ত দৃষ্টি দ্বারা হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্‌টার স্কট (Sir Walter Scott) কবি বায়রণের (Byron) মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যখন বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া যখন আর একটি ঘরে যাইতে-ছিলেন, তখন তাঁহার মৃত বন্ধু বায়রণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই-লেন। মূর্ত্তিটি অতি স্পষ্ট ও নিখুঁত। এমন কি, বায়রণ যেরূপ ভাবে দাড়াইতেন, যেরূপ পরিচ্ছদাদি পরিতেন তাহা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইলেন। তিনি ভয় না পাইয়া মূর্ত্তিটির দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে উহা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র—ঐ ঘরে একটি পর্দ্দার উপর বড় কোট, শাল প্রভৃতি সাজান ছিল, তাহারই উপর অস্পষ্ট আলো পড়িয়া বায়রণের মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি প্রথমে যে স্থানে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন, পুনরায় সেইস্থানে গিয়া মূর্ত্তিটি দেখি-

বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবার আর কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। *

মহিলা কবি জেমস্ বিটি একদিন রাত্রে জানালার কাছে একটি Coffin অর্থাৎ শবাধারের আকৃতি দেখিয়া কিছু ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা চক্ষের ভ্রম মাত্র—জানালার উপরে যে পর্দ্দা রহিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া এরূপ ভাবে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে যে উহাকে সহসা দেখিয়া coffin বলিয়া মনে হইয়াছিল।

বহু লোকের দৃষ্টিবিভ্রমের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। একবার বিলাতের একটি চিড়িয়াখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে ঐস্থানে রক্ষিত অনেকগুলি প্রাণী পুড়িয়া মরে। ঐখানে একটি বড় বানর ছিল। উপস্থিত লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সেটি খাঁচা হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। বানরটিকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারা একটি ঘরের ছাদের দিকে তাকাইলেন, ঐ ঘরেও তখন আগুন ধরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই বানরটি ঐ ছাদের একস্থানে লোহার শিকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, এই ঘটনা সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন দেখা গেল যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় যেটিকে বানর বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেটি বানর নহে। ঐস্থানে একটি পর্দ্দা ছিল, তাহা কতক পুড়িয়া গিয়া বাতাসে নড়িতেছিল, তাহাতেই বানরের হস্তপদ সঞ্চালনের ন্যায় বোধ হইতেছিল। †

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আর একটি বস্তুর ভ্রমজ্ঞান উদিত হওয়া সূচিত

---

* Sir Walter Scott's Demnology and witchcraft.

† Enigmas of Psychical Research—by Professor James H. Hyslop. Page 188.

করিতেছে। কিন্তু দৃষ্টিভ্রম দ্বারা না হইয়া শুধু মানসিক ভ্রম দ্বারাও এইরূপ ভ্রমাত্মক দর্শন হইতে পারে। 'কল্পিত-দর্শনের তালিকা' (Census of Hallucination) নামধেয় একখানি পুস্তক মনস্তত্ত্বসভা (Psychical Research Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুসংখ্যক মানসিক ভ্রম জনিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহাদেরই অন্যতম—

মিসেস্ ই—র বয়স ৪০ বৎসর। তিনি নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বারাণ্ডার পার্শ্বস্থ সিঁড়ির দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইতেছিলেন। হঠাৎ একবার তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার স্বামী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মোড় ফিরিয়া তাঁহার ঘরের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার স্বামীর মুখখানি যেমন হাস্য-প্রফুল্ল, এই মূর্ত্তির মুখখানিও ঠিক সেইরূপ। মিসেস্ ই— অগ্রসর হইয়া মূর্ত্তির সন্মুখীন হইতেই উহা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই মিলাইয়া গেল। এই সময় মিসেস্ ই—র শরীর বেশ সুস্থ ছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন একটি বিশেষ কার্য্যে আটক পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে বাড়ী আসিবার কথা কিছুই চিন্তা করেন নাই।

এস্থলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মিসেস্ ই— তাঁহার স্বামীকে চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার মানসিক ভ্রম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বামীর ছায়ামূর্ত্তি দেখাইয়াছিল।

বৈষ্ণব-দর্শন।

পূর্ব্বভাষ।

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(২)

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন এই ভাগবতধর্ম্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কিরূপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীন সাত্বত-ধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ভাগবতধর্ম্মের অপর নাম 'পরধর্ম্ম'। কালে ভাগবতধর্ম্ম পঞ্চরাত্রমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনন্তানন্দ-রচিত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনন্তানন্দ বলেন—

> "ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
> বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
> ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্।
> তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে॥"

ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ও কর্ম্মহীন—এই ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। অনন্তানন্দ ইঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক

বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র দুইটী পৃথক্ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।২।৪৩-৪৪-৪৫) পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করের এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা উভয় মতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাভারতযুগে যে পঞ্চরাত্রমত ছিল তাহার প্রমাণ মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে (৩৫০ অধ্যায়) পাওয়া যায়। উহাতে সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বের ৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, যিনি সমগ্র জগৎকে আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি জীবের আশ্রয় তিনি বাসুদেব। মহাভারতকার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কি তাহা বলিয়া গিয়া বাসুদেব-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুতঃ, বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য।

মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে তাহার উদ্দেশ্য পঞ্চরাত্রের অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন। কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ নানা কারণে তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে চতুর্থ ব্রহ্মার বিবরণে পূর্ব্ববিবৃত ধর্ম্মকে দুই বার 'সাত্বত' বলা হইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম সাত্বতধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ততোহি সাত্বতো ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ"। বসু উপরিচর এই সাত্বতবিধি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে—

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যামুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥" (১২।৩৩৫।১৯)

আবার মহাভারতেই কথিত হইয়াছে যে, রণস্থলে অর্জ্জুনকে বিমনা দেখিয়া বাসুদেব এই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানুজ "সাত্বত-

সংহিতা" নামে একখানি পঞ্চরাত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ 'সাত্বতর্ষভ' (১১।২।১) ও 'সাত্বতপুঙ্গব' (১।৯।৩২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে, সাত্বতগণ যাদবগণেরই এক শাখা (১।১৪।১৩), তাঁহারা বাসুদেবকে পরব্রহ্মবোধে অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতে সাত্বতগণ কর্ত্তৃক যে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অনুমোদিত। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত সাত্বতগণই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে ইহা সাত্বতধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ 'ভাগবত' নামে খ্যাত ছিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রগণ বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র নারায়ণোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বাসুদেব বৃষ্ণিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—পার্থ সাত্বতদিগকে আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ মনে করেন না। আদিপর্ব্বে (২১৮।১২) বাসুদেবকে সাত্বত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উদ্যোগপর্ব্বে (৭০।৭) তিনি 'জনার্দ্দন' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন। দ্বাপরশেষে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক সাত্বতবিধি অনুসারে গীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে যাদব ও বৃষ্ণিদিগের তালিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অংশের পুত্র সত্বত এবং তাঁহার বংশাবলি সাত্বত নামে পরিজ্ঞাত। ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাত্বতেরা পরব্রহ্মকে ভগবান্ ও বাসুদেব বলিয়া থাকেন (৯।১।৪৯), এবং তাঁহারা কোন বিশেষভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত্বতেরা অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন; ইঁহারা যাদব নামেও অভিহিত ছিলেন (১।১৪।২৫ ; ৩।১।২৯)। এইখানে বাসুদেবকে সাত্বতর্ষভ বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি বাসুদেব ও বাসদেবের ব্যুৎপত্তি দিবার সময় বলিয়াছেন তাঁহারা ক্রমান্বয়ে

বসুদেব ও বলদেবের পুত্র। ঐ সূত্রের কাশিকায় বাসুদেব ও আনিরুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে আনিরুদ্ধকে অনিরুদ্ধের পুত্র বুঝিতে হইবে; কিন্তু বাসুদেবের অর্থ করা হইয়াছে বাসুদেবের পুত্র, বসুদেবের পুত্র নহে। কাশিকায় (৬।২।৩৪) বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বন্দ্বসমাসে 'শিনিবাসুদেবা' পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। এস্থলে উভয় শব্দই বহুবচনে ব্যবহৃত। আবার 'সঙ্কর্ষণবাসুদেবৌ'—উক্ত বংশীয়গণের নামের এইরূপ দ্বন্দ্বও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ও পতঞ্জলির ছত্র সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃষ্ণিবংশের অপর এক নাম সাত্বত এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই বংশভুক্ত ছিলেন। আর এই সাত্বতদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাতে বাসু-দেবকে পরাৎপর পরমপুরুষরূপে উপাসনা করা হইত।

Megasthenes চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন মাসিডনীয় রাজদূত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই Megasthenes একটা বিবরণ দিয়াছেন যে, Sourasenoi গণ Heraklesএর উপাসনা করেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের একটী জাতি; ইঁহাদের দেশে Methora ও Kleisobora নামে দুইটী প্রধান নগর আছে। পোতপরিচালনোপযোগী Jobares নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে Sourasenoiগণ সুরসেন নামক এক ক্ষত্রিয় বংশ। ইঁহারা মথুরা অবস্থিত প্রদেশে বাস করিতেন; যমুনা নদীও তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বলা বাহুল্য যে, Megasthenesএর Methora মথুরা, Jobares যমুনা, এবং Herakles হরির প্রকার-ভেদ। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনা প্রথম মৌর্য্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও ধারণা যে, উপনিষদের সময় যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই পরিশেষে পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈনমতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাসুদেব-কৃষ্ণ-উপাসনায় পরিণত হয়।

এই ত গেল এক দিক্ দিয়া বিচার। অপর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিতে হয় যে, পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের পরে কতদিন

পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চরাত্র কখন্ কোন্ ভাবে ছিল তাহাও আলোচ্য।

পূর্ব্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডির শিলালিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১ম শতক পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। ইহার পর চারিশত বৎসর ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ-দ্যোতক কোন চিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন গুপ্তরাজাদিগের প্রবল প্রতাপ, তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত "পরমভাগবত" ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। এই কয়জন রাজার সময় ৪০০ হইতে ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

গাজিপুর জেলায় ভিটারি-স্তম্ভে একটী শিলালেখ আছে, তাহাতে শার্ঙ্গী অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথা আছে। ইহাতে স্কন্দগুপ্তকর্ত্তৃক এই দেবতার পূজার জন্য একটী গ্রামের দানপত্রও আছে।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্তের রাজ্যকালের একটী লিপি আছে। এই লিপিখানি ৪৮৩ খীষ্টাব্দের। ইহাতে জনার্দ্দনের ধ্বজস্তম্ভনির্ম্মাণের কথা আছে এবং মাতৃবিষ্ণুকে "অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর বাঘেলখণ্ড ও দিল্লী-কুতবমিনারের সন্নিকটে লৌহস্তম্ভে ভাগবতধর্ম্মের কিঞ্চিৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৬০।১৯) পুরোহিতবিচারপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগবতগণ বিষ্ণুপূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য করিবেন। ববাহমিহিরের সময় ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষচরিতে বাণ দিবাকর মিত্র নামে একজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন,

পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহার বাসস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বতে ছিল। তাঁহার বাসভূমির চতুর্দ্দিকে বহু উপাসকসম্প্রদায় ছিল—এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দুইটী সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র।

ধর্ম্মপরীক্ষা-অমিতগতি নামক ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি জৈন গ্রন্থে ভাগবতসম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতধর্ম্মের ক্রম কোন দিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে এই ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে এই ধর্ম্মাবলম্বীরা কখনও বা প্রতাপান্বিত ছিল, কখনও বা ইহাদের শক্তি নিতান্ত হ্রস্ব ছিল।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি বৈষ্ণব আগমের প্রচলন আছে। এই আগমগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বৈখানস আগমই প্রাচীনতম। ইহা গদ্যে লিখিত। পদ্যেও এইরূপ একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা প্রাচীন নয়। উৎসবের সময় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়বেদ নামক প্রবন্ধ গীত হইয়া থাকে। অনন্তানন্দের সময়ে বৈখানস সম্প্রদায় ছিল; তখনই ঐ পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীবৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়। এই বৈখানস-আগমে ভাগবত সম্প্রদায়ের একটী বিবরণ আছে। ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চরাত্রাগমেরও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সংহিতা-সমাহার পঞ্চরাত্রাগম নামে পরিচিত। ইহাদের সংখ্যা ১০৮। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে অথবা অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সংহিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহিতাই একেবারে আধুনিক। আমি সকলগুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। তবে যে কয়খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য ও অর্ব্বাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দুএকখানির নাম করা যাইতে পারে। ঈশ্বরসংহিতায় সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য্য রামানুজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের সময় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ এবং রামানুজের সময় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। বৃহৎব্রহ্মসংহিতায়ও রামানুজের

নাম আছে। সুতরাং এগুলি যে একাদশ খ্রীষ্টশতকের পরে রচিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীসংহিতা, জ্ঞানামৃতসার, পরমসংহিতা, পৌষ্কর সংহিতা, পদ্মসংহিতা ও ব্রহ্মসংহিতা—এই ছয়খানি সংহিতা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। পৌষ্কর ও পরমসংহিতা হইতে আচার্য্য রামানুজ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এগুলি তাঁহার সময়েও প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। জ্ঞানামৃতসার যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতকের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় তাহা মান্দোরস্তম্ভমূর্ত্তি সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। মতের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নারদসূত্রকে ঔপনিষদ্-মতবাদী বলিতে পারা যায়। ছান্দোগ্য উপদেশ করিতেছেন—

'অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ ইতি। তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।' এই সনৎকুমারকে চারিজন অধ্যাত্মতত্ত্ব-স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সকল শাস্ত্রই স্বীকার করেন।—ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠকে বলিতেছেন—

'তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে'—শঙ্কর গীতাভাষ্যভূমিকায় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্ম্মের বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে নিবৃত্তিমার্গ—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃ'সন' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহারা নারদের সহিত আবেশাবতার বলিয়া উক্ত। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

"সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা"

অন্যত্র—

নারদায় চ যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা
সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মনা (৪।৪।২)।

নারদসূত্র স্বীয়পরিচয়ে বলিয়াছেন—"নারায়ণপ্রোক্তং শিবানুশাসনং"—এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্, ও বিভীষণকে ভক্তি-শাস্তা বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক "ঈশ্বরে" ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও

বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির কথা বলেন নাই। এক স্থলে ভগবানের অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন মাত্র। যথা "ব্রজগোপিকানাং" প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়। এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেতদ্বীপের নামগন্ধ নাই। ইহাতে ভক্তদিগের মধ্যে "ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" বলিয়া একান্তিগণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। ভক্তিকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিসূত্রে অঙ্গীকার করিয়াছে। ইহার মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও মহৎকৃপাই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপায়। ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই নয়। নিরোধ অর্থাৎ লোকবেদব্যাপার-সন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরায়। এই গ্রন্থে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তিসংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্রের বর্ত্তমান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আকারের নারদপঞ্চরাত্র অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন।

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নারদ তাঁহার ধর্ম্মমত শিবের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।

> "গুরুর্মে ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগীন্দ্রো নারদমুনিঃ।
> গুরোর্গুরুর্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রানাং গুরোর্গুরুঃ॥

বিষ্ণু যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চালটী চালিয়াছেন। যাহা হউক, নারদপঞ্চরাত্র পূর্ব্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত।

নারদপঞ্চরাত্রে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ের কোন স্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্তু নারায়ণীয় ও পঞ্চরাত্র দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে ইহা যে মহাভারত আখ্যায়িকা হইতে রচিত তাহা বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয়ের আখ্যানবস্তু বিভিন্ন হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণীয় নারায়ণে একান্তিভাব উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্র পরানুরক্তি এবং নারদসূত্র ঈশ্বর বা ভগবানে প্রেম শিক্ষা দিয়াছে। অতি প্রাচীন সময় হইতে যে বৈষ্ণবদিগের

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্মমত উপনিষদের বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। শঙ্কর ও রামানুজের চতুর্ব্যূহপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাত্রের মত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামানুজ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। চতুর্ব্যূহতত্ত্ব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকেও বিদ্যমান ছিল। নারদপঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহের মধ্যে কেবল সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নেরই কথা বলিয়াছেন। ন্যাসবিবরণে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামের মধ্যে সকলগুলির নাম করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথায় আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহতত্ত্বই বিবৃত করিয়াছে। তবে নারায়ণীয় মত পঞ্চরাত্র মত হইতে স্বতন্ত্র। ইহাই রূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণাং অপ্যেষা প্রক্রিয়ামতাঃ।"

নারদপঞ্চরাত্রের আর একটী বিশিষ্ট অংশ হইতেছে, রাধিকা-সমাবেশ। মহাভারতে মাত্র এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের কথা বহুধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধা নাম এ দুইগ্রন্থে কোথাও নাই। গোপালতাপনী উপনিষদ্ রাধার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই উপনিষদ্ বর্ত্তমান আকারে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না।

আমার বোধ হয়, পঞ্চরাত্রেই রাধাতত্ত্ব প্রথম বিবৃত হয়। নারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন—

"রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তদ্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা" ॥ (১।১২)

নারদপঞ্চরাত্রে বলেন যে, কপিলপঞ্চরাত্রে রাধার পূর্ণ বিবরণ আছে—

"সংক্ষেপেনৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং
কাপিলয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরম্
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।" (২।৬)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতত্ত্ব যে রাধাতত্ত্ব, যাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়াছেন, যে রাধাতত্ত্ব এখানকার বর্ত্তমান বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রাণ, যাহা কৃষ্ণতত্ত্ব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহার আকরস্থানের অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কপিলপঞ্চরাত্রই এই তত্ত্বের জনক। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব, সুতরাং এখানে আর কিছু বলিব না।

আমরা দেখিলাম যে, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত অনেক স্থলেই এক পর্য্যায়বাচী। পূর্ব্বে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মত স্বতন্ত্র থাকিলেও পরে ইহারা অধিকাংশ ব্যাপারে একমত।

এক্ষণে আমরা ভাগবততত্ত্ব কিরূপ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবত কাহাকে বলে, ধর্ম্মই বা কি, ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ আছে, যাহা ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিবৃত, তাহাই ভাগবত-বাচী। আর যাহা ধারণ করে, মানুষকে যাহা তাহার স্বরূপে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে যে মানুষ স্বীয় স্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। একমাত্র ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব আপনার স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্যদিকে ধর্ম্মই আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়া দেয়। কাজেই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচলিত থাকিতে পারে। ভগবৎ-প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম্ম আচরিত হয়—যাহার আচরণে, অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রীতিই একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চাই না, স্বাচ্ছন্দ্য চাই নাই, আমি চাই ভগবৎ-প্রীতি, তাহাতেই আমার আত্মতৃপ্তি—এই ভাবে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়

তাহাই পরধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম। তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা তাঁহাকে পাইবার জন্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্য লইয়া আচরণ কর তাহা হইলে বাধা বিঘ্ন তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পারিবে না, স্বরূপ হইতে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে। সকাম লৌকিক কর্ম্ম অথবা সকাম বৈদিক কর্ম্ম প্রভৃতি নীতির আচরণ করিলে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে, এমন কোন শাসন নাই সত্য; নীতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অধর্ম্ম নয়, তাহাও সত্য—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি নীতি গৌণ ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য—অপরধর্ম্ম নামে অভিহিত, কিন্তু নীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে—নীতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নয়; তদ্দ্বারা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। যে নীতির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নাই, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই নীতির যাহা কিছু প্রসার তাহা পার্থিব—দেহ-দৈহিক সম্বন্ধ লইয়াই। এই নীতি পার্থিব স্থূলদেহে আমিত্ব আরোপ করিয়া থাকে, কাজেই স্থূলদেহের বাহিরে ইহার অধিকার নাই। স্থূলদেহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহার অধিকার—ইহার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ।

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও না কেন, যদি তুমি স্বার্থান্ধ হও, জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস না কর, তবে দেহদৈহিক সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্যের মধ্যে থাকিলে তোমার কার্য্যে পদে পদেই ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিবে। তুমি তোমার কর্ত্তব্যের গণ্ডীকে ক্ষুদ্র পরিবার অতিক্রম করিয়া সমাজে প্রসারিত করিতে পার, আবার সমাজকে অতিক্রম করিয়া দেশে, এইরূপে দেশকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে প্রসারিত করিতে পার, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক সুখদুঃখকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি কখনও সকাম কর্ম্ম দ্বারা বিষয়াকর্ষণকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহা দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। যদি তুমি সকাম কর্ম্মের হস্ত হইতে

অব্যাহতি পাইতে চাও- তাহা হইলে তোমার একমাত্র উপায় ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। ভগবদুদ্দেশ্যশূন্য জ্ঞানও তোমার কোনও কাজে আসিবে না। 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞানে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে অপরাধ হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই পরধর্ম্ম হইতে পারে না। এই ভাগবতধর্ম্মের দুইটী দিক্—একটী "সাধ্য" অপরটী 'সাধনা'। সাধ্য –জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংস্থিত ; সাধনা—অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা ধারণ করে তাহা 'সাধ্য'—ইহার নাম "প্রেমভক্তি"; যাহা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় তাহা সাধনা—ইহা সাধনভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে এরূপভাবে নিহিত যে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। যদিও ইহা স্বরূপেরই বৃত্তিবিশেষ তথাপি ইহা সাধনভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং ইহার নাম "সাধ্য"।

যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে, তাহাই পরধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারা যায়। মানবের চরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন ভাগবতধর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের সাধক। ইহা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পরধর্ম্ম।

ভাগবতধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্তি নিজেই সম্পূর্ণ সুখস্বরূপ। যিনি ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর অন্য কিছুর অনুসন্ধান করিতে হয় না, কারণ, যাঁহার ভক্তি লাভ হইয়াছে তিনি পরিপূর্ণ সুখে ভরপুর -একেবারে মশগুল, তাঁহার আর অন্য সুখের অবসর নাই—প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদিত হইলে তার ত্রিসীমায় দুঃখ থাকিতে পারে না। ভক্তি স্বয়ংই সুখস্বরূপ—ইহা অপেক্ষা সুখদায়ী পদার্থ নাই; ইহার এমনই স্বভাব যে ইহার সম্মুখে কোন বাধাবিঘ্ন আসিতেই পারে না। আত্মাকে প্রসন্ন করিতে ভক্তি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রসাদজননী এই ভক্তিকে কোন কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তি দ্বারা শ্রবণাদি

লক্ষণ সাধনভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৃথক্ চেষ্টাপরিশূন্য হইয়াও মানুষ অনায়াসে বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য সকলেই ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তির উন্মেষ হইলে ইহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকে। ভক্তি কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখে না। যে ধর্ম্মদ্বারা এই ভক্তি রচিত হয় তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। সুতরাং ভাগবতধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তুমি আমি যে বাঁচিয়া আছি তা কিসের জন্য? সবিশেষ অনু-সন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হইবে যে আমি জীবিত আছি শুধু তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। দর্শনে যাহাকে অদ্বয়জ্ঞান বলে তাহাই তত্ত্ব। শাস্ত্রে তত্ত্বের নামান্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্। তত্ত্ব একই, কেবল প্রকাশাদির পার্থক্যবশতঃ নামে ভেদমাত্র।

যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি তাঁহারা সতত ভগবানের অনুধ্যান করিয়া অহঙ্কারজন্য কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মননাভি-নিবেশ সহকারে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎকথায় রুচি জন্মে। ইহা হইতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ভক্তি জন্মিলে ভগবান্ অন্য সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। এইরূপে ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া থাকে। ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করিতেছে যে এই সমস্ত কারণেই ভক্তগণ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ভগবান্ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজমুখে ধর্ম্মোপ-দেশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ যে সকল নিজ মুখে উপদেশ করেন তাহার সকলগুলিই ধর্ম্মপদবাচ্য। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধারণ, এমন কি, মূঢ় লোকসকলও অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। ইহাতে অধিকার

অনধিকারের কথা নাই। সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। তাই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধ ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ৩৪

এই ভাগবতধর্ম্মে সকলেরই অধিকার। ইহা আশ্রয় করিয়া মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না। ইহা এমনি সুষ্ঠু ধর্ম্ম যে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। তবে এ ধর্ম্মে একটী জিনিষের সম্পূর্ণ আবশ্যক—তাহা পূর্ণ নির্ভরতা। বিধিতে হউক বা স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করিবে সমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণে কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ভাগবত-ধর্ম্ম কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অতি উদার ও মহান্। ইহা সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত। সর্ব্বদেশে এই ধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত।

এইবার আমরা ভাগবত হইতে কয়েকটী উপদেশের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

১। সর্ব্বভূতে যাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎস্ফূর্ত্তি হয় এবং যিনি পক্ষান্তরে আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতসত্তা উপলব্ধি করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় দ্বারা সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হন না, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্ম্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ,

মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান।

"যাঁহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবনিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

"যাঁহার জন্ম কর্ম্ম দ্বারা অথবা বর্ণ, আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহংভাব জন্মে না, তিনি হরির প্রিয়।

"যাঁহার বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পর এই ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম।

"যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্য স্মৃতিভ্রষ্ট হন না, যিনি বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ হইতে লবার্দ্ধও—মুহূর্ত্তার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।"

যাঁহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাগবতধর্ম্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, যাঁহার কর্ম্মে ও আচরণে ভাগবতধর্ম্ম জলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খেলিতেছে, যাঁহার পবিত্র দর্শনে ও সঙ্গগুণে জগৎ ভাগবতধর্ম্মে উন্মুখ হইতেছে—তাঁহাকেই বৈষ্ণব-প্রধান বলিয়া জানিবে। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সেইজন্যই দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বসু রামানন্দকে বলিতেছেন—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

জীবনের উদ্দেশ্য।

(ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য)

কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"আচ্ছা, বল দেখি, এই যে কত কষ্টের মনুষ্যজন্ম যাহা ভগবানের কত অনুগ্রহে ও কত জন্মের সুকৃতির ফলে লাভ হইয়াছে—সেই দুর্লভ মনুষ্যজীবনে আমাদের কি করা উচিত? কিরূপে ইহা কাটান উচিত?" সে বোধ হয় চট্ করিয়া উত্তর দিবে, "কেন, এই কয়টা দিন যাহাতে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান যায়, যাহাতে অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে না হয়, যাহাতে সমাজে গণ্য, মান্য ও যশস্বী হইতে পারা যায়, তাহাই সকল মানবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে? বাস্তবিক, এই পৃথিবীর প্রায় সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য ঐ টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহাদের এত কঠোর পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাশিক্ষা, এত কষ্ট যন্ত্রণার সহিত অর্থোপার্জ্জন, এক হাত জমীর জন্য এত মারামারি কাটাকাটি, অথবা দেবদেবীর নিকট এত কঠোর তপস্যা ও স্তবস্তুতি।

বিশ্বমানব সুখের সন্ধানে তৎপর, যোগপরায়ণ সাধু তপস্বী হইতে সাধারণ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত। তুমি, আমি, বা গিরিগুহাবাসী তপঃপরায়ণ ভগবৎপ্রেমিক কেহই দুঃখ চাহে না। যদি সকলেই সেই এক সুখ চায়, তবে বলত, সাধুব্যক্তিই বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দের অধিকারী হন কেন, আর তুমি আমি সদা অশান্তি, শোক, তাপ ও সহস্র প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণাদিতে ভুগিয়া মরি কেন? আমরা জগতের সকল জিনিষ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাই, আর তাঁহারা ঐ সকল জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া সুখী হইতে চান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকলের মূলে সেই একই উদ্দেশ্য, একই সুখশান্তিলাভেচ্ছা

থাকিলেও উভয়ের পথ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন প্রভূত অর্থ, মনোরমা স্ত্রী, প্রাণাধিক সন্তানসন্ততি প্রভৃতি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির মধ্যে সুখের সন্ধান করিতেছে—আর অন্য জন ঐ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক অতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইতে সুখ শান্তি আহরণে যত্নপরায়ণ। স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে—এবং সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই আমরা দেখিতেছি যে, বরাবর তাঁহারাই জিতিতেছেন ও আমরাই হারিয়া আসিতেছি। কারণ, তাঁহারা সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মধ্যেই অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি, অপার আনন্দ ও অনন্ত শান্তির সন্ধান করিতেছে আর অন্যে ভগবানকে ছাড়িয়া এই সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে অনন্ত সুখ, অনন্ত সমৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শান্তির অনুসন্ধানে ফিরিতেছে।

আচ্ছা, যদি বিষয়েই সুখ থাকিত তবে আমরা এত দুঃখ পাই কেন? জীব.ত সেই অনাদি অনন্তকাল হইতেই বিষয় সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, তবে তাহাদের আর দুঃখের অন্ত হয় না কেন? যদি অর্থের মধ্যেই সুখ থাকিত, তবে দেখিতে পাই অপরিমিত ধনশালীরও যে দুঃখ আর শতছিদ্রকুটীরবাসীরও সেই দুঃখ। যদি সুন্দরী ভার্য্যা ও সন্তানসন্ততির মধ্যেই সুখ থাকিত তবে জীব তাহা লাভ করিলেও তাহার দুঃখের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না কেন? যদি সুখাদ্যের মধ্যেই তৃপ্তি থাকিত, তাহা হইলে শুধু এ জন্মে কেন, শত শত জন্ম ধরিয়া ত উহা ভোগ করিয়া আসিতেছি কিন্তু তৃপ্তিলাভ ত দূরের কথা, লালসা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না কেন? বিষয়ের মধ্যে নিত্যসুখ কোথায়? যদি তাহাই হইত, তবে আমি যে বিষয় ভোগে আপনাকে সুখী মনে করিতেছি অন্যে তাহাতে সুখ পায় না কেন? এমন কি,আমিই অদ্য যাহা পাইলে আনন্দিত হই, কল্য আর তাহা পছন্দ করি না কেন? ইহার একমাত্র কারণ, বিষয় দুঃখময়—উহা সুখের মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বদা জীবকে প্রবঞ্চনা করে মাত্র। সেই দুঃখময় বিষয়ভোগে জীব কি কখনও

সুখী হইতে পারে? অগ্নির মধ্যে যে শীতলতার অনুসন্ধান করে সে কি মূর্খ নয়? যাহা অল্প, ক্ষণভঙ্গুর, পরিবর্ত্তনশীল সেই বিষয়ের মধ্যে নিত্য সুখশান্তির আশা করা কি পাগল ও মূর্খের কার্য্য নয়? এই দেহের যে সৌন্দর্য্যলাভকে তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতেছ, একটী কঠিন পীড়া আসিয়া তোমার সেই চাঁদমুখখানিকে কি বিকৃত করিয়া দিতে পারে না? যে অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া আজ গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিতেছ, একটী দায় বা মোকর্দ্দমার ব্যয়ে কি তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে না? অর্দ্ধভূমণ্ডলের অধিপতিকে কি একদিনের মধ্যে পথের ভিখারী হইয়া প্রজাদিগের ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে দেখা যায় না? যে সন্তানসন্ততি লাভ হইলে আনন্দে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া থাক, বল দেখি, তুমি কি তাহাদের চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে? একদিনও কি কাহারও নির্ম্মম হস্ত তোমার অঙ্ক হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না? তখন তোমার কি দশা হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

বালক নচিকেতা যমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের বাসনা জানাইলে যম তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন—"হে নচিকেতা, তুমি এই বিরাট বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হও, তুমি অসংখ্য যানবাহনাদি গ্রহণ কর, তুমি নরলোকের দুষ্প্রাপ্য সুন্দরী অপ্সরাগণকে লইয়া যতদিন ইচ্ছা সম্ভোগ কর, তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রাদি লাভ কর, আর নিজ জীবন অল্পায়ু হইলে সমুদয় সুখসম্ভোগই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সুতরাং হে নচিকেতা, তোমার যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকিয়া এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী স্ত্রী, যানবাহনাদি ও পুত্রপৌত্রাদি লইয়া বিহার কর। তথাপি তুমি আমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করিও না।" নচিকেতা ঠিক জানিতেন, মানবদেহ ও জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সেই দেহ ও জগৎ লইয়া নিত্যসুখ অসম্ভব।

এ বর যিনিই দান করুন না কেন, তাহা কেবল মানবমনকে ভুলাইবার জন্য—তাহা কার্য্যতঃ কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে না। তাই তিনি এই ভীষণ প্রলোভনেও কিছুমাত্র বিমুগ্ধ না হইয়া অক্ষুব্ধ সাগরবৎ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন—"হে মৃত্যো, সমস্তই শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মাদিরও জীবন যখন সেই অনন্তের তুলনায় কিছুই নহে, তখন আমার কয়েক শত বর্ষব্যাপী জীবনের আর কথা কি? আর যে ধনরত্ন ও যানবাহনাদির কথা বলিলেন, তৎসমস্তও ত 'শ্বোভাবা' অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ; এবং যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্না সুরনারীগণের কথা বলিলেন, তাহারা ত মানুষের বল, বীর্য্য, আয়ু সমস্তই ক্ষয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাতেই বা আমার প্রয়োজন কি? অতএব হে যম, আপনার নৃত্যগীত, আপনার সুরনারী ও যানবাহনাদি আপনারই থাকুক—আমার ও সকলে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

সুতরাং যখন দেখিতেছি যে, শুধু এ জন্মে নহে, শত শত জন্ম ধরিয়া এই বিষয়ের মধ্যেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছি কিন্তু শত শত জন্ম ধরিয়াই প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি—শত শত জন্ম ধরিয়া কেবল সুধাভ্রমে বিষ পান করিয়া ভীষণ জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তখন এমন একটী বস্তু চাই যাহাতে অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ আছে—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু যে সুখের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। এমন ধন চাই যাহার নিকট জগতের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি তুচ্ছ। সে বস্তুটী কি?

সেই বস্তুটী অনন্ত সুখের উৎস, অনন্ত জ্ঞানের আকর, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ভগবান্। সেই অনন্তময়ের সত্তা আব্রহ্মজীব সকলের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন এবং তজ্জন্য কেহই অল্প, সীমাবদ্ধ ও সান্ত বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান্ মানব—যাঁহারা এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা সকল ছাড়িয়া অনন্ত ভগবানকে ধরিয়া থাকেন—কারণ, তাঁহারা জানেন যে সেই সুখ, শান্তি ও আনন্দ

অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করিলেও কখনই ফুরাইবার নহে। তাই সকল দেশের সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরাই বলেন যে, একমাত্র ভগবানের করুণা লাভ করিলেই জীব প্রকৃতপক্ষে চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে।

"If you are a lover of beauty where can you find such beauty as in God? If you are a lover of eloquence who can be more eloquent than God, from whom all the vedas have come into existence? If you are a lover of power what being can be more powerful than God? Every man loves one of these and all of these are to be found in an infinite degree in God. If you love a beautiful woman, her beauty will only last for a short time, but God's beauty is perennial. So if you want perennial beauty, indestructible life, all power and all knowledge, you must go to God." * "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" —যাঁহাকে লাভ করিলে জগতের সমস্ত বস্তুই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে সেই প্রেমময় ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন মানুষ কি আর অন্য কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি" সেই পরমধন ভগবানকে লাভ না করিয়া মানুষের অতৃপ্ত ধনাকাঙ্ক্ষা কি আর মিটিতে পারে? হে মানব, যাহার সৌন্দর্য্য ও রূপের নিকট সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাবলি ও বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময় ভগবানকে ছাড়িয়া রমণীর দুদিনের হেয় রূপে বিভ্রান্ত হইয়া তুমি অনন্ত দুঃখসাগরে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছ—কই তবু ত তোমার চৈতন্য হইতেছে না? হে মানব, তুমি সেই ভগবৎপ্রেমের জন্য পাগল হও। "হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটী মাত্র চুম্বন!—যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত

* The path to perfection.

হইয়া থাকে—তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়—সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়। প্রিয়তমের সেই চুম্বন-তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া তোলে। ভগবান্ একবার যাহাকে অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়, চন্দ্রসূর্য্যের অস্তিত্ব থাকে না, আর সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিশাইয়া যায়।" *

হে সততবিভ্রান্তচিত্ত মানব, সমস্ত ছাড়িয়া সেই অনন্ত প্রেমের আকর ভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহার অফুরন্ত প্রেমসুধা পান করিয়া জন্মজন্মান্তরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান কর।

ইহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মহামায়ার মায়ার ঘোরে সব ভুলিয়া এক করিতে আর করিতেছ। কাঞ্চন ভুলিয়া কাচ কুড়াইতেছ, রত্নাকারে রত্নের সন্ধানে আসিয়া সামান্য উপলখণ্ড লইয়া ঘরে ফিরিতেছে!

এখন সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—জানিলাম জীবনে সত্য কি—প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ কোথায়। কিন্তু কিরূপে উহা লাভ করিব? উপায়—তোমারই আন্তরিক ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ তোমাকে ঐ পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। কথায় বলে, "যে চায় সে পায়"। "চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—আঘাত কর, তবেই দ্বার উন্মুক্ত হইবে—অনুসন্ধান কর, তবেই উহা খুঁজিয়া পাইবে।" †

তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে খোঁজা চাই—শুধু মুখে 'হে করুণাময়, আমি তোমাকে চাই' বলিলে হইবে না। অন্তরে অন্তরে তাঁর জন্য অভাব বোধ করা চাই—জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিলে তুমি

---

* ভক্তিযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ।

† Sermon on the mount—Christ.

যেরূপ বায়ুর জন্য অভাব বোধ কর, ভগবানের জন্য যখন ঠিক সেইরূপ অভাব বোধ করিবে—যখন তুমি তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছুতেই বাঁচিতে পার না—তখনই তুমি তাঁহাকে লাভ করিবে।

নিবেদন।

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত)

জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি, তবু
তোমারে দেখি না কেন ?
যে আঁখি তোমারে না পায় দেখিতে,
কেন দিলে আঁখি হেন ?
দুদিনের তরে ধনজন দিয়ে
নিজে কোথা হায় লুকাইলে গিয়ে,
পুতুলের মত রাখিলে ভুলায়ে,
এ ধরায় অকারণ!
জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি, তবু
তোমারে দেখি না কেন ?

অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি ;
পরিচয় কোথা তার ?
অন্তরবাণী শুনিছ বসিয়া—
শুনিছ না হাহাকার ?
ব্যাকুল হ'য়েছে হৃদয় আমার,
তোমা পানে ছোটে প্রাণ অনিবার,
ছেড়ে যেতে চায় মোহের আগার,
তাই ডাকি বারে বার।

ওগো, অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি;
পরিচয় কোথা তার?

কত শত যুগ চলি' গেল প্রভো,
দরশন নাহি পাই।
যাতনার ঐ আশ্রয়তলে
কবে দিবে মোরে ঠাঁই?
কবমেব কবে হইবে বিরতি,
ভরি' দিবে প্রাণ অচলা ভকতি,
মায়া পাশ হ'তে চির যে মুক্ত—
তাই শুধু আমি চাই।
কেন এ বাঁধন সংসার মাঝে?
তোমারেই যেন পাই।

আবেদন।

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত)

নিশীথে যখন নিখিল ভুবন
আঁধারে আবরি' থাকে,
প্রাণ মন ভরে সবে সকাতরে,
তোমারেই বুঝি ডাকে।
তেমনি আমারে প্রাণমন ভরে
ডাকিতে শিখাও, প্রভো!
ত্যজিয়ে কামনা, লাজ ও ভাবনা,
ডাকিতে শিখাও, বিভো।
স্বামি দেবতায় সতী রমণীর
যেমন মনের টান্,

বিষয় লাগিয়া বিষয়ীর মন
করে যথা আন্‌চান্‌,
সন্তানতরে জননীহৃদয়ে
অসীম যেমন স্নেহ
—তেমনি আমারে, ওগো দয়াময়,
তেমনি ভকতি দেহ!

প্রতি পলে পলে তোমা নাহি ভুলে
আমার মানস যেন,
মায়ার বাধন করিব ছেদন,
শকতি প্রদান হেন।
তেজ বল প্রীতি সহিষ্ণুতা রতি
দাও দয়া দয়াময়।
তোমার চরণে চিরদিন যেন
অচলা ভকতি রয়।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

মঠ, বেলুড়,
২।৪।১৭

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীযুক্ত বি— তোমার পত্র পাঠে সকল অবগত হইয়া তারকদা ও হরিভায়াকে শুনাইয়াছি। তোমার কার্য্যে তাঁহারা অতিশয় খুসী আছেন। তুমি তাঁহাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ভগবান্ তোমায় বল দিন, শক্তি দিন ও প্রভুপদে তোমার মন

মগ্ন হউক এইমাত্র প্রার্থনা। কৃষিজীবী লোকদের আপনার ভাই ভেবে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চল্‌বে; তাহলে দেখ্‌বে তারা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি শ্রীস্বামিজীর শিক্ষা মত নিজেকে তাহাদেরই সেবক জানিতে চেষ্টা করিও। এই চেষ্টার নাম তপস্যা। দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবই শিখাইয়াছিলেন সখা অর্জ্জুনকে গীতায়। ঠাকুর সোজা করে বলে গেলেন, ১০ বার গীতা গীতা কল্লেই ত্যাগী এসে যায়—ইহাই হ'ল গীতার সার। হও নিষ্কাম কর্ম্মী। হও পূর্ণ অনাসক্ত। কর্ত্তা হয়েও নিজেকে অকর্ত্তা জান।—র চিঠি বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ, উহা বাঙ্গালা করে সবাইকে শুনিও। ভালবাসায় ভাসিয়ে দাও ও দেশ। সকল কাজই শ্রীশ্রীঠাকুর কচ্চেন, বিশ্বাস কর্ব্বে। রতনকে যত্ন কর্ব্বে। ভালবাসায় জগৎকে জয় কর—ইহাই রামকৃষ্ণ-মিশন। নিজে খুব সাবধানে থাক্‌বে। সর্ব্বদা প্রভুকে প্রাণমনে ডাকবে। ঠাকুরের ভোগ না দিয়ে বৃথা অন্ন কেন গ্রহণ কর্ব্বে? আমাদের ভালবাসা জান্‌বে ও সকলকে জানাবে। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৪।৪।১৭।

পরম স্নেহভাজনেষু—

তোমার সব চিঠিই পাইয়াছি। এরই মধ্যে অত উতলা হচ্চ কেন? ঠাকুর একটি গান গাহিতেন—"মন কর পণ প্রাণাবধি, ত্যজ মান অপমান জ্যান্তে মর, সহজ মানুষ ধর্ব্বি যদি"। দেখ, বাবা, যদি কোন কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে; নতুবা ঠাকুরের নাম নিয়ে কেবল একটা হৈ চৈ করে এই মহামূল্য জীবনটা বৃথা নষ্ট করা কি তোমার মত আক্কেলবন্ত লোকের সাজে? যখন লেগেছ তখন নিশ্চয় ওটাকে পাকা করে তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড় নাই চাষার ক্ষেত্রে জল আনার

বিষয়! কি রোখ! কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ যে জলন্ত জীবন্ত ব্যাপার! ঐ উপদেশগুলো কি কেবল পুস্তকেই থাক্‌বে, না কাজে লাগাতে হবে? তোমাদের যে এক একটা আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে। যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই যে তোমাদের প্রভুর শিক্ষা। এসেছ যখন এ ঘরে, নাম যদি লিখিয়ে থাক এ খাতায়, তখন ত আর পেছুলে চল্‌বে না, চাঁদ? ঐস্থানে বসে কেবল একমনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা প্রভুকে ডেকে যাও—সব পাবে, সব পাবে—কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। দেখ্‌চ না, ভগবৎশক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান!

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামিজীর সম্বন্ধে পড় নাই কি, কেমন করে নিঃসম্বলে একা বন্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাজ করে এলেন? একি সত্য না স্বপ্ন? তোমরা কি সেই মহাপুরুষের অনুসরণ কর্ত্তে প্রস্তুত? নতুবা যাও, যেমন সহস্র সহস্র সাধু এই ভারতে কেবল পেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! * * * যদি তোমার ও কাজ ভাল না লাগে যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়

স্নেহাস্পদেষু— ৩।৩।১৭

মা— তোমার চিঠি পাড়লাম। র নিকট নিকট হইতে দীক্ষা লইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানবদেহ ধারণ।

ভা - এ আশ্রমস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রমস্থাপনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্তহৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা"—শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয়, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়ে

সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর্‌বার চেষ্টা কর। সৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বর—জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচ্‌বে তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, এইটী উপলব্ধি কর্‌বার জন্য যে কর্ম্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, বন্দনা, রোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপা লাভ হয়। পবিত্রতাময় প্রীতিও ভালবাসায় পূর্ণ হ'য়ে যাক্ তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত কর। আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক্ হ'য়ে যাক্ ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানিবে না যে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যা মোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে

শ—কে বিশেষ করে পড়াশুনা কত্তে বল্‌বে অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক—তাকে বুঝিয়ে দেবে, মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না, বাবা। ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ধন? ধর্ম্মকর্ম্ম কি ছেলে মানুষি ব্যাপার? শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য, মানের জন্য, অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা। আর ধর্ম্মলাভের জন্য, শাস্ত্রপাঠের জন্য, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা। ইহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছা হইলে এখানে আসিয়া থাকিতে পার; তবে আজকাল অনেক লোক মঠে, তাই থাকিবার কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে।

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা, সেজন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না। কিছু ভয় নাই—সব ঠাকুর করিয়া দিবেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

স্নেহভাজনেষু -　　বেলুড়মঠ।

শ্রীমান্— তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যারা ভগবৎ পথের পথিক হতে চায় তারাই আমাদের পরম আত্মীয়, চিরবন্ধু, নিত্যসহচর। তোমরা অসঙ্কোচে ঠাকুরের নাম করে যাও— উহাতেই শান্তি, ভক্তি, মুক্তি পাবে। যারা —র কৃপা পেয়েছে তারা নিত্যমুক্ত - তারাই শুদ্ধ পবিত্র—তারাই পুণ্যবান্।

শ্রীশ্রীপ্রভুপদে মন বেধে কাজ করে যাও। তিনিই সৎ মনবুদ্ধি দিয়ে ঠিক পথে চালাবেন। সংশয়বুদ্ধিই সয়তান, উহাকে সর্ব্বদা দূর কত্তে হবে। নামে বল বলে বলীয়ান হয়ে দেও তাড়া। রাম নামে ভূত পালায়, ঠাকুরের নামে সয়তান, কাম ক্রোধ পালাবে।

আমরা ভাল আছি। মায়ের শনবার ভক্তেরা টাঙ্গাইলের নিকট ঘারিণ্ডা নামক পল্লীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা কচ্চে। * * * তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী— প্রেমানন্দ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কনোজকুমারী বা সংযুক্তা (ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীমণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। নাট্যকার স্বনামধন্য কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের বংশধর এবং নাটকখানি পরম শ্রদ্ধেয় গুপ্ত কবিকেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

প্রথমতঃ নাটকের আকার দেখিয়াই আমরা একটু ভড়কাইয়াছিলাম। তারপর মনে হইয়াছিল, গ্রন্থখানি যদি "আকার-সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" হয় তাহা হইলেই ত গেছি! এই বিপুল গোলক-ধাঁধার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাভ হইবে কেবল আগম ও নির্গম, কিন্তু তাহা নহে। এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা যে নির্ম্মল কাব্যরসের আস্বাদটুকু পাইয়াছি তাহা পরম লাভ বলিয়া মনে করি এবং অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় পুরস্কৃত হইবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কবিভূষণ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু বি, এ, এই একই বিষয় অবলম্বনে "পৃথ্বীরাজ" নাম দিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাকাব্য ও এই দৃশ্য কাব্যের আখ্যান-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং দৃশ্যকাব্যেই ঐতিহাসিক তথ্য সমধিক রক্ষিত হইয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন—চাঁদকবি রচিত "পৃথিরাজ রাসো" "দড়পিড়ি" এবং মহাত্মা টড্ প্রণীত "রাজস্থান"। মোগল সম্রাট্ আকবরের ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলের ন্যায় চাঁদকবিও স্বয়ং ঘটনার রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেতা। উভয়েরই বর্ণনা অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট, কিন্তু অমূলক নহে।

মণিবাবুর নাটকের প্রধান ত্রুটি এই যে, তাহা ব্যাপক এবং চরিত্রবহুল। দর্শক ইহাতে উদ্‌ভ্রান্ত এবং ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়ে; নাট্যকার নিপুণহস্তে যে ছায়ালোকসম্পাতে চরিত্রের পুষ্টি এবং ঘটনার ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছেন সে কলাকৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়। কাটিলে ছাঁটিলে নাটকখানিকে ছোট করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আর এক ক্ষতি। নাটক হইলেও এ পুস্তকের বহুল স্থলে মহাকাব্যের যে মনোরম উচ্ছ্বাস আছে দর্শককে তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হয়।

এই নাটকের প্রধান অপ্রধান সকল চরিত্রই সুরক্ষিত, সুরঞ্জিত এবং সুস্পষ্ট। ইহার আখ্যানবস্তুর সূচনা, সমাবেশ এবং সমাপ্তি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চিত্তগ্রাহী। ইহার ভাষার তেজ এবং প্রাণস্পন্দন আছে—গুরুবর্ণনায় যেমন গম্ভীর, হাস্যরসোদ্দীপন স্থলে তেমনি চটুল। ৪২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে দোষ বাহির করা যায় না, এমন নহে। কিন্তু সমালোচনায় সে মাক্ষিকাধর্ম্ম অবলম্বনের পক্ষপাতী আমরা নহি।

পরিশেষে বক্তব্য, নাট্যকার যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, অনুসন্ধান ও গবেষণা সহকারে এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ-নিবারণকার্য্য।

বাঁকুড়া ও মানভূম।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে বাঁকুড়া এবং মানভূম জিলার অন্নকষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহার উপর আবার ভয়ানক জলকষ্ট। শীঘ্র যদি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে অন্নকষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও জলাভাবেই লোকেরা দেশ ত্যাগ বা প্রাণ ত্যাগ করিবে। আমাদের মানভূমের সেবকবৃন্দ সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"* * * শতকরা ৯০ জন লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত। তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এতদিন কুল ছিল, সেইজন্য অবস্থার ভীষণতা বোধ করা যায় নাই—এখন খাবার তাহাও নাই। যাহাদের মহুয়ার গাছ আছে, তাহারা যে অল্প পরিমাণ ফল জন্মিয়াছে তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছি লোকেরা খাদ্যাভাবে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, চলৎশক্তিহীন, শয্যাশায়ী—কোন কোন লোক অনাহারে সংজ্ঞাহীন। আমরা যাইয়া খাদ্যাদির ব্যবস্থা না করিলে সেই দিন কি পরের দিন মরিয়া যাইত, ইহাতেই যে বাঁচিবে তাহারও কোনও সম্ভাবনা নাই। * * *"

নিম্নে ২৫শে জানুয়ারী হইতে ২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মানভূম এবং বাঁকুড়ার সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মানভূম (বাগ্দা কেন্দ্র হইতে)।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	মন—সের
১১	১৯৬	৯৸২
১১	১৯৯	১০/৮
১১	২০১	১০।৮
১৭	৪৩৪	২১॥৮

১৮	৪৬৫	২৩।০
১৯	৫২৪	২৬/৮
১৯	৫৩৫	২৭/০
১৯	৫৫৬	৩৩/০
১৯	৫৪৬	৩২৸২

বাঁকুড়া (ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে)।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	মন—সের
২৪	১৮৭	৯৸৮
২৪	২০১	১৫/৫
২৫	২২০	১১॥২
২৫	২২০	১১৸২
২৬	২৪৯	১০॥৯
২৬	৮৮১	১৪।৯

এতদ্ব্যতীত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাগদা কেন্দ্র হইতে ১৮১ খানা এবং ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে ১৪ খানা বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। যথেষ্ট অর্থাভাব বশতঃ আমরা আবশ্যক মত সাহায্য করিতে পারিতেছি না। আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ আশু অর্থ এবং বস্ত্র সাহায্য করিয়া তাঁহাদের দুঃস্থ ভ্রাতাভগিনীগণকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন। প্রেরিত অর্থ বা বস্ত্র নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণমিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

বৈষ্ণব-দর্শন

নারায়ণ-তত্ত্ব।

(অধ্যাপক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(৩)

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের (৮২।৫-৬) এই বাণী উপদেশ করিতেছে—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড তাহা কি? দেবগণ যে অণ্ড মধ্যে অবস্থিত তাহা জলমধ্যে ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন।

জন্মরহিত যিনি তিনিই নারায়ণ পদবাচ্য হইলেন; তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড তাহা ব্রহ্মা হইলেন। নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুতঃ নরের পুত্র। জল ব্রহ্মের প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া পরম পুরুষের নাম নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনু—১।১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন যে, নর বলিলে পরমাত্মাকে বুঝায়। পরমাত্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, সুতরাং প্রথমে নর হইতে জাত বলিয়া জলের নাম হইয়াছে 'নারা'। Bibleএর Genesisএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠিক এই ভাবের কথা আছে। সেখানে লেখা আছে—

1. "In the beginning God created the heaven and the earth.

2. And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep: and the spirit of God moved upon the face of the waters."

বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অধ্যায়) বলেন যে, পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন; অতঃপর তিনি জলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে বিষ্ণুপুরাণ মনুর উল্লিখিত বচনই অবিকল তুলিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও প্রায় তাহাই করিয়াছে, কোথাও বা একটু আধটু বদলাইয়াছে। কেবল মৎস্য, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত বচনের ভিন্নরূপ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণে প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাদৌ স বিনির্গতঃ
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নাপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচী।
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥

সৃষ্টির আদিতে যখন সেই পুরুষ অণ্ড বিভেদ পূর্ব্বক বিনির্গত হইলেন, তখন তিনি আপনার অয়নের সমিচ্ছু হইয়া জল সৃষ্টি করিলেন—শুচি যিনি তিনি শুচিরই সৃষ্টি করিলেন এই সলিল-সমষ্টির মধ্যে তিনি নিজ স্বরূপেরই সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তিনি সহস্র বৎসর থাকিয়া পুরুষোদ্ভব জলরাশি হইতে নারায়ণ নাম লাভ করেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে (১৪।১৪) নারায়ণের ব্যাখ্যা অন্যরূপেও

প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমি যখন সমস্ত দেহীর আত্মা তখন কি তুমি নারায়ণ নও? নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ এবং অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাহার আশ্রয় সেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্দের বাচ্য। তুমি অধীশ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তক বলিয়াও নারায়ণ। কারণ, নারের অর্থাৎ জীব-সমূহের বা তত্ত্ব-সমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে নারায়ণ বলা যায়। তুমি নারায়ণ—কেননা, তুমি যে নিখিল লোককে জানিতেছ—সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছ—তুমি যে নিখিল লোকের সাক্ষী। আবার তুমি নারায়ণ, যেহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাহা হইতে সঞ্জাত যে জল এই দুইটী তোমার আশ্রয়। সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমার অঙ্গ বা মূর্ত্তিবিশেষ; তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নন। তবে সেই নারায়ণের তাদৃশ পরিচ্ছন্নতা সত্য নহে—ইহা তোমার লীলা অর্থাৎ নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তি সত্য, উহা মায়িক নহে।

নারায়ণস্ত্বং নহিসর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

ভাগবতের এই যে নির্দ্দেশ, ইহা ভাগবতের নিজস্ব বা নূতন ব্যাখ্যা নয়। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে নর অর্থাৎ আত্মা হইতে তত্ত্বসকল জাত হয় এবং আত্মাতেই প্রলীন হয়, তাই তাঁহার নাম নারায়ণ।

নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

বোধায়নশ্রৌতসূত্রে আছে—

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

নারায়ণ সমস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুর ভিতর বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুতেই বিরাজিত আছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে (১০৯ অধ্যায়) নারায়ণ শব্দের দুইটী অভিনব অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে।

প্রথমটী হইতেছে—

নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যমযনং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
ততোজ্জ্ঞানং ভবেদ্ যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

নার বলিতে মোক্ষ বুঝিতে হইবে এবং অয়ন শব্দের অর্থ করিতে হইবে অভীপ্সিত জ্ঞান। যাহা হইতে এই উভয় বিষয়ক জ্ঞান হয় তিনিই নারায়ণ বলিয়া কথিত হন।

এই গেল এক ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যা হইতেছে—

নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

যাহারা কৃতপাপ—পাপী, তাহারা নারাশব্দবাচ্য। অয়ন শব্দের অর্থ গতি। যাহা হইতে পাপীর গতি—মুক্তি হয়, তাহার নাম নারায়ণ।

পুরাণে এইরূপে নারায়ণ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনু জলকে নারায়ণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে হরিবংশ মনুর সহিত একমত। মনুর ব্রহ্মা এবং হরিবংশের হরি প্রথমে জলে ভাসিতেছিলেন। ব্রহ্মা ও হরি উভয়েই এই হিসাবে নারায়ণ। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণের বচনের সহিত মনুর বচনের ঐক্য আছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রে সর্পশয্যায় শায়িত। কোন কোন মতে এই নারায়ণের স্বর্গ হইতেছে শ্বেতদ্বীপ। কথাসরিৎসাগরে এক স্থানে লিখিত আছে যে, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধি কর্ত্তৃক শ্বেতদ্বীপে হরির নিকট নীত হইয়াছিলেন। হরি তখন শেষ নাগের গাত্রোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন; নারদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত ছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য স্থলে উল্লিখিত আছে যে, কতিপয় দেবতা শ্বেতদ্বীপে গিয়া দেখিলেন, হরি রত্নমণ্ডিত অট্টালিকায় সর্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৮৮-৮৯ অধ্যায়) প্রলয়কালের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে ঃ—সমস্তই জলে জলময়, আর কিছুই ছিল না ; কেবল একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অস্তিত্বমাত্র ছিল। সেই বৃক্ষের এক শাখার উপরিভাগে এক খট্টার উপর এক বালক শয়ন করিয়া ছিল। মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, বালক মুখব্যাদান পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়কে গিলিয়া ফেলিল। মার্কণ্ডেয় বালকের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া এক নূতন বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎপরে বালক মার্কণ্ডেয়কে উদ্গার করিয়া ফেলিল। তখন মার্কণ্ডেয় আবার চতুর্দ্দিক্ জলময় দেখিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল, আমিই জলকে "নারায়ণ" নামে অভিহিত করিয়াছি। জলই আমার আশ্রয়, সেই জন্য আমি নারায়ণ নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় অনেক কালের ঋষি, তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিয়া পুরাকালের এই কাহিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আর উপদেশ করিয়াছিলেন, হে যুধিষ্ঠির, তোমার আত্মীয় জনার্দ্দনই সেই নারায়ণ। এই আখ্যায়িকার মার্কণ্ডেয়ের সহসা আবির্ভাবের ব্যাপারটী ভাল বোঝা গেল না। যখন কিছুই ছিল না তখন মার্কণ্ডেয় কোথা হইতে আসিলেন? যাহা হউক, নারায়ণের সর্ব্ব প্রথমে সলিলাশ্রয়ের কথাটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। মেধাতিথি ও গোভিল উভয়েই বলিয়াছেন, "আপো নরাঃ"—জলসমূহের নামই 'নরাঃ'। পরম পুরুষের অপর একটী নাম যে নর তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতের একস্থানে (১৩।১৪৯।১৯) লিখিত আছে— "জহ্নুর্নারায়ণো নরঃ"—ভাষ্যকার ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, "নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নারাণি তানি কার্য্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ।"—অর্থাৎ নর শব্দে আত্মা বুঝাইতেছে। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহার নাম 'নারা'। এই নারা কারণস্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া নারায়ণ সংজ্ঞা হইয়াছে।

যথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়া নারায়ণের অর্বাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পাইয়াছি তাহা নিবেদিত হইল। এইবার নারায়ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ, মহাকাব্য, পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আজও তাহার সেই নারায়ণ নাম তাহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। বেদের খুব প্রাচীনভাগেও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ-নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয় পূর্ব্বে এক তত্ত্ব ছিলেন না। কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৩।৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুষ-নারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্রসত্র করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন। তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্ম-প্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠক, ১১শ অনুবাকে নারায়ণ বিরাট্‌রূপ পরব্রহ্ম, বিশ্বাত্মা, পরোজ্যোতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥ ঋক্ ১
বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥ ঋক্ ২
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥ ঋক্ ৩
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরোজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ নরঃ॥ ঋক্ ৪

মহানারায়ণ উপনিষদে (১১।৪-৫) এই একই কথা দ্যোতিত হইয়াছে।

সুবালোপনিষৎ (৭) উপদেশ করিতেছেন—

"যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্"…"যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্নবেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।"—"যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে পরিচালিত করেন"—"মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য অলৌকিক অদ্বিতীয় দেবতা—নারায়ণ"।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ, তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" (তৈত্তিরীয়, ৬।২)—"তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন।" এই শ্রুতিতে নারায়ণকে আত্মা এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহকে তাঁহার দেহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহানারায়ণোপনিষৎ (৩।১।১—১২) বলিতেছেন—

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বচনের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎকারণবাদী

বাক্যটী সাংখ্যের প্রধানাদি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ নয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে স্থির হইল—সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত দোষসংস্পর্শশূন্য, যাঁহার অবধি নাই, যিনি নিরতিশয় এবং অশেষ কল্যাণগুণবারিধিস্বরূপ, তিনিই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম। অবশ্য জিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্মে মুখ্য ঈক্ষণ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীবাদরায়ণের শ্রুতি সমুদয়ের সাহায্যে এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুবালোপনিষদে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে—এমন কি, বৃহদারণ্যকে যে তত্ত্বগুলি উল্লিখিত হয় নাই সেগুলিকেও এই উপনিষৎ ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার আত্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুবালোপনিষৎ উপদেশ করিতেছেন—'বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অহঙ্কার যাঁহার শরীর, চিত্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষয় যাঁহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।' এখানে মৃত্যু বলিতে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মক তত্ত্বসকল ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে—যেমন পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়-সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সকল আবার ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতা পরমাত্মায় একীভূত হয়।' এই উপনিষদে এই পদার্থগুলি নারায়ণের শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (১৮২।১) ভীষ্মকে প্রশ্ন করা হয়—স্থাবর-জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? এবং প্রলয়কালে কাহাকে আশ্রয় করে? উত্তরে ভীষ্ম বলেন—

"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।"

অনন্তরূপী সনাতন নিত্য নারায়ণই জগন্মূর্ত্তি অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।

মহোপনিষদে আছে—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নি র্ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়ানি"—(১।১)

অগ্রে 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই দ্যাবা-পৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না; তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না; তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর তাঁহার একটী কন্যা ও দশটী ইন্দ্রিয়' উদ্ভূত হইল। বৃহদারণ্যকও (৩।৪।১১) এই কথার একরূপ পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বা ইদমেক-মেবাগ্র আসীৎ" 'অগ্রে এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন'; তাহার পর তিনি তৃপ্তিলাভ না করিয়া সংকল্প করিলেন, "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য ৬।২।১)—'আমি বহু হইব, জন্মিব'—অমনই, 'ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রো পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ' (বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১১) এই দেবক্ষত্রিয়গণ উত্তমরূপে তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র বাসুদেবের কথা আছে। অন্যত্রও কোথাও কোথাও বাসুদেব ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চ্চনার কথা বিশেষ জানা যায় না। বাসুদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্বলাভ করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" (১০।১।৬)

মহাভারতের প্রতিপর্ব্বের আদিতে নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কারপূর্ব্বক উক্ত শাস্ত্রপাঠের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাভারত রচনাকালে নরনারায়ণ বিশেষভাবেই পূজিত হইতেন। বনপর্ব্বে (১২।৪৬,৪৭) জনার্দ্দন অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অজেয়। তুমি নর ও আমি নারায়ণ। আমরা সেই ঋষি নর-নারায়ণ। আমরা উপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে আসিয়াছি। হে পার্থ। তোমাতে আমাতে কিছুই প্রভেদ নাই। কেহই আমাদিগকে ভিন্ন বুঝিতে সমর্থ নয়।" ঐ পর্ব্বেরই ত্রিংশ অধ্যায়ে (১ম শ্লোক) দেবাদদেব শিব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বজন্মে তুমি নর ছিলে ও নারায়ণের সহিত একত্র বিরাজ করিতে। তোমরা উভয়ে বদরিকাশ্রমে বহুসহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলে।" উদ্যোগপর্ব্বে (৪৯ ১৯) কথিত আছে, "বাসুদেব ও অর্জ্জুন, এই মহাবীরদ্বয় সেই প্রাচীনদেব নর-নারায়ণ।"

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণ ও বাসুদেবের অভিন্নতা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে নারায়ণ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ তাঁহার চারি মূর্ত্তি। তন্মধ্যে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বনপর্ব্বেও (৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই বিবরণ পাওয়া যায়। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ ধর্ম্মের পুত্র- অহিংসা তাঁহাদের মাতা। ধর্ম্মের সহিত অহিংসার মিলন, ইহাকে ভারতীয় ধর্ম্মের এক নূতন যুগ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। যাগযজ্ঞে পশুহিংসায় ক্রমে বিতৃষ্ণা হওয়ায় এক নবীনভাব মানবমনে অঙ্কুরিত হওয়া বিচিত্র নয়। অহিংসা পরমোধর্ম্ম—এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মমতেরই যে এক বিশেষত্ব তাহা নহে। এই ভাবটী বৌদ্ধধর্ম্মে

প্রণালীবদ্ধভাবে প্রচলিত হইবার বহুপূর্ব্বে মানবমনকে আলোড়িত করিয়াছিল। এইভাব পরিশেষে ভারতীয় মানব-সমাজের একাংশকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনটী শাখাধর্ম্মে পরিণত হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারিটীতে চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার।

বৃহদারণ্যকভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহবাদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত ভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহবাদ অগ্রাহ্য। আনন্দগিরি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শাঙ্করমত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের) প্রতিপাদন প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উথাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেননা, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদন-প্রণালী। যথা পৌষ্করসংহিতায়— 'যাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র।' সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনায় যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্বিধগুণ-সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন— ভগবদ্বিভব অর্চ্চনায় প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব

শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময়দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম।"* পৌষ্করসংহিতাও বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্য নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ শরীরধারণরূপ জন্ম প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরম-পুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, একান্তিক ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেব ধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরম স্রষ্টা তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই মূর্ত্তি চতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মণ্ডলীপুত্র

* পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বাঙ্গালা তর্জ্জমা।

মতবাদে এই ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহ-পূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি-সূত্রে (৪,৩,৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দ্দেশে 'বাসুদেব', 'বলদেব' শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্ব-সমাসে 'সঙ্কর্ষণ বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর-পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে ক্ষোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুইশত বৎসরের প্রাচীন। দুঃখের বিষয় শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারিদিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা ক্ষোদিত আছে তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, Diyaর পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন; কোন রাজনীতিক কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Antalikita হইতে পূর্ব্ব মালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই ক্ষোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-

সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন। সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক্ নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একস্থলে (৭।৪-৫) ভগবান্ তাঁহার একাধিক অষ্টপ্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

গীতোক্ত জীব ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত অনুগীতায় দশম অধ্যায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্রতত্ত্বের সহিত চাতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্য্যু—বলির জন্য উদ্গাতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাঁহারা নারায়ণকে প্রকৃতরূপে বুঝেন তাঁহাদের দ্বারা এতৎ সম্পর্কে ঋঙ্মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ যাঁহার নিকট পূর্ব্বে তাঁহারা জীব বলি দিতেন। এ বিষয়ে সামগানও গীত হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণও প্রদত্ত

হইয়াছে। সেই নারায়ণ-দেবকে উপলব্ধি কর, কেননা তিনিই সর্ব্বভূতাত্মা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও চতুর্ব্যূহতত্ত্ব স্বীকার করিয়া স্তুতি করিতেছেন—

"নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।"

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভট কুমারিলের সময় শৈবমত ও ব্যূহবাদ উভয়ই প্রকৃষ্টরূপ সমুন্নত ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বৈষ্ণব দর্শনের ব্যূহবাদ বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কি ফল হইবে? তাহাতে আমাদের লাভ কি? ধর্ম্ম কি মানবজীবনের একটী অঙ্গস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখে সান্ত্বনা ও বিপদে সাহায্য প্রদান করিবে? আর মানবহৃদয় স্বভাবতঃই কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে যে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চায় তাহারই বা কি হইবে? সে সমস্তই বজায় থাকিবে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাবও থাকিবে, পরন্তু উহা শ্রেষ্ঠতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। নির্গুণ ব্রহ্ম উহাকে আরও দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, নির্গুণ ব্যতীত সগুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যদি বল, এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক ব্যক্তিবিশেষ আছেন, যিনি শূন্য হইতে কেবল মাত্র স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ

করা যায় না—এরূপ ব্যাপার হইতেই পারে না। কিন্তু যদি আমরা নির্গুণের ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সগুণের ধারণাও করিতে পারিব। এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই এক নির্গুণের বিভিন্ন পাঠান্তর মাত্র। যখন আমরা ইহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, তখন ইহাকে জড়জগৎ বলি। যদি এমন কোন প্রাণী থাকে যাহার পাঁচটীর বেশী ইন্দ্রিয় আছে, তাহা হইলে সে উহাকে অন্য একটা কিছু দেখিবে। যদি আমাদের কেহ বৈদ্যুতিক স্পন্দন গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি আবার এই জগৎকে অন্য একরূপ দেখিবেন। সেই এক সত্তাই নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে—এই সকল বিভিন্ন জগতের ধারণা তাহারই বিভিন্ন পাঠান্তর মাত্র এবং মানবমস্তিষ্ক সেই নির্গুণ স্বরূপের যতদূর উচ্চ ধারণা করিতে পারে, তাহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং এই চেয়ারখানি যতদূর সত্য অথবা এই পৃথিবী যতদূর সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততদূরই সত্য—তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। ইহা নিত্য সত্য নহে। অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর সেই নির্গুণ ব্রহ্মই এবং সেইজন্য ইহা সত্য; যেমন, আমি মানুষ হিসাবে সত্যও বটে আবার সত্য নয়ও বটে। আপনারা আমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, আমি যে ঠিক সেইরূপই তাহা সত্য নহে; আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আপনারা আমাকে যাহা মনে করিতেছেন আমি তাহা নহি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আপনারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। কারণ, আলোক, বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন, আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তন, এবং আমার ভিতরকার নানা প্রকারের গতি—এই সমস্ত মিলিয়া আপনারা আমাকে যেমনটী দেখিতেছেন তেমনটী করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন একটীর পরিবর্ত্তন হইলেই আমারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আপনারা একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আলোয় ফটোগ্রাফ তুলিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ, আপনাদের ইন্দ্রিয় সমূহের সম্পর্কে আমাকে যেরূপ দেখাইতেছে, আমিও সেইরূপ হইতেছি। তথাপি, এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও এমন একটা অপরিবর্ত্তনীয়

কিছু রহিয়াছে, যাহার এইগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র—উহা সেই নিরাকার আমি, যাহা হইতে সহস্র সহস্র সাকার 'আমি'রূপ ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছে। আমি শিশু ছিলাম, আমি বালক ছিলাম, আবার আমি বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। জীবনের প্রত্যেক দিনে আমার শরীর ও চিন্তা বদলাইয়া যাইতেছে—কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উহাদের সবটা মিলিয়া যাহা হয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ইহাই সেই নিরাকার 'আমি' এবং এই সমুদয় বিকাশ যেন তাহার অংশস্বরূপ। সেইরূপ, আমরা জানি,সমষ্টি জগৎ স্থির-গতিহীন; কিন্তু এই জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিষটী গতিশীল, প্রত্যেক জিনিষটী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেছে; সেই সঙ্গে আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, এই সমুদয় বিশ্ব সমষ্টি হিসাবে স্থির গতিহীন; কারণ, 'গতি' শব্দটী আপেক্ষিক। এই চেয়ারখানির সহিত তুলনায় আমি নড়িতেছি, কারণ,চেয়ারখানি স্থির রহিয়াছে অন্ততঃ দুইটী জিনিষ না থাকিলে গতি সম্ভব হয় না। সমস্ত জগৎকে একটী জিনিষ ধরিয়া লইলে আর উহার গতি থাকে না; কাহার তুলনায় উহা নড়িবে? অতএব চরম ব্রহ্মতত্ত্বটী অপরিবর্ত্তনীয় ও নিশ্চল, এবং যত কিছু গতি ও পরিবর্ত্তন তৎসমুদয়ই এই প্রাতিভাসিক—সসীম জগতের। সেই সমষ্টিই নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে যিনি জগতের স্রষ্টা পাতা, যাঁহার নিকট আমরা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি, সেই সগুণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যষ্টিই সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তর্গত। এরূপ সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই প্রকার সগুণ ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্মের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তুমি আমি উহার অতি নিম্নতম বিকাশ, আর সগুণ ঈশ্বর, আমরা উহার যতদূর উচ্চ বিকাশ ধারণা করিতে পারি তাহাই। কিন্তু তুমি বা আমি কখনও সগুণ ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' বাক্যের লক্ষ্য সগুণ ঈশ্বর নহে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে। এক তাল মাটী হইতে একটা প্রকাণ্ড হাতী তৈয়ার করা হইল এবং সেই একই মাটী হইতে একটা ছোট ইঁদুরও তৈয়ার করা হইল। সেই মাটীর ইঁদুরটী

কি কখনও মাটীর হাতীটীর সমান হইতে পারিবে? কিন্তু উহাদের উভয়কেই জলে রাখিয়া দাও, দেখিবে, উভয়ে একই মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্তিকা হিসাবে উভয়েই এক, কিন্তু ইঁদুর ও হাতী হিসাবে উহাদের মধ্যে চিরকাল ব্যবধান থাকিবে। অনন্ত বা নির্গুণ তত্ত্ব এই দৃষ্টান্তোক্ত মৃত্তিকা সদৃশ আমরা ও জগতের শাসনকর্ত্তা স্বরূপতঃ এক। কিন্তু ব্যষ্টি প্রকাশ হিসাবে আমরা তাঁহার নিত্যদাস—তাঁহার চির উপাসক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সগুণ ঈশ্বর বজায় রহিয়াছে, এই আপেক্ষিক জগতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটী বজায় রহিয়াছে এবং ধর্ম্মও উৎকৃষ্টতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব সগুণকে জানিতে হইলে আমাদের অগ্রে নির্গুণকে জানা দরকার। আমরা দেখিয়াছি, যুক্তির নিয়মানুসারে বিশেষ ঘটনা কেবল সাধারণ ঘটনা দ্বারাই জানা যায়, সেইরূপ মানুষ হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা সর্ব্বোচ্চ সাধারণতত্ত্ব—নির্গুণ তত্ত্বের মধ্য দিয়া জানা যায়। প্রার্থনাদি সমস্তই থাকিবে, কেবল তাহাদের উদ্দেশ্য আরও ভাল হইয়া যাইবে। প্রার্থনা সম্বন্ধে সেই সমস্ত অর্থহীন ধারণা—প্রার্থনার অতি নিম্ন ভাবসমূহ—যাহাতে আমাদের মনের সকল প্রকার তুচ্ছ বাসনাকে ভাষায় ব্যক্ত করা হয় মাত্র—সেগুলি হয়ত আর থাকিবে না। কোন যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মেই ভগবানের নিকট কামনা করা চলে না; তবে দেবতাদের নিকট কামনা করা চলে বটে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। রোমানক্যাথলিকগণ মহাত্মাগণের নিকট কামনা করেন; তা বেশ, কিন্তু ভগবানের নিকট কামনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। ভগবানের নিকট একটু বাতাস, এক পশলা বৃষ্টি, বাগানে প্রচুর ফলোৎপাদন ইত্যাদির জন্য কামনা করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মহাত্মাগণ এক সময়ে আমাদেরই মত ক্ষুদ্র প্রাণী ছিলেন—তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু যিনি নিখিল জগতের অধীশ্বর তাঁহার নিকট আমাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য 'দেহি' 'দেহি' করা এবং বাল্যকাল হইতে বলা—"হে প্রভু, আমার মাথা ধরিয়াছে, তুমি উহা ছাড়াইয়া দাও" ইহা বড়ই হাস্যজনক।

এই জগতে লক্ষ লক্ষ ভাল লোক মারা গিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই এখানে রহিয়াছেন, তাঁহারা দেবতা বা এঞ্জেল হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের সাহায্য করুন। কিন্তু ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা! কখনই নহে। তাঁহার নিকট আমরা আরও শ্রেষ্ঠ জিনিষের জন্য গমন করিব। "উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।" গঙ্গাতীরে বাস করিয়া যে ব্যক্তি জলের জন্য কূপ খনন করে সে মূর্খ, অথবা যে ব্যক্তি হীরার খনির নিকটে বাস করিয়া কাচখণ্ডের নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন করে সেও মূর্খ।

বাস্তবিক, যদি আমরা অনন্ত করুণা ও অনন্ত প্রেমের আকর ভগবানের নিকট তুচ্ছ ঐহিক বিষয়ের কামনা করি, তবে বলিতে হইবে, আমাদের মত মূর্খ আর নাই। তাঁহার নিকট আমরা জ্ঞান, বীর্য্য, প্রেম এই সমস্ত প্রার্থনা করিব। কিন্তু যতদিন আমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও দাসসুলভ অধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সগুণ ঈশ্বরোপাসনার এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ভাব থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা খুব উন্নত তাঁহারা এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন না—আপনাদের জন্য কোন কিছু প্রার্থনা করা- কোন জিনিষ চাওয়াটাই তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবটী প্রবল রহিয়াছে—"নাহং নাহং"—আমি নই, হে ভ্রাতঃ, তুমি। এই সকল ব্যক্তিই নির্গুণ ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে নির্গুণ ঈশ্বরোপাসনা কি প্রকার তাহা বলিতেছি। "হে প্রভু, আমি অতি দীনহীন, আমাকে কৃপা কর" এবম্বিধ দাসভাব তথায় নাই। আপনারা সেই পুরাতন পারসিক কবিতার ইংরাজী তর্জ্জমা পড়িয়া থাকিবেন—"আমি আমার প্রিয়তমের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আমি উহাতে আঘাত করিলাম এবং ভিতর হইতে একটী স্বর শুনিতে পাইলাম—'কে তুমি?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আমি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম, আমাকে সেই একই প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করা হইল এবং আমিও সেই একই উত্তর দিলাম। কিন্তু দ্বার খুলিল না। আমি তৃতীয়বার আসিলাম এবং সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল। আমি উত্তর দিলাম—'প্রিয়তম, তুমিই আমি।' নির্গুণ ঈশ্বরকে সত্যের দ্বারা উপাসনা করিতে হইবে—সত্য কি? আমিই তিনি এই জ্ঞান। যখন আমি বলি, আমি তুমি নই, তখন মিথ্যা বলা হয়। যখন আমি বলি, আমি তোমা হইতে পৃথক্ তখন আমি ভয়ানক মিথ্যা কথা বলি। আমি এই বিশ্বের সহিত এক—এক হইয়াই জন্মিয়াছি। আমি যে বিশ্বের সহিত এক এ জ্ঞান আমার ইন্দ্রিয়গণের স্বতঃসিদ্ধ। আমি আমার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত বায়ুর সহিত এক, উত্তাপের সহিত এক, আলোকের সহিত এক, নিখিল বিশ্বাত্মার সহিত অনন্তকালের জন্য এক—যাঁহাকে 'বিরাট্' নামে অভিহিত করা হয়, যাঁহাকে ভুলক্রমে এই জগৎ বলিয়া মনে করা হয়। কারণ, ইহা তিনি ব্যতীত অন্য কিছু নহে, যিনি সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে চিরন্তন দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া 'আমি আছি' বলিতেছেন—যিনি মৃত্যুহীন, নিদ্রাহীন, সদাজাগ্রত, অবিনাশী—যাঁহার মহিমা কখনও ম্লান হয় না—যাঁহার শক্তি কখনও প্রতিহত হয় না, আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন—'সোঽহমস্মি'। ইহাই নির্গুণের উপাসনা। আর ইহার কি অদ্ভুত ফল দেখা যাউক। ইহা মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। বল—বলই একমাত্র জিনিষ, আমাদের জীবনে যাহার এত অভাব। কারণ, যাহাকে আমরা পাপ ও দুঃখ বলি তাহাদের একমাত্র কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা হইতেই অজ্ঞান আসে এবং অজ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহা আমাদিগকে সবল করিবে—তখনই আমরা দুঃখকষ্টকে হাসিয়া উড়াইতে পারিব, তখনই পৈশাচিক অত্যাচার দেখিয়া হাস্য করিব, এবং হিংস্র বাঘের রক্তলোলুপ স্বভাবের পশ্চাতে আমার নিজের আত্মাকেই দেখিতে পাইব। নির্গুণের উপাসনায় এই ফল হইবে। যিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভেদ জানিয়াছেন, তিনিই একমাত্র বলবান্—অন্যে নহে। আপনাদের বাইবেলেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাইবেন। বলুন দেখি, ন্যাজারেথের যীশু সেই অসীম অনন্ত শক্তি কোথা হইতে আসিল, যাহাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদিগকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই এবং যাহারা তাঁহার প্রাণবিনাশে কৃত-সংকল্প হইয়াছিল তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ? ইহা সেই বাণী - "আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক", ইহা সেই প্রার্থনা—"হে পিতঃ, আমি যেরূপ তোমার সহিত এক, ইহাদিগকেও সেইরূপ আমার সহিত এক করিয়া দাও"। ইহাই নির্গুণের উপাসনা। জগতের সহিত এক হইয়া যাও-- তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর এই নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে কোন পরীক্ষা বা প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও নিকটতর, আমাদের চিন্তাসকল অপেক্ষাও নিকটতর। তাঁহার মধ্য দিয়াই আমরা দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিতে গেলেই, আমরা অগ্রে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। এই দেয়ালটী দেখিতে গিয়া আমি প্রথমে তাঁহাকে দেখিতেছি, তৎপরে এই দেয়ালটীকে দেখিতেছি। কারণ, তিনিই চিরন্তন সাক্ষীস্বরূপ। কে কাহাকে দেখিতেছে ? তিনি এই দেহে আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। শরীর মন বদলাইয়া যায়, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়, দিন মাস, বৎসর অতীতের গর্ভে চলিয়া পড়ে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মরিয়া যায় কিন্তু তাঁহার বিনাশ নাই। 'আমি আছি' 'আমি আছি' এই বাণী অনাদিকাল হইতে একই ভাবে রহিয়াছে। তাঁহাতে এবং তাঁহার মধ্য দিয়াই আমরা সকল বস্তু দর্শন করি। তাঁহাতে এবং তাঁহার মধ্য দিয়া আমরা অনুভব করি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া থাকি এবং এক্ষণে রহিয়াছি। আর সেই 'আমি', যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বলিয়া ভুল করি, শুধু আমার 'আমি' নহে—পরন্তু তোমার, সর্ব্বভূতের, সকল প্রাণীর, সকল দেবতার, এমন কি, নীচ হইতে যে নীচ তাহারও 'আমি'। সেই 'আমি আছি' হত্যাকারীর মধ্যেও যেমন সাধুর মধ্যেও তেমনি, ধনীর মধ্যেও যেমন দরিদ্রের মধ্যেও তেমনি, পুরুষের মধ্যেও যেমন স্ত্রীর মধ্যেও তেমনি, মানুষের মধ্যেও যেমন পশুর

মধ্যেও তেমনি। নিম্নতম জীবাণু হইতে উচ্চতম মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের অন্তরেই তিনি বিরাজ করিতেছেন এবং অনাদিকাল ধরিয়া "সোঽহং" "সোঽহং" উচ্চারণ করিতেছেন। যখন আমরা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান এই অভ্যন্তরীণ বাণী বুঝিতে পারিব যখন আমরা এই শিক্ষা লাভ করিব, তখন সমস্ত জগৎ তাহার রহস্য ব্যক্ত করিবে, তখন প্রকৃতিদেবী তাঁহার রহস্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদিগের নিকট উন্মুক্ত করিবেন। তখন আর কিছুই জানিবার থাকিবে না। এইরূপে সকল ধর্ম্ম যে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে আমরা তাহা দেখিলাম অর্থাৎ এই সমস্ত জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান গৌণমাত্র; যে জ্ঞান আমাদিগকে বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বরের—ব্রহ্মের—সহিত এক করিয়া দেয় তাহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান।

(সমাপ্ত)

বায়স্কোপ ও বেদান্ত-দর্শন।

(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মজুমদার)

ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পন উপলক্ষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে বিরাট্ উৎসব হইয়াছিল তাহাতে নানাবিধ প্রদর্শনীর মধ্যে বায়স্কোপও দেখান হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই একবার যে বায়স্কোপ না দেখিয়াছি এমন নহে, কিন্তু এরূপ ফাঁকা মাঠে কখনও দেখি নাই এবং ইহার প্রদর্শনীতত্ত্বও বিশেষ বুঝিতাম না। প্রথমতঃ দেখিলাম, মাঠে মনুমেণ্টের গায়ে একখানা সাদা কাপড় মাত্র ঝুলান আছে এবং কিছু দূরে একটা "অপারেটাস্" বা আলোকাধার রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু কিছুই ছিল না।

ক্রমে অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে ঐ আলোকাধার হইতে

কতকটা আলোকরশ্মি ঐ কাপড়ের উপর পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হইল। দৃশ্যাবলি অন্যান্য প্রত্যক্ষ ঘটনার মতই দৃষ্ট হইল। যেখানে আমি কেবল একখান কাপড়মাত্র দেখিয়াছিলাম, সেইখানে এখন "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" দেখিলাম। —সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, মানুষ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা চক্ষুর ভ্রম নহে সুতরাং একটীও মিথ্যা বলিবার জো নাই, যেহেতু দৃশ্যগুলি প্রকৃত ঘটনা সমূহেরই প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু তত্ত্বান্বেষণ করিলে ইহার মূলে একখানি সাদা কাপড় ও একটা আলোক এবং কতকগুলি ছোট ছোট ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেবল শিল্পনৈপুণ্যে এই অদ্ভুত দর্শন ঘটিয়া থাকে।

বেদান্ত মতে জগৎপ্রপঞ্চও ঠিক এইরূপ ছায়াবাজি মাত্র। বেদান্ত বলেন, মায়াপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই জগৎ। বায়স্কোপ দৃশ্যের ন্যায় ইহারও কোন সত্তা নাই। অর্থাৎ মায়ারূপ বস্ত্রে, চিদাভাসরূপ আলোক প্রতিভাত হইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে। বায়স্কোপ দেখানর সময় যদি কেহ ঐ বস্ত্রখানি সরাইয়া লয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় দৃশ্য বিলুপ্ত হইয়া কেবল আলোকমাত্র থাকে সুতরাং আলোকসত্তাই দৃশ্যাবলির অস্তিত্ব, নচেৎ উহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। তদ্রূপ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের আভাস মায়ারূপ জড়ে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইলেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। বায়স্কোপের অন্তর্নিহিত ছবিগুলির প্রতিবিম্ব যেমন আলোকপ্রভায় প্রতিভাত হইয়া দৃশ্যরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মায়া বা মূল প্রকৃতিতে সৃষ্টির বীজ অব্যাকৃতাবস্থায় বিলীন থাকে, উহাতে চিদাভাস প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই ঐ বীজ সকল উপাধিবিশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমংকৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" ৯অঃ, ৮ শ্লোক।

আমি মদধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া (প্রাক্তন কর্ম্ম নিমিত্ত স্বভাববশে) অবিদ্যাপরবশ ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি॥ পুনরায় বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" ৯অঃ, ১০ শ্লোক।

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে, হে কৌন্তেয়, এই জন্যই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় (আমার সন্নিধি মাত্রেই পকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা। সুতরাং বায়স্কোপতত্ত্ব নিগূঢ়-ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বৈদান্তিক মায়াবাদতত্ত্ব কথঞ্চিৎ ধারণা করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, যদি কোন বালককে শিশুকাল হইতে আজীবন বায়স্কোপ দেখান হয়, উহার রহস্য তাহার নিকট কখনও উদ্ঘাটিত করা না হয়, তাহা হইলে ঐ বালক বৃদ্ধ হইলেও কদাচ উহার সত্তায় অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। বালকের কথা দূরে থাক্ আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ হইয়াও অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মনুমেণ্টের গায়ে একখানা কাপড় মাত্র দেখিয়াও যখন তন্ময় হইয়া বায়স্কোপ দেখিতেছিলাম তখন সেই অভ্রভেদী মনুমেণ্ট ও কাপড় খানির কথা এককালেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু ঐ ঘটনাবলিকে আমার সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছিল। অতএব সামান্য একটা বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ায় যদি এত বড় একটা ভ্রম জন্মিতে পারে তবে সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র খেলায় যে আমরা মোহিত হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং মায়াই যে সৃষ্টির উপা-দান তাহাতে আর সংশয় নাই। যেখানে মায়া নাই সেখানে সৃষ্টিও নাই। এই মায়া সামান্য পদার্থ নহে, ইহা সেই মায়া-ময়েরই মায়া। মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে হইলে সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে, যেহেতু জগতের আধার মায়া এবং মায়ার আধার ভগবান্। গুণময়ী মায়া নিজ সৃষ্ট জগৎকে মোহিত করিতে পারেন কিন্তু নিজ আধার

গুণাতীত ভগবান্‌কে পারেন না। শ্রীভগবান্ মায়াকে সুদুস্তরা বলিয়াছেন।

"দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা, ৭অঃ, ১৪।

আমার এই সত্ত্বাদিগুণবিকারময়ী, অলৌকিকী মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমাকেই (অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহারা এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন (তৎপরে আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন)। সুতরাং করুণাময় ভগবানের দয়া ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার আর উপায় নাই।

যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র আমিটার শক্তিতে মায়া অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে তাহার পতন ও ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। এই হেতুই বলদর্পিত শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। মহামায়া স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।

যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

চণ্ডী, উত্তমচরিত্র, ১২০ শ্লোক।

যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, অথবা যে আমার দর্পচূর্ণ করিবে, কিংবা ত্রিভুবনে যে আমার তুল্য বলশালী, সেই আমার স্বামী হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি নিজ বলে আমাকে (মায়াকে) অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি (মায়া) তাঁহারই বশীভূত হইব। কিন্তু যে মায়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও মোহিত, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও সময়ে সময়ে যোগমায়ায় অভিভূত থাকেন, সে মায়ার কবল হইতে মুক্ত হওয়া কি মায়িক জীবের সাধ্য? বাস্তবিক এরূপ অধিকারী সংসারে অতীব বিরল—শুদ্ধাদ্বৈতের অধিকারী জগতে সহস্র বৎসরে একটী আসে কিনা সন্দেহ। তাই বায়স্কোপে বস্ত্রখানি স্থানান্তরিত করিলে যেমন খেলা সাঙ্গ হইয়া কেবল আলোকমাত্র থাকে, সেইরূপ মায়া তিরোহিত হইলেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। পুরাকালে মায়াবাদী

বেদান্তবিদ্ মহর্ষিরা আধুনিক বায়স্কোপতত্ত্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান বলে মায়াতত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতারপ্রমুখ মহাপুরুষগণ মায়ার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

যিনি অজ্ঞান বা মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানালোকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই সৎস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীগুরুচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

চার্ব্বাক-দর্শন।

(অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত সেন গুপ্ত, এম-এ, বি-এল)

ভারতভূমি চিরকাল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এখানে যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে বা যত বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ আছে জগতে আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না; এজন্য ভারতভূমি চিরকাল ধর্ম্মভূমি বলিয়া জগতে বিখ্যাত থাকিবে। এখন আর কেহ ভারতকে "Land of Heathens" বা "Land of Barbarian Hindus" বলিতে সাহস করেন না। এখন অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে, আধ্যাত্মিক জগতে ভারত এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। জড়জগতে ভারতের স্থান খুব নিম্নে হইলেও হইতে পারে; এ সম্বন্ধে আমাদের জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই। ভারত জড়-জগতে জ্ঞানের সোপানে কতদূর উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা হারাইয়াছি, এই প্রমাণের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়বিধৌত উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত্রই আদিম সভ্যতার উৎপত্তি স্থান। জড়জগতের জ্ঞান প্রথম এই বাবিলন হইতে

আরম্ভ হয়, পরে ঈজীপ্ট, গ্রীস্, রোমে ইহার প্রভাব বিস্তার হয়; পরে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান প্রবেশ করে। তবে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে ভারতীয় হিন্দুগণ অল্পদিনের মধ্যে এই জড়-জগতের জ্ঞানে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতে সভ্যতা আগমনের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে ঋগ্বেদাদি প্রচলিত ছিল, একথা সকলে স্বীকার করেন। বোধ হয় প্রথমে অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যগণ এই জগতের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য প্রকৃতির উপাসনা করিতে থাকেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন প্রকৃতিলব্ধজ্ঞানে জগতের রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তখন তাঁহারা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্টায় বিরত হইলেন এবং কিসে জন্ম-মরণশীল এই জগতের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে অন্তত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কারণ অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ –" ইত্যাদি।

আর্য্যগণ দেখিলেন, প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিময়ী প্রতীয়মান হইলেও ইহা জড় মাত্র; ইহার পারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষ আছেন, তিনি এক মাত্র সৎ এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ও অমৃতত্ব লাভ হয়। জগতের আদিকারণ আনন্দময় পুরুষের সন্দর্শনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় দেখিয়া আর্য্যগণ প্রাকৃতিক জগতের বর্ণনা হইতে বিরত হইয়া আদিপুরুষের গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জগতে অতুলনীয় বেদ বেদান্ত ভারতে দেখা দিল। অন্যান্য জাতিগণ জড়জগতের জ্ঞানলাভে ব্যস্ত থাকায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে তাদৃশ যত্নবান্ হইতে পারেন নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্মকে জীবনের সার জানিয়া তচ্চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং ইহার ফলে ক্রমশঃ দেশকালপাত্রানুযায়ী নানা ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সাংখ্যাদি ষড়দর্শন, পুরাণতন্ত্রের আবির্ভাব হইল। এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরস্পর আপাতবিরোধী বোধ হইলেও সকলের মূলে এক উদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায়। কিসে এই সংসারে ত্রিতাপ

যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার উপায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। সাংখ্য দর্শন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিলেও ইহা আস্তিক দর্শন, যেহেতু জীবের ত্রিতাপ দুঃখ নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রই যুক্তি তর্ক দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়া জীবের মুক্তি মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছে।

যে আর্য্যগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, যাঁহারা ঈশ্বরানুভূতি, স্বস্বরূপোপলব্ধি বা আত্মসাক্ষাৎকার জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া বিবেকসাহায্যে জড়জগতের নশ্বর সুখের প্রলোভন হইতে মনকে সংযত রাখিতে সতত যত্নবান্ তাঁহারা যে কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবেন ইহা মনে করিতেও যেন কেমন একটা সঙ্কোচ ভাব আসে; এমন ধর্ম্মপ্রাণ জাতি কেন যে নাস্তিক দর্শনের অবতারণা করিয়া মানবকে সংসার সুখের দিকে প্রেরিত করিবেন তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, পুণ্য ভারতবর্ষে এক সময়ে চার্ব্বাক-দর্শন নামক নাস্তিক দর্শন প্রচলিত হইয়াছিল। চার্ব্বাক-দর্শন মতে "সুখমেব পুরুষার্থঃ"।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" ইত্যাদি।

মোটকথা এই দর্শনমতে দেহই আত্মা—দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী-সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উৎকৃষ্ট বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজনীয় নাই। চার্ব্বাকমতে পরলোক নাই, এইজন্য এই দর্শনের আর একটী নাম "লোকায়ত" দর্শন। চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণ বলেন, যদি পরলোক গমনের পর আত্মার দেহান্তর প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, তবে স্বজনস্নেহে মৃতব্যক্তির আত্মা কেন পূর্ব্বদেহে প্রবেশ করে না? ইঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডও মানেন না—বলেন, এসব কেবল লোককে প্রতারিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের উদরান্নের সংগ্রহচেষ্টা মাত্র।

প্রমাণ স্বরূপে ইঁহারা বলেন, যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে যজমান কেন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতাকে যজ্ঞে বিনাশ করেন না? তাহা হইলে ত পিতামাতার অনায়াসে স্বর্গলাভ হইত, আর তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে বৃথা শ্রাদ্ধাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। আর যাগযজ্ঞ করিয়াও স্বর্গ লাভ হয় না, ইন্দ্র বহু যজ্ঞ করিয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমিৎ ভক্ষণ করেন। এরূপ ইন্দ্র অপেক্ষা পত্রভোজী পশুও বড়। ইত্যাদি—

অনেকে বলেন, বৃহস্পতি এই দর্শনের প্রণয়ন করেন, পরে চার্ব্বাক ও তৎশিষ্যগণ বৃহস্পতির মত প্রচার করেন। বৃহস্পতি-প্রণীত বলিয়া এই দর্শনের আর একটী নাম "বার্হস্পত্য"। এই বৃহস্পতি যে কে ছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে পদ্ম-পুরাণ মতে, অসুরগণকে ছলনা করিবার নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিই এই বেদ-বিপরীত মত প্রচার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও এই রূপ মত আছে দেখা যায়। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের উপকারার্থ নিজ দেহ হইতে মায়ামোহের সৃষ্টি করেন। মায়ামোহধ্যাননিরত অসুরগণকে চার্ব্বাক মতানুযায়ী উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বেদবিহিত মার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যখন স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু নিজ দেহোদ্ভূত মায়ামোহ দ্বারা নাস্তিকমত প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি যে নাস্তিক দর্শন প্রণয়ন করিবেন তাহা বড় বিচিত্র নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত এই নাস্তিক দর্শনের প্রচার হয়। বিষ্ণু ও পদ্মপুরাণ বলেন, বলদৃপ্ত অসুরগণ বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করায় প্রভূত শক্তিশালী হইয়া দেবগণের ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হীনবল করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই অসুরগণ তমোগুণী মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী নহে। ইহারা কৃচ্ছ্রতপস্যাদি দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত এবং আপনাদিগকে এই জগতের কর্ত্তা ভোক্তা এইরূপ মনে করিত। ইহলোকে ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ

ও বেদবিহিত যজ্ঞাদির ফলে পরলোকে স্বর্গসুখভোগ ইহারা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিত। ইহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বড় মানিত না, অথবা ইহাদের মুক্তিলাভের ইচ্ছাও ছিল না। তাই বলিয়া যে ইহাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল না তাহা নহে। যে বলিরাজ নিজ ভক্তি বলে ভগবান্‌কে দ্বারী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও একজন অসুর। তবে অধিকাংশ অসুরই ভোগ সুখের জন্য লালায়িত ছিল। ইহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড না হয় মানিত না, কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর ত ইহাদের আস্থা ছিল; সুতরাং ইহারা যে অত্যন্ত ধর্ম্মদ্বেষী ছিল বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রশ্রয় দিত, একথা বলা চলে না। তবে কেন দেবগুরু ইহাদিগকে নাস্তিক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? ইহাদিগের অপরাধ এই যে, পার্থিব সুখসম্পদ্ ভোগের জন্য ইহারা সদা লালায়িত ও যত্নবান্ ছিল। কিন্তু এই অপরাধের জন্য কি তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ না দেখাইয়া অধর্ম্ম পথে আনিতে হইবে? অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে, অন্যান্য মানবগণও ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুক্তিমার্গের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া পার্থিব ভোগসুখের জন্য যত্নবান্ হইয়াছিল, সুতরাং বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিতেছিল। কিন্তু সেইজন্য যে দেবগুরু বৃহস্পতির মত লোক তাহাদিগকে বিনাশের পথে প্রেরণ করিবেন, ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তিনি যদি অন্য মত ভ্রান্ত মনে করিয়া নাস্তিক মত প্রচার করিতেন তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সুরগণের মঙ্গলের জন্য অসুরগণকে ছলন করিতে তিনি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জানিতেন যে তৎপ্রচারিত নাস্তিক মত ভ্রান্ত এবং সত্যের উপর স্থাপিত নহে।

কিন্তু এরূপ মনে করিলে বৃহস্পতির উপর কলঙ্ক আরোপ করা হয়। ভাল লোকে কখনও কাহারও মন্দ করেন না, তাঁহারা সকলের মঙ্গল সাধনে সতত প্রয়াসী। সুতরাং বোধ হয় দেবগুরুর

নাস্তিক মত প্রচারের অন্য মহদুদ্দেশ্য ছিল। তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ ভোগসুখপরায়ণ হওয়াতে অনন্যলক্ষ্য হইয়া সতত বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্যের ভয়ে ইচ্ছামত বাসনা তৃপ্তি করিতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে বারম্বার জন্মমৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতেছে। জীব স্বরূপতঃ শিব। কেবল বাসনা বশে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। এই বাসনারূপ পর্দ্দা অন্তর্হিত হইলে জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। যদি জীব ভোগের দ্বারা সত্বর বাসনা ক্ষয় করিতে পারে, তাহা হইলে বিবেক উদয়ে তাহার স্বরূপজ্ঞান লাভে অধিক বিলম্ব হয় না। অন্তরে বাসনা রহিয়াছে কিন্তু ভয়ে ভোগ করিতে পারিতেছে না, এরূপ মানবগণের কল্যাণার্থই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "কেন বৃথা স্বর্গ নরকাদির ভয় করিতেছ? ওসব কিছুই নাই, তুমি ইচ্ছামত মনের বাসনা মিটাইয়া ফেল।" জীব এই আশ্বাস পাইয়া বাসনা পরিতৃপ্তি করিতে অগ্রসর হইল। তাহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করায় দেবগণেরও ভয় গেল, এবং তাহাদেরও মুক্তির পথ নিকট হইল; কেননা ভোগাবসানে চৈতন্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী। মানবগণ নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী না হইলে, তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়া নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করিতে হয়, আর যাহাতে সত্বর ভোগবাসনা ক্ষয় হয় তাহার জন্য বাসনা তৃপ্তির অন্তরায় যে ভয় তাহাও দূর করিয়া দিতে হয়। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, ভোগের দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। তাহারা বলেন,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"—গীতা।

কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যেহেতু, যে বস্তু অনন্ত নহে, একদিন না একদিন তাহার অবসান হইবেই হইবে। জগতে এক ভগবান্ ব্যতীত আর কিছু অনন্ত হইতে পারে না। অতএব বাসনা সান্ত হওয়ায় ভোগের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব নহে। আর

ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না।

চার্ব্বাক-দর্শনের এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কিনা বিচার করিতে হইলে ইহার অনুকূল কোন নজীর আছে কিনা দেখিতে হয়। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সুললিত মধুর কথায় পৃথিবীতে আবহমানকাল প্রচলিত সমুদয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর ঠিক এই মত সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন কিনা জানা নাই, তবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একবার এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিবস শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন, "মহাশয় আমার মনে হয়, যখন আমার জন্মাবার আগে আমার গুরু জন্মিয়াছেন, তখন আর ভয় বা ভাবনা কি।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "এর পারে আর গাঁ নাই; তবে যার এমন বিশ্বাস তার বেতালে পা পড়ে না"। এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু চিন্তান্বিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার ত এখনও খুব বেতালে পা পড়ে, তাহা হইলে আমার কি গুরুতে বিশ্বাস হয় নাই?" শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ বাবুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তবে কি জানিস, এমন অবস্থায় গুরু বলেন—"শীঘ্র খেয়েলে, পরেলে, সব বাসনা মিটিয়েলে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার বোধ হয় তাৎপর্য্য এই যে, ঠিক্ ঠিক্ শ্রীগুরুতে বিশ্বাস হইলে শিষ্যের চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু যতক্ষণ শিষ্যের বাসনা থাকে ততক্ষণ গুরুর প্রতি ঠিক বিশ্বাস হয় না সুতরাং সম্যক চৈতন্যলাভও হয় না। শিষ্য বিবেক সাহায্যে যদি বাসনা দমন করিতে না পারে, তবে গুরু তাঁহাকে ভোগের দ্বারা সত্বর বাসনা মিটাইয়া লইতে বলেন। শিষ্য গুরুবাক্যে নির্ভয়ে বাসনা মিটাইয়া সত্বর চৈতন্য লাভের অধিকারী হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার এইরূপ অর্থ হইলে ইহা বৃহস্পতির মতের পোষকতা করে।

রাজা অজাতশত্রুর শান্তিলাভ।

(পালি হইতে)

(শ্রীগোকুল দাস দে, এম-এ)

মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বের শেষ ভাগে একবার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হন। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রাজ্য গ্রহণে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজ্যদান করিয়া নির্জনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু স্বীয় গুরু দেবদত্তের পরামর্শে সেই স্থলেই তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। পরে আপনার একটী পুত্রের জন্ম হইলে পিতৃ-স্নেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া সেই দিনই পিতাকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিম্বিসার উহার অল্প পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাহা জানিয়া আপন মাতা বাসবীদেবীর নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার নিকট পিতার তৎপ্রতি অসীম ভালবাসার কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই স্বীয় মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহপরায়ণা বিমাতা কোশলদেবী পতির শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুদেব দেবদত্তেরও অধঃপতন হইল। অজাতশত্রু আর শোকা-বেগ দমন করিতে না পারিয়া উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। রাজবৈদ্য জীবকের অতুলনীয় চিকিৎসায় তাঁহার শিরোরোগ উপশম হইল বটে কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তিনি বহুরাত্রি বিনিদ্র হইয়া শান্তিলাভের জন্য বিশিষ্ট সাধু দর্শন করিয়া কাটাইতেন। কিন্তু উহাতেও শান্তি না পাইয়া সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় মর্ম্মন্তুদ যাতনা অনুভব করিতেন। পাছে তিনি হঠাৎ রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া নিরুদ্দেশ হন এই ভয়ে অমাত্যবর্গ সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। জীবক অধিকাংশ

সময় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার উপর 'সর্ব্বভূতহিতেরত' ভগবান্ তথাগতের কৃপাদৃষ্টি পড়িল।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। পূর্ণচন্দ্রিকার রজতশুভ্র অঞ্চলাবরণে প্রকৃতি হাস্যময়ী। বর্ষার খরস্রোতা নদী আবেগে রাজগৃহ ধৌত করিয়া জাহ্নবী-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। দূর হইতে সেই কলু কলু ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; ক্বচিৎ দূরস্থ শৃগাল কুক্কুরের রব ব্যতীত জগৎ নিস্তব্ধ ও সুপ্ত। কেবল অজাতশত্রুর নিদ্রা নাই। তাই তিনি অমাত্যবৃন্দ ও জীবকের সহিত প্রাসাদের মুক্ত ছাদে উপবেশন করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার প্রাণে মঙ্গলময়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর রাত্রি! এখানে এমন কে আছে যে আমাকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট লইয়া গিয়া আমার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে?" উপস্থিত সকলে একে একে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, পূর্ণ কাশ্যপের নিকট চলুন, তিনি আপনার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবেন। কেহ বলিলেন, মহারাজ, মস্করী গোশালের নিকট চলুন, আপনি শান্তি পাইবেন।" এইরূপে সকলে নিগ্রন্থ নাতপুত্র, সঞ্জয়, অজিত কেশকম্বলী ও ককুধ কাত্যায়নের নাম করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন যে, ইতিপূর্ব্বেই তিনি উক্ত ছয়জন মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তখন জীবক বিনয় সহকারে বলিলেন, "মহারাজ, ভগবান্ তথাগত এক্ষণে আম্রকাননে অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন চলুন, তিনি আপনার পিপাসা নিবৃত্তি করিবেন।" অজাতশত্রু ইতিপূর্ব্বে বহু সাধু দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগতের নিকট যাইবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি দেবদত্তের পরামর্শে তাঁহার অতি প্রিয় শিষ্য বিম্বিসারের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নিজের প্রাণ বিনাশার্থ দস্যু প্রেরণ করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছেন। উহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে বিভীষিকা উৎপাদন

করিত। তথাগত যে তাঁহার ঘাতকের উপরেও ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? তাই তিনি জীবককে বলিলেন, "জীবক, আমি তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি ত ক্রুদ্ধ হইবেন না?" জীবক বলিলেন, "মহারাজ, সেই সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত, 'সর্ব্বভূতহিতেরত' ঋষিকুলতিলক তথাগতকে অদ্যাবধি স্বয়ং মার পর্য্যন্ত রুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি তাহারও মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, "জীবক, বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমি এখনি যাত্রা করিব।" অতঃপর সেই কৌমুদীপ্লাবিত নিস্তব্ধ নিশীথে জীবক ও কয়েকটী মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে রাজা ভগবৎউদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে ভগবান্ তখন পর্য্যন্তও সংঘকে ধর্ম্মোপদেশ দান সমাপ্ত করেন নাই এবং ঐ সময়ে ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মের গভীরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় যে আটটী বিশেষ গুণসম্পন্ন তাহা শ্রবণ কর। (১) মহাসমুদ্র যেরূপ ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, সেইরূপ এই ধর্ম্ম সামান্য নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া দুরবগাহ নির্ব্বাণে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) সমুদ্র যেরূপ স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়া কখনও বেলা অতিক্রম করে না, সেইরূপ এই ধর্ম্মস্থিত কোন উপাসক বা ভিক্ষু প্রাণান্তেও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। (৩) সমুদ্রে যেরূপ কোন মৃত জন্তু থাকিতে পারে না, তাহা ভাসমান হইয়া তীরে আনীত হয়, সেইরূপ এই ধর্ম্মে শ্রমণ নামধারী কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি গুপ্ত থাকিতে পারে না, শীঘ্রই দৃষ্ট হইয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত হয়। (৪) গঙ্গা যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদীসকল যেরূপ সমুদ্রে পড়িয়া আপনাদের নাম-রূপ বর্জ্জন করে সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে যে কেহ এই ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে একমাত্র 'শাক্যপুত্র শ্রমণ' নামে অভিহিত হইয়া তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাম ও গোত্র ত্যাগ করে। (৫) পৃথিবীর

সমস্ত নদী এবং বারিধারা সমুদ্রে পতিত হইলেও তাহার বারিরাশির যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ বহু ভিক্ষু এই ধর্ম্মে নির্ব্বাণ লাভ করিলেও সেই অপ্রমেয় নির্ব্বাণের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। (৬) যেরূপ এই বিশাল সমুদ্রের সর্ব্বত্রই এক লবণাম্বুর আস্বাদ, সেইরূপ এই ধর্ম্মের সকল অংশেই একমাত্র সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তির আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। (৭) যেরূপ সমুদ্রে সর্ব্ববিধ রত্ন জন্মে, সেইরূপ এই ধর্ম্মও দয়া, দাক্ষিণ্য, তেজ, বীর্য্য, বল, আয়ু প্রভৃতি বহুবিধ অমূল্য রত্ন প্রসব করে। (৮) যেরূপ সমুদ্রে তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি মহা মহা প্রাণিসকল বাস করে, সেইরূপ এই ধর্ম্মে অতি নিম্ন অবস্থার ব্যক্তি হইতে দেবমানবের শীর্ষস্থানীয় অর্হৎগণ পর্য্যন্তও বিরাজ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বলিয়া আর্য্য-সন্তানগণ ধর্ম্মাচরণে এত আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।” ভগবান্ ধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিতেছেন ও সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘ তাহা আকণ্ঠ পান করিতেছেন। সেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী মধ্যে একটু মাত্র শব্দ নাই। সেই ব্রতপরায়ণ সংযত ভিক্ষুগণ হিমাদ্রির ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; দেহকম্পন বা অঙ্গচালন-জনিত বিন্দুমাত্র শব্দও শ্রুত হইতেছে না। কেবল প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা-শ্রেণী দূর হইতে তাঁহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অজাতশত্রু জীবকের আম্রবন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দীনভাবে তথাগতের নিকট যাইবেন বলিয়া অনুচরবর্গকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ত বনের নিকটে আসিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে?” জীবক বলিলেন, “মহারাজ, আর দূর নাই, ওই অদূরে আলো জ্বলিতেছে, ভগবান্ সংঘকে উপদেশ দিতেছেন।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানে কতগুলি ব্যক্তি আছেন? জীবক বলিলেন, প্রায় পাঁচ শত হইবে। এই কথায় রাজা যেন ভয়চকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য! পাঁচশত ব্যক্তি এখানে একত্র রহিয়াছে আর তাহাদের কোন সাড়াশব্দ নাই! তুমি ত আমায়

কোন শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিবে না?" জীবক উত্তর করিলেন, "মহারাজ, এ দাস বোধ হয় অদ্যাবধি কখনও আপনার কোনরূপ সন্দেহভাজন হয় নাই। ভিক্ষুদিগের কথোপকথন ও কার্য্য অতি শান্ত ভাবেই পরিচালিত হয়। আপনি উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন। আর বিলম্ব করিবেন না। তথাগতের বিশ্রামের সময় উপস্থিত।" অনন্তর উভয়েই ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ-সান্নিধ্যের অদ্ভুত মোহিনীশক্তিতে অজাতশত্রুর প্রাণ কিছু সান্ত্বনালাভ করিল। কারণ, তিনি উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "অহো, এই ত্যাগী যতিদিগের কি শান্ত ও সৌম্য ভাব! আমার ইচ্ছা যেন আমার পুত্র উদায়ীকুমার বড় হইয়া এইরূপ শান্তশিষ্ট হয়।" ভগবান্ অজাতশত্রুকে অত্যন্ত পুত্রবৎসল জানিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অজাতশত্রুও ভগবানের কুশল সংবাদ পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, একটী গুরুতর সমস্যা আমার মনে উঠিয়াছে। আমি বহু শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" ভগবান্ অনুমতি প্রদান করিলে রাজা বলিলেন, "মহাশয়, ইহজগতে প্রব্রজ্যার ফল কি? সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, শিল্পীরা স্ব স্ব শিল্পের দ্বারা আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শ্রামণ্যের এইরূপ প্রত্যক্ষ কোন ফল দেখাইতে পারেন কি?" উত্তরে ভগবান্ শ্রামণ্যের বহুধা ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন; উহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঐ যে ভিক্ষু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শীতকালের রাত্রে মুক্তস্থানে বসিয়া ধ্যানসুখ অনুভব করিতেছেন, তিনি কি সেই শ্রেষ্ঠী, যিনি সুরম্য হর্ম্ম্যের রুদ্ধকক্ষে দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় চারিটী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা-

পেক্ষা অধিক সুখী নন? নিশ্চয়ই অধিক সুখী। ইহাই প্রথম ফল।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন দাস, দরিদ্র, কৃষক বা ব্যবসায়ী নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হন তাহা হইলে রাজা কি তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবসায় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবেন অথবা উপাসকের ন্যায় তাঁহাদিগের সম্মুখে মস্তক অবনত করিবেন? এই শ্রেষ্ঠ পদবী লাভই শ্রামণ্যের দ্বিতীয় ফল।

তৃতীয়তঃ, যখন শ্রমণগণ ধ্যান ধারণাদি দ্বারা চিত্তবিকার দূর করিয়া আপনাদের দেহমন লঘু করিয়া ফেলেন তখন তাঁহাদের কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়, যথা, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ইচ্ছা-মৃত্যু, সর্ব্বত্র গমনাগমন প্রভৃতি। ইহাই তৃতীয় ফল।

কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন আর্য্যসন্তানগণ উহাতে বিচলিত হইবেন না। কারণ, শ্রামণ্যের সহিত উক্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যগুলি জড়িত থাকিলেও ঐগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রার্থনীয় নহে, উহারা আগন্তুক ফল মাত্র।

ইহার চতুর্থ ও প্রধান উদ্দেশ্য জন্ম-জরা-মরণরূপ মহাদুঃখস্কন্ধের বিনাশ সাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ। এই দুঃখের আদি কারণ অবিদ্যা এবং উপস্থিত কারণ তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা। অবিদ্যা হইতে ভোগবাসনার উৎপত্তি হইয়া জীবকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করাইয়া অশেষবিধ দুঃখ দিতেছে। সংসার ত্যাগ করিলে সেই অবিদ্যাবিনাশী সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, অন্যথা নহে। সেই জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপুসমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় বাসনার নাশ হয়। ভিক্ষু তখন জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রম করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং নির্ব্বাণসুখ অনুভব করেন। ইহাই শ্রামণ্যের একমাত্র মুখ্য ফল।

এই বলিয়া ভগবান্ সেই রাত্রের কথাপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলেন। তখন রাজা অজাতশত্রু আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য আমার চৈতন্য হইল। অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুলাভ করিলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও সেইরূপ

আনন্দ হইতেছে। ভগবন্, আমি শান্তি লাভ করিয়াছি। আমি পিতার মৃত্যুর কারণ হওয়ায় এতদিন হৃদয়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে।" ভগবান্ বলিলেন, "মহারাজ, পিতার মৃত্যুতে আপনি যে নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আপনি আর উদ্বিগ্ন হইবেন না; অতঃপর ধর্ম্মের রাজত্ব করিয়া প্রজা পালন করুন।"

রাজা তখন ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে আপনার উপাসক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।" ভগবান্ উহা স্বীকার করিলেন। তখন জীবক ভগবান্‌কে অভিবাদনাদি করিয়া রাজার সহিত প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে অজাতশত্রু এক কৌমুদীপ্লাবিত নিস্তব্ধ নিশীথে জীবনে অদম্য উৎসাহ ও শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "আহা, এই ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ যদি পিতৃমৃত্যুর ভাগী না হইতেন তাহা হইলে এইখানেই নিষ্পাপ অর্হত্ব লাভ করিতে পারিতেন।" ইহা অজাতশত্রুর পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে। কারণ, ইহা তাঁহাকে জগতের সমক্ষে পিতৃহত্যার পাতকে সাক্ষাৎ লিপ্ত থাকার অপরাধ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল। তিনি স্বীয় পিতাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিলে কখনই ধর্ম্মকায় তথাগত তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ' ও 'ধার্ম্মিক' উপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং বোধ হয় তিনিও ইহজীবনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(৩৬)

দুষ্ট সঙ্গ বর্জ্জন।

জ্ঞানী হইলেও দুষ্টের সঙ্গ করিবে না।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ।

শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে না। উর্ব্বশীর মোহে পড়িয়া ঐল রাজার দুর্গতি এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বর্ণন করিলেন।

ঐল গাথা।

ঐল রাজার গাথা আছে।

বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।

কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥

নারী যার মন হরণ করিয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, ত্যাগ, শ্রুত, বিজনবাস, মৌন এ সবে কি হবে ?

স্ত্রীলোক ও স্ত্রৈণের সঙ্গ করিবে না।

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।

বিদুষাঞ্চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥

অতএব অবলোকন দ্বারাও স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রৈণের সঙ্গ করা উচিত নহে। বিদ্বান্‌দেরও ষড়বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন মাদৃশ অবিবেকীদের কথা আর কি বলিব ?

কামুকের সাধুসঙ্গ পরম ঔষধ।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুরা উপদেশ দ্বারা কামীর মনব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন।

(৩৭)

সাধু সঙ্গের ফল।

উপদেশ শ্রবণে ভক্তি লাভ হয়।

তা যে শৃন্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।

মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

সাধুদের উপদেশ যাহারা শুনে, গান করে এবং আদরের সহিত অনুমোদন করে তাহারা মৎপর এবং শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তি লাভ করে।

সাধুসেবা দ্বারা অজ্ঞান নাশ।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।

শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

যে ভগবান্ অগ্নিকে সেবা করে তাহার শীত, ভয়, তম নাশ হয়। সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তাহার জাড্য, সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়।

সাধু সংসারতরণে নৌকা।

নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।

সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥

এই ঘোর ভবসাগরে যাহারা অনবরত ভাসিতেছে ডুবিতেছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবিৎ শান্ত সাধুরা পরম আশ্রয়—যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ় নৌকা।

সাধু একমাত্র শরণ।

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাম্ শরণম্ ত্বহম্।

ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্বিভ্যতোঽরণম্॥

প্রাণীদের অন্নই যেমন প্রাণ, আর্ত্তদের আমি যেমন শরণ, ধর্ম্ম যেরূপ মানুষের পরলোকের বিত্ত, সেইরূপ সাধু সংসারপতনভীত জনের শরণ।

সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

সূর্য্য উদিত হইলে বহির্বস্তুর চক্ষুস্বরূপ হন বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চক্ষু দান করেন। সাধু দেবতা এবং বান্ধব। সাধু আত্মা এবং ভগবান্।

(৩৮)

ক্রিয়াযোগ।

পূজার স্থান।

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া।

প্রতিমাতে, পৃথ্বীতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে, হৃদয়ে, দ্বিজ ভক্তির সহিত দ্রব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুস্বরূপ ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিবে।

অষ্টবিধ প্রতিমা।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শিলাময়ী, দারুময়ী সুবর্ণময়ী, মৃচ্চন্দনময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা।

ভক্তের পূজায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই—কেবল ভাব চাই।

ভক্তস্য চ যথালব্ধৈঃ হৃদি ভাবেন চৈবহি।

ভক্তের পূজা যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা এবং হৃদয়ের ভাব দ্বারা হইয়া থাকে।

ভক্তের পূজা ও অভক্তের পূজা।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।

ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সামান্য জলগণ্ডূষও আমার প্রিয়। আর অভক্তের ভূরি দ্রব্যেতে আমার পরিতোষ হয় না।

পূজার প্রণালী, বেদ ও তন্ত্র।

উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভুক্তি ও মুক্তি সিদ্ধির জন্য আমার পূজা করিবে।

(৩৯)

প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ॥

অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম ভাল হউক বা মন্দ হউক নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না।

কারণ অবস্তু।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

দ্বৈত যখন অবস্তু, তখন তার ভদ্রই বা কি, আর অভদ্রই বা কি? তার কতটা ভদ্র, আর কতটাই বা অভদ্র?

অর্থকারী বলিয়া সত্য নহে।

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।

এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥

প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি এবং আভাস (যেমন শুক্তিতে রজতাভাস) যদিচ অবস্তু কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাদি বস্তু যদিচ অসৎ তথাপি মৃত্যু অবধি ভয় দিতেছে।

বিদ্বানের আচরণ।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।

বিদ্বান্ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না—সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে বিবরণ করেন।

(৪০)

সংসার আধ্যাসিক।

উদ্ধব প্রশ্ন করেন—দেহ দৃশ্য, জড় আত্মা দ্রষ্টা, চৈতন্য। দেহ দারুবৎ আত্মা অগ্নিবৎ। এই সংসার জড় দেহের হইতে পারে না, কারণ, নিদ্রাবস্থায় সংসার থাকে না। এই সংসার চৈতন্য আত্মার হইতে পারে না, কারণ, তুরীয় অবস্থায় সংসার থাকে না। তবে এই সংসার কাহার? ভগবান্ বুঝাইলেন, কেবল দেহের সংসার নহে বা কেবল চৈতন্যের সংসার নহে কিন্তু উভয়ের মিলনে সংসার।

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ।

দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও অবিবেকীর নিকট স্ফূর্ত্তি হয়।

(৪১)

বিচার।

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥

(১) দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্থিব।

(২) ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কৃতি আত্মা নহে কারণ, ইহারা অন্নময়।

(৩) বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথ্বী, আত্মা নহে, কারণ ইহারা জড়।

(৪) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রকৃতি আত্মা নহে, কারণ ইহারাও জড়।

(৪২)

বিঘ্নের প্রতিকার।

(ক) কালের প্রতীকার।

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নাম সংকীর্ত্তনাদিভিঃ।

কামাদি বিঘ্ন আমার অনুধ্যান ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নাশ করিবে।

(খ) দম্ভমানের প্রতিকার।

যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ।

যোগেশ্বরদের সেবা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দম্ভমানাদি অন্যান্য অশুভপ্রদ বিঘ্ন নাশ করিবে।

দেহসিদ্ধি।

কেহ কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহসিদ্ধির জন্য যত্ন করে কিন্তু উহা ব্যর্থ। [দেহসিদ্ধি—অর্থাৎ দেহ সবল, সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।]

অস্তবন্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ॥

বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী—শরীর ফলবৎ নশ্বর।

(৪৩)

হংসগণের আশ্রয়।

উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।

হে অরবিন্দলোচন! যাঁহারা হংস অর্থাৎ সারাসার বিবেক-চতুর তাঁহারা কেবল তোমার আনন্দপরিপূরক পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন—তাঁহারা আর কিছু চান না। তোমার উপকার একবার যে জানিয়াছে সে আর তোমাকে ভুলিতে পারে না।

ভগবান্ ই দ্বিবিধ গুরু—আচার্য্য ও অন্তর্য্যামী।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

তুমি বাহিরে আচার্য্যশরীরে গুরুরূপে, অন্তরে চৈত্ত্যশরীরে অন্তর্যামীরূপে অশুভ বিষয় বাসনা নাশ করিয়া নিজ অনুরূপ গতি দান কর।

(৪৪)

ভগবান্ লাভের সহজ উপায়।

ভগবান্ কতকগুলি সহজ উপায় বলিলেন,

(১) পুণ্য দেশাশ্রয়।

(২) ভক্তসঙ্গ।

(৩) ভগবানের পর্ব্ব, যাত্রা, মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান।

(৪) সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন।

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কেস্ফুলিঙ্গকে।

অক্রুরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥

ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, চোর দাতায়, অর্ক বিস্ফুলিঙ্গে, শান্ত ক্রূরে যে সম দৃক অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, সেই পণ্ডিত।

(৫) কায়, মন, বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের সেবা।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবোনোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।

যে অবধি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে অবধি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কায় দ্বারা সেবা করিবে।

কর্ম্মত্যাগ কখন ?—যখন সব জিনিষে ব্রহ্ম দেখিবে।

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতঃ মুক্তসংশয়ঃ॥

সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনরূপ বিদ্যা দ্বারা এইরূপ উপাসকের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বোধ হয়। তখন তিনি নিশংশয় হন। তখন তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান্ লাভ।

এষাবুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

নশ্বর মনুষ্য দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্যস্বরূপ অমৃতস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি—তাহাই মনীষীদের মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য।

(৪৫)

উদ্ধবের অচলা ভক্তি প্রার্থনা।

উদ্ধবের ভগবান্‌ই চতুর্বর্গ।

ভগবান্ বলিলেন,

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ।

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি,

কৃষ্যাদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু উদ্ধব, আমিই তোমার এই সমস্ত ফল।

উদ্ধবের প্রার্থনা।

ভগবান্ এইরূপ যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব প্রীতিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কেবল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দে শিরঃ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা আমার বিজ্ঞানময় প্রদীপ অপহরণ করিয়াছিলে, আবার কৃপা করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিলে। সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য যদুকুলে আমার স্নেহপাশ প্রসারিত করিয়াছিলে, আবার আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিলে।"

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃস্যাদনপায়িনী।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমার শরণাগত। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা অহেতুকী ভক্তি হয়।

(৪৬)

উদ্ধবকে বদরিকাশ্রম যাইতে আজ্ঞা।

ভগবান্ বলিলেন,

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।

হে উদ্ধব! যদিও তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার কোন সাধনাপেক্ষা নাই, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি বদরীকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাও।

ভর্ত্তৃপাদুকাশিরে উদ্ধবের প্রস্থান।

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ॥

সুদুস্ত্যজ স্নেহবিয়োগকাতর উদ্ধব তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়ায় তাঁহার খুব

কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কৃপাপ্রদত্ত ভর্তৃপাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিলেন।

ওঁ তৎসৎ ॥

(সমাপ্ত)

স্বপ্নতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

মানসিক ভ্রম দ্বারাও যে ছায়া দর্শন হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক ইংরাজ মহিলার ছায়া দর্শনের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন—"আমি বসিবার ঘরের আলো সরাইয়া শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ আমার ভ্রাতার ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমি এই ঘটনায় এত বিস্মিত হইয়া গেলাম যে আলোটি আর সরাইতে পারিলাম না—স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রাতার ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ক্রমশঃ উহা আমার চক্ষুর সম্মুখে মিলাইয়া গেল। আমি এই দৃশ্যের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। অতঃপর পুনরায় আলোক সরাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম নীচের জানালায় কে টোকা দিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন—"আমি তোমায় ডাকছি, কোন ভয় পাইও না।" তারপর আমি তাঁহাকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইলে তিনি বলিলেন, "তুমি ত বেশ সাহসী দেখিতেছি আমি মনে করিয়াছিলাম, জানালায় টোকা দেওয়ায় তুমি ভয় পাইবে।"

আমার ভ্রাতা কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লণ্ডন হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার

বাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে অন্ধকারে আমার বাড়ীর পিছতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছায়াদর্শন সম্বন্ধে এই যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইল, ইহাতে দুইটি বিশেষত্ব আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলিতে নাই। সে দুইটি বিশেষত্ব এই ;—

(১) এই কল্পিত-দর্শনের সহিত বহির্জগতের একটি সত্য ঘটনার সম্বন্ধ আছে।

(২) কিন্তু এই ঘটনাটি কল্পিত-দর্শনের সময় সাধারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, ঐ কল্পিত-দর্শন বহির্জগতের কোন বাস্তব ঘটনা প্রসূত ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে উদ্ভূত নহে। এই বিশেষত্ব দুইটি অধিকাংশ কল্পিত-দর্শনের মধ্যে দেখা যাইবে। পূর্ব্বের ঘটনাটি জীবিত ও জাগ্রত ব্যক্তির কল্পিত ছায়া দর্শন সম্বন্ধে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। নিম্নে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে—

গটস্‌চক (Mr Gottschalk) তাহার বন্ধু থর্প (Thorpe) কে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবে তাহার অভিনয় হইবে ? থর্প থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। গটস্‌চক তাহার অভিনয় শুনিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। প্রিন্স থিয়েটারে এই পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গটস্‌চক বলিতেছেন, "সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়াছি। এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুখে একটি আলোক চক্র দেখিতে পাইলাম। চক্ষুর সম্মুখে অন্যান্য জিনিস যাহা দেখিতে ছিলাম, তাহাদের তুলনায় এই আলোক চক্র যেন বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। ইহা আমার চক্ষু হইতে কতদুরে অবস্থিত ছিল, তাহা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই আলোকিত স্থানের মধ্যে আমি দুইটি হস্ত দেখিলাম। এই হস্ত দুইটি একটি

চিঠির খাম (envelope) হইতে চিঠি বাহির করিতেছে। আমি আমার মনের মধ্যে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে চিঠিখানি আমার লিখিত। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হইল যে, হস্ত দুইটি থর্পের। এই বিশ্বাসটি এত দৃঢ়ভাবে উদিত হইল যে বাধা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থর্পের কোন কথাই মনে উদয় হয় নাই। এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যে স্তম্ভিত না হইয়া আগ্রহের সহিত আলোক মধ্যস্থ ছায়ামূর্ত্তিটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। হস্ত দুইটির রং খুব সাদা বলিয়া বোধ হইল। হাতের কব্জি দুইটি অনাবৃত। বিশেষ একরূপ কুঞ্চিত পোষাকে কব্জির উপরিভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যটি এক মিনিটকাল আমার চক্ষুর সম্মুখে স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার পর মিলাইয়া গেল। ঠিক এই সময় থর্প কি করিতেছিলেন তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটস্থ গ্যাসপোষ্টের নিকটে যাইয়া ঘড়ি খুলিয়া সময়টি দেখিয়া রাখিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে থর্পের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। পত্রখানি এইরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,—"বল দেখি, প্রিন্সেস্ থিয়েটারের ডাকের উপরে একখানি খামের উপর নজর পড়িবামাত্রই কি করিয়া বুঝিলাম যে ঐ চিঠিখানি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছে ?"

গটসৃচকের সঙ্গে থর্পের কয়েকদিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল মাত্র। গটসৃচক থর্পকে আর কখন চিঠি লেখেন নাই, এমন কি, থর্প গটসৃচকের হাতের লেখাও কখন দেখেন নাই। ডাকের উপর চিঠিখানি এরূপভাবে চাপা দেওয়া ছিল যে, থর্প চিঠির ঠিকানাও দেখিতে পান নাই।

এই ঘটনার তিন দিন পরে একজন বন্ধুর বাড়ীতে গটসৃচক এবং থর্পের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে থর্পের নিকট হইতে চিঠির এইরূপ বিবরণ জানা যায়।

ডাকের উপর চিঠি দেখিয়াই থর্প কোনরূপে মনের ভিতর বুঝিতে পারিলেন যে, গটসৃচকের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে। সেদিন থর্পের থিয়েটারে আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভাল করিয়া

ঐ পত্রখানি না পড়িয়াই তাড়াতাড়ি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অভিনয় করিতে গেলেন। অভিনয় শেষ হইয়া গেলে গটসূচকের চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু গোলমালে চিঠিখানি কোথায় রাখিয়া দিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। চিঠিখানির জন্য সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন এবং না পাইয়া কিছু বিরক্তও হইলেন। শেষে তিনি অভিনয় করিবার জন্য যে পোষাক পরিয়াছিলেন, সেই পোষাকের জামার পকেটে এই চিঠিখানি পাওয়া গেল। অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার হাতে সাদা রং মাখিতে হইয়াছিল এবং এই অভিনয়ের পোষাকের হস্তের আস্তিন একরূপ বিশেষভাবে কুঞ্চিত ছিল। থর্পকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি ঠিক কোন সময়ে অভিনয়-পরিচ্ছদের পকেট হইতে চিঠিখানি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন, তখন থর্প বলিলেন, তাঁহার যতদূর অনুমান হয়, তখন ৮টা বাজিতে ১০ মিনিট ছিল। তখন গটসূচক পকেট হইতে নিজের ডায়েরী বাহির করিয়া তাহাদের দেখাইলেন, যে তিনি ঐ দিন সন্ধ্যার সময় কল্পিত দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সময় ৮টা বাজিতে ৯ মিনিট লেখা আছে।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি, মনস্তত্ত্ব সভা বিশেষ অনুসন্ধান করিবার পর তাঁহাদের প্রকাশিত Census of Hallucination পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—দুই ভগ্নী উপাসনা করিবার জন্য গির্জ্জায় গিয়াছিলেন। তৃতীয় ভগ্নী বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারও গির্জ্জায় যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু লেখা পড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তথায় যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে উপাসনালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, তিনিও উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। এই স্থলে দুই জনের এক সঙ্গে কল্পিত দর্শন বিশেষ আশ্চর্য্যজনক।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি বৈদেশিক। আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমি শিক্ষা বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ পূর্ব্ববঙ্গবাসী কর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি।

যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন তিনি একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এক সময় কোন পর্ব্বোপলক্ষে তিনি অল্পদিনের ছুটী পাইলেন, এবং এই সময় তাঁহার পরিচিত জনৈক বৈষ্ণব সাধু তাঁহাকে কীর্ত্তনোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার প্রকৃতিটি অতিশয় ভক্তিপ্রবণ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম ও কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ কাজ থাকায় ঐ অল্প দিনের ছুটীতে তাঁহার মহোৎসবে যোগ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না, বাড়ীতেই যাইতে হইল। তিনি যখন বাটী হইতে ফিরিতেছিলেন তখন মহোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি যে স্থানে মহোৎসব হইয়া ছিল, সে স্থানটি রাস্তায় পড়ায় তাঁহার একবার সেই বৈষ্ণব সাধুটির সহিত দেখা করিয়া যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সেই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন এবং সাধুর আশ্রমে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাধুটি তাঁহাকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পাশের ঘরে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই দেখ —বাবু আসিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতি যেন একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং আগন্তুককে দেখিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি কখন আসিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক তাঁহার বন্ধুপুত্র এবং বিশেষ পরিচিত। পরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, দুইদিন পূর্ব্বে কীর্ত্তন শেষে মন্দির প্রদক্ষিণের সময় তিনি তাঁহাকে অপর এক ভদ্রলোকের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। আরতি শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁহাদিগকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কোথায় গেলেন, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না?" তখন শুনিলেন তাঁহারা আসেন নাই! তিনি স্পষ্ট তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়াছেন অথচ তাঁহারা যথার্থই আসেন নাই জানিয়া তিনি নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তদবধি দুইদিন সেই ভাবেই ছিলেন। এক্ষণে ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এইরূপ ছায়াদর্শন সমূহ কখন কখন জীবনে গভীর দাগ রাখিয়া যায়। যে স্থলে এইরূপ কল্পিত-দর্শন মানসিক ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া

দেওয়া যায় না, সেইরূপ দর্শনের অস্তিত্ব বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, উপরে আমরা যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছি তাহাতে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট ব্যক্তি উভয়েই জীবিত এবং জাগ্রত।

উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তির কল্পিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে, তিনি যদি মৃত কিম্বা নিদ্রিত হইতেন তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিতাম যে, মৃত কিম্বা নিদ্রিত ব্যক্তি সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন জাগ্রত ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সূক্ষ্ম দেহের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কারণ, যদি এই সকল ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ জড়দেহ হইতে বহির্গত হইত তাহা হইলে তাহাদের চৈতন্যের লোপ হয় নাই কেন? যদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে, আমাদের চৈতন্য সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত নহে—জড়দেহে অবস্থিত, তাহা হইলে প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) আলোচনা কালে আমরা সূক্ষ্মদেহ প্রকাশের সঙ্গে যে চৈতন্যের লক্ষণ পাই তাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

জাগ্রতব্যক্তিদিগের ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের ঘটনা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করে তাহার সহিত দৃষ্ট ব্যক্তির যেন একরূপ মনের যোগ উপস্থিত হয় এবং এই মনের যোগ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দর্শকের মনে এক প্রকার দূরদর্শন শক্তির বিকাশ হইতে দেখা যায়। নিম্নে মনস্তত্ত্বসভার বিবরণ হইতে গৃহীত একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

কোন ভদ্রলোক খাইবার ঘরে তাঁহার মাতা ভগ্নী এবং একজন স্ত্রী বন্ধু লইয়া সন্ধ্যার সময় বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহার স্ত্রী মভ (Mauve) রংএর পোষাক পরিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাহার স্ত্রীকে কিছু অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিলেন। উপস্থিত মহিলাগণ তাঁহার চেয়ার

হইতে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর আসিবার কথা বলিলেন। তাঁহারা কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই ভদ্রলোকটি তাঁহার স্ত্রীকে মভ রংয়ের পোষাকে কখন দেখেন নাই। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীর এই রংয়ের কোন পোষাক আছে তাহাও জানিতেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হওয়ায় ঐ মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী সেই সময় তাঁহার এক মহিলা বন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন, এবং স্বামী আসিয়া পৌছিলেন না বলিয়া বন্ধুটির নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। কারণ, সেদিন তথায় এক নৃত্য সভা ছিল এবং তাহাতে তাঁহার স্বামীর আসিয়া বাজাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বামী বিশেষ কারণে লণ্ডন সহরে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তজ্জন্য তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

এই কল্পিত দর্শনের মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী এই সময়ে যে মভ রংয়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, স্বামীর তাহা ছায়া দর্শনের দ্বারা উপলব্ধি হইয়াছিল।

ইজিপ্ট যুদ্ধে খার্টুম (Khartoum) নগরে যেদিন জেনারেল গর্ডন (General Gordon) নিহত হইয়াছিলেন তাহার পরের দিন প্রভাতেই সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী কায়রো নগরে (Cairo) সাধারণ লোকের মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত জানা ছিল যে, টেলিগ্রাফ দ্বারা এই সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের সময়ও এইরূপ যুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত, ইহা অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে শুধু যে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নহে। প্রফেসর হিস্‌লপ তাঁহার একখানি পুস্তকে * এইরূপ অনেক যুদ্ধের ঘটনা অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন।

* Enigmas of Psychical Research by James H. Hyslop. Vide—pages 96 to 105.

ব্যানকবার্ণ (Bannockburn) এর যুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছিল। রবার্ট হোয়াইট (Robert white) এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের দিনই এবারডিন (Aber deen) সহরে একজন উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত নাইট (knight) আসিয়া ঐ সহরে যুদ্ধে স্কটদিগের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিল। পরে এবারডিনের লোকেরা কোন সাধু মহাত্মা এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া সেই সাধু মহাত্মার আত্মার কল্যাণার্থে এবারডিন সহরের গির্জ্জায় বাৎসরিক পাঁচ পাউণ্ড করিয়া দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, রয়টারের তারযোগেই সকল সংবাদ শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছে। সেই জন্য যুদ্ধের খবর পাইবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও মনে বিশেষভাবে উদয় হয় নাই।

ছায়াদর্শনের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহা যেন যান্ত্রিক ভাবে কার্য্য করে। ইহাতে যেন কোন একটি চিন্তা প্রেরকের মন হইতে উদ্ভূত হইয়া গ্রহীতার মনে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে যেন গ্রহীতার মনের মধ্যে একটি চিত্র সৃজিত হয়, যাহার জড়জগতে কোন সত্তা নাই। চিত্রের মধ্যে গ্রহীতা প্রেরকের ভাবের যেন কতকটা আভাস পায়। প্রেরকের চিন্তা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া একাধিক ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইয়াছে—এরূপ ঘটনাও দেখা যায়। যেমন, পূর্ব্বোল্লিখিত একটি দৃষ্টান্তে দুই ভগ্নীর তাঁহাদের তৃতীয় ভগ্নীর ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এবারডিনের যে নাইট যুদ্ধের সুসমাচার বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকেও যদি এইরূপ চিন্তার মূর্ত্তরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ঐ রূপও একাধিক ব্যক্তির দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক সময় প্রেরকের চিন্তা গ্রহীতার মনের মধ্যে মূর্ত্তরূপ ধারণ করে না। অস্পষ্টভাবেই আভাস দিয়া যায়।

জড়ের কোন সূত্র অবলম্বন না করিয়াই মন নিজের চিন্তা কোন গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিতে পারে, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের জড় দেহের কার্য্যের ভিতর দিয়া কোনরূপেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কাজেই জড়াতীত চৈতন্যের অন্য কোনরূপ আধার হইতে ঈদৃশ কার্য্য হইতেছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য; অধিকন্তু মৃত্যুর পর চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই আধার বা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়।

হিন্দুদর্শন মতে, আমাদের জড়দেহে যেরূপ বাহ্যেন্দ্রিয় আছে, এই জড়দেহের মৃত্যুর পরও যাহার অস্তিত্ব থাকে সেই আধার বা সূক্ষ্মদেহের সেইরূপ কতকগুলি অন্তরেন্দ্রিয় আছে। বাহ্যেন্দ্রিয় বহির্জগতের যে সকল অনুভূতি আহরণ করে, তাহা এই সকল অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা মনোভূমিতে আনীত হয়। কখন কখন এই সব অন্তরেন্দ্রিয় জড় দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া-দর্শন তাহার একটি প্রমাণ। স্বপ্নের মধ্যেও এই অন্তরেন্দ্রিয় সকল কোন কোন সময়ে জড়দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য্য করে।

যদি আমরা ঐরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে দেহবিজ্ঞান কিম্বা জীববিজ্ঞানের কোন কোন ঘটনা, যাহা জড়বাদের দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়।

লম্ব্রসো এক হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কুমারীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বালিকা নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া দৃষ্টি করিতে পারিত। যদি আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়েই যথার্থ দৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে, চক্ষু বাহিরের যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে চক্ষুর পরিবর্ত্তে অন্য দৈহিক যন্ত্রও ঘটনাক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এই অন্তরেন্দ্রিয়ের পক্ষে চক্ষুর ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ অনুমান করা একেবারে অযৌক্তিক হইবে না।

ফ্রাঙ্ক (Frank) লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন নিদ্রাচর

(Somnumbulist) মহিলা ঐ অবস্থায় স্পর্শদ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ চিনিতে পারিত*। ফ্রাঙ্ক অনুমান করেন যে,বিভিন্ন প্রকার বর্ণের মধ্যে উত্তাপের তারতম্য আছে। অবশ্য উহা এত সামান্য যে আমরা জাগ্রৎ জ্ঞানে এই পার্থক্য কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় আমাদের অনুভূতির প্রখরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় উত্তাপের তারতম্য ধরিয়া বর্ণের বিভিন্নতা স্থির করা সম্ভব হইতে পারে। আমরা যদি হিন্দুদর্শনের অন্তরেন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এইরূপ কষ্টকল্পনা কিম্বা অসম্ভব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয় না।

চক্ষু সম্বন্ধে দেহবিজ্ঞানে উল্লিখিত একটি সাধারণ ঘটনা লইয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্। আমাদের চক্ষুর ভিতরে যে অক্ষিপর্দ্দা আছে তাহার উপর আমরা বাহিরের যে সমস্ত বস্তু দেখি তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবিম্ব অক্ষিপর্দ্দার উপরে ঠিক উল্টা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ মাথা পায়ের দিকে এবং পা মাথার দিকে যায়। আমাদের চক্ষুর ভিতরে যদিও ছবি এইরূপ উল্টাভাবে পড়ে, তথাপি আমরা দেখিবার সময় কোন জিনিষই উল্টা দেখি না, সবই সোজা দেখি। দেহবিজ্ঞানে এই ঘটনার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। আমাদের মনে হয়, ইহার সহজ ব্যাখ্যা এই যে, আমাদের চক্ষুর ভিতরে যে ছবিটি পড়ে সেইটিই যে মনের ভিতর দেখি তাহা নহে। চক্ষুর ভিতরের এই ছবিটি মানসিক চিত্রে পরিণত হয়। এই পরিণতির সময় চক্ষুর ভিতরের ছবিটির যে ভুল ছিল তাহা সংশোধিত হইয়া যায়। স্নায়ুর অনুভূতি কি প্রকারে মনোভূমিতে উপনীত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পান নাই।

যাঁহারা অশরীরী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দর্শন সময় কিছু দীর্ঘ—প্রায় এক মিনিট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হয়ত

---

* Sleep—by Marie De Manaceine (St. Petersberg).

তাঁহাদের অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন মুহূর্ত্ত কালের জন্য হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মুহূর্ত্তকালের দর্শন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে কিরূপেই বা ততোধিক কাল স্থায়ী হয়? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কবি বলিয়াছেন,—'আকাশে চপলা কেন চমকি চলিয়া যায়'—কিন্তু এই চমকান যে কত কম সময়ের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা সকল কবিরই ধারণার বাহিরে। চপলার গতি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। সেই চপলার এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইতে কতটুকু সময় লাগে তাহা অনুমান করুন। কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎ চমকান আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া থাকি। তাহার অর্থ এই যে জড় জগতের কার্য্যটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ে উহার অনুভূতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

আকাশে যখন বিদ্যুৎ দেখি, তখন একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া অন্যদিকে যাইতেছে দেখিতে পাই। বিদ্যুতের চমকানটি ঠিকই দেখি বটে, কিন্তু উহার গতির ভঙ্গীটি যাহা দেখি তাহা ভুল দেখি। দুইজনে যদি একই বিদ্যুতের খেলা দেখে, তাহার গতির ভঙ্গী দুইজনে ঠিক একরূপ দেখে না। অনেক স্থলে অশরীরী দর্শনের সময় এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

মুহূর্ত্তের জন্য যেন মনের ভিতর একটি নূতন শক্তি হইতে উদ্ভূত জ্যোতির দীপ্তি খেলিয়া যায়। তাহা হইতে যে মানসিক চিত্র উদ্ভূত হয় তাহা অধিকক্ষণ ব্যাপী হয়। সেই মানসিক চিত্রের মধ্যে অনেক স্থলে কতকটা নিজের মনের ভাবও আরোপিত হইয়া যায়। সেই জন্য সেই চিত্র অনেক সময় বাহিরের ভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব মনে করিলে ভুল হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন কতকটা এইরূপ ভাবের।

(ক্রমশঃ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
৯।৯।১৫

পরম স্নেহাস্পদেষু,

চা—, তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পূজ্যপাদ নাগ মহাশয়ের কি ভক্তি, কি অদ্ভুত প্রেম, কি অমানুষী অকিঞ্চন ভাবই দেখিছি—আর ভক্তেরা কি এনে ফেলেচে! এরই নাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা'র খেলা। মা'র এলাকা এড়ান কি অসম্ভব ব্যাপার বুঝে নাও। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা কর,—মা দয়াময়ী, কৃপা করে মুখ তুলে চাও, পথ ছেড়ে দাও, আমি ভজনহীন সাধনহীন, অতি দুর্ব্বল সন্তান তোমার, রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমরা কি রকম বুঝ্‌লে বল দেখি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে ঠাকুরের সঙ্গে বাঁদর, ভালুক, গরু, রাখাল হয়ে এসেছিলে, এবার না হয় মানুষের মুখোস পরে আগমন হয়েছে; কিন্তু ভিতরকার সেই বাঁদুরে কিচিরমিচির—গোরুর গুঁতোগুঁতি যাবে কোথায় বল? ভগবান্ ত সর্ব্বকাল পরম উদার আছেনই আছেন, কিন্তু ভক্তেরা দ্বেষাদ্বেষী, ঈর্ষ্যা, হিংসা, দলাদলি, গণ্ডীকাটা কবে ছেড়েছে? প্রভু আসেন বেড়া ভেঙ্গে দিতে—আমরা নূতন মত নূতন ভাব বলে প্রচার করে খুব কসে বাঁধুনি লাগাই, আর বলে বেড়াই—এমন অপূর্ব্ব উদার ভাব আর নাই, তোমাদের সকলের মত সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভুল, আর একমাত্র আমাদের মতই নিত্য, নির্ভুল।

আমি দেখ্‌চি তোমার উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা। তুমি একান্তে একা একা বেশ আছ; প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। সিদ্ধ হও, জীবন্মুক্ত হও, ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মেতে যাও।

লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক খেয়াল ক'রোনা। এই জীবনে, এই শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চাইই চাই। তখন তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে ভগবৎবাণী—অহঙ্কার, অভিমান দেশ ছেড়ে পালাবে।

দেখ্‌চ না মানুষে কি চায়? কেবল চায় ঐহিক সুখসম্পদ্‌ - ভোগ—ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করে? আর যদি বিশ্বাস করে, ক'টা লোক তাঁকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়? বাবা! যা লোকমাত্র, কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে রেখেছেন, এ ছাড়িয়ে উঠে এমন বীর কটা আছে?

* * * সৃষ্টি অনন্ত- ভাব অনন্ত। অপরের দোষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে এসে পড়ে। আমরা তো লোকের দোষ দেখ্‌তে কিম্বা দোষ শোধরাতে আসি নাই, এসেচি কেবল শিখ্‌তে। সর্ব্বদা পরীক্ষা করিব কি শিখিলাম। চতুর্দ্দিকে দেখ্‌চো ত কত বিজাতীয় কত বিধর্ম্মী ভাব রয়েছে। তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার বল? এসেছি আঁম খেতে, পেটভরে আঁম খাবার চেষ্টা করা যাক্‌। এই ভাল। আর তোমার আমার কথা লোকে কৃপা করে শুনে মাত্র। নিজেদের ধারণা কত হ'ল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্যে নিলে কিনা জান্‌বার ইচ্ছা। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি কোথায়, একবার চিন্তা করি এস। প্রচারে কাজ নাই, এখন পালাতে পাল্লে হয় বাপ্‌। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, তাই রক্ষে, নতুবা চারিদিকে তো কেবল দাবানল, বাড়বানল আর জঠরানল! এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি কত্তে পার? পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

"প্রেমিক চায়নাক' জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি ;
আবার চোদ্দভুবন ধ্বংস হলে, আসমানেতে বানায় ঘর
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও ভাই থাকে না তার আত্মপর)।"

সে মানুষের দোষগুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাল বেসে বেসে মরে ; মরেই বা কেন? ভালবাসায় যে অনন্তজীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা—এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই। এ জিনিষ লড়াই করে কেড়ে নেবার জো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বল্‌চি জান্‌বে। বিশ্বাসবল, শ্রদ্ধাবল চাই এ ধন লাভ কত্তে হলে। সম্মুখে ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমরা কতই ভাগ্যবান্। কিন্তু মা সব ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দেন ; এই এক মহামোহ। তবে শরণাগতকে রক্ষা করেন, সৎবুদ্ধি, সৎমন, সৎসঙ্গ দানে।

ভালটা দেখাই উত্তম। বালি চিনিতে মেশামিশি, পিঁপড়ে হয়ে এস চিনিটে নি। কাজকি বাবা কোন্দল-ঝগড়ায় ; বিবাদ-বিসম্বাদে। তুমি আমার ভালবাসা ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানিবে। আর ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি কহিবে। * * *

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

(২)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

১২।১১।১৫।

স্নেহাস্পদেষু,

যথাসময়ে তোমার পত্র পাইয়াছি। এখন হতে ভাল অভ্যাস কত্তে চেষ্টা কর। খুব আঁট আন, যার নাম নিষ্ঠা—প্রাণ ঢেলে ভালবাসা চাই আদর্শকে। যে নাম তোমার অভিরুচি, সেই নামে তুমি ডুব দাও। উপরে ভাস্‌লে কি হবে। নিয়ে এস বিশ্বাস গুরু-বাকে, সাধুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে—তবে ত ফল পাবে। ম্যাদাটে ভাবে কাজ হয় না। চাই খুব রোক্—আমি এই জন্মেই সিদ্ধ হব, নির্লিপ্ত হব, জীবন্মুক্ত হব, আমার অসাধ্য কি আছে? নিষ্ঠা করে

কথামৃত নিত্য পাঠ করিবে। উহার গানগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া গাহিতে চেষ্টা করিবে। ভয় ভাবনা দূর করিয়া দিবে। ভাবিবে আমরা ভগবানের সন্তান, তাহলে দুর্ব্বলতা আসিতে অবসর পাবে না।

প্রার্থনা ও ধ্যান অভ্যাস ভাল। সৎ চিন্তা করিলে অসৎ চিন্তা পালাবে।

"দূর হয়ে যা যমের ভটা
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা,
তোর যমের যম হতে পারি
ভাব্‌লে মায়ের রূপের ছটা।"

এই সব ভাব জাগাবে, তবেই ত অবিদ্যা দূরে যাবে। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ।

সমালোচনা।

সুনীতি—সামাজিক উপন্যাস—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১॥০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক্ষমা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সহজাত শুভসংস্কারসমূহের অধিকারী মানব প্রতিকূল অবস্থাকেও অনুকূল করিয়া লইয়া স্বীয় জীবন শান্তিময় এবং সংসর্গাগত বিপথগামী ব্যক্তিগণকেও চরিত্র-বলে শান্তির অধিকারী করিয়া তুলে ইহাই সুনীতিতে বিবৃত হইয়াছে। পিতৃমাতৃহীন বালক সুনীতি দ্বাবিংশবর্ষে খুড়ীমার দুর্ব্যবহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৌকায় মাঝির কর্ম্ম করিতে করিতে উক্ত গুণসমূহের বলেই বিন্দুমাধব বাবুর গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া সুপণ্ডিত ও পরে কৃষ্ণমোহন বাবুর বিপুল ধনের অধিকারী

হয় এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত প্রতিবাসিগণের আশা ভরসা স্থল হইয়া উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করে। সুনীতির চরিত্রটী ফুটাইতে গ্রন্থকার যে ঘটনাবৈচিত্র্যের অবতারণা ও তাহাদের পারম্পর্য্য বিধানের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনস্বিতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ডাকাতদের হস্ত হইতে সুনীতিকে মুক্ত করিবার জন্য বিপিন ও অনুকূলকে আনয়ন করাটা আমাদের একটু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য, বর্ণনার চাতুর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে এবং গার্হস্থ্য জীবনের সুখময় চিত্রের সন্নিবেশে উপন্যাসটী অতি উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্য।

মানভূম ও বাঁকুড়া।

সহৃদয় দেশবাসিগণের সানুগ্রহ দানে আমরা এতদিন কোন প্রকারে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলাস্থ ক্ষুৎপিপাসা ও বস্ত্রাভাবক্লিষ্ট জনসাধারণের অভাব-অনাটনের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমরা মানভূম জেলায় সাহায্য-কার্য্য ১১টী হইতে ৬৯টী গ্রাম পর্য্যন্ত বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছি এবং তাহাতে উক্ত জেলায় সাহায্যগ্রাহীর সংখ্যাও ১৬৯ হইতে ২৩৮০ জন হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায়ও ২৬ খানা গ্রামের ভিতর ২৯৩ জন আর্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত জলকষ্ট নিবারণের জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কার্য্যাক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দিবার উদ্দেশ্যে আমরা মানভূম জেলাস্থ বাগ্‌দা কেন্দ্রে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কারকার্য্য ও একটী নূতন কূপ খনন এবং বাঁকুড়া জেলাস্থ ইন্দপুর কেন্দ্রে ৫টী নূতন কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আরও, ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত গরীব ও নীচজাতীয় লোকদের ভিতর কার্য্যক্ষম বিধবাগণ ‘ধানভাঙ্গা’ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াই

সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সেজন্য ঐ শ্রেণীর লোকদের ভরণপোষণার্থ আমরা তাঁহাদিগকে অগ্রিম ধান্য দিয়াছি। ইতিমধ্যে উড়িষ্যা বিভাগে ভুবনেশ্বরের নিকট ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক লোকের ঘরবাড়ী—যথা সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ হইয়া যাওয়ায় আমরা তথায়ও সাহায্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। কুমিল্লা হইতে দুর্ভিক্ষের খবর পাইয়া আমরা তথায়ও লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং কিছুদিন হইল তথায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নিকট একটী সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ এই প্রকার অন্নবস্ত্রহীন দুঃস্থ স্বদেশবাসী জনসাধারণকে আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে কখনই বিরত হইবেন না। এতদ্দেশের গরীব জনসাধারণের অবস্থা যে কি হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। কোন কোন স্থান হইতে আমরা এরূপ সংবাদ পাইয়াছি যে, পরিধেয় বস্ত্রাভাবে গৃহবধূগণ নগ্নপ্রায় হইয়া বিচরণ করিতেছেন! কোন প্রতিকারের উপায় নাই অথচ চক্ষের সম্মুখে স্বীয় পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যার এই প্রকার হৃদয়বিদারক অবস্থা—ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুরুষদের অনেকে দেশছাড়া হইয়াছে।

উদারহৃদয় দেশহিতৈষিগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা তাঁহাদের এই দীন দুঃখী ভাইভগ্নীদের জীবন ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহা পারেন, অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

১। প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া।

২। সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

ভোগ না ত্যাগ ?

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

অদ্বৈতরূপিণী মায়ের শরণগ্রহণে সকল ভোগবাসনার ক্ষয় হয়। হিন্দু শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদ শুনিয়া যাঁহাদের মনে মহা ভীতির সঞ্চার হয়—যাঁহারা ভাবেন ইহজন্মকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতেই হইবে, এই নিষ্ঠুর কার্য্যকারণাত্মক বাদ হইতে কাহারও নিস্তার নাই—ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতা হইতে নিরয়কীট পর্য্যন্ত সকলকেই ইহার করাল কবলের বশবর্ত্তী হইতেই হইবে—তাঁহাদের ভরসা কেবল ঐ অদ্বৈত-রূপিণী মহামায়ী। একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং দ্বন্দ্বের অবসানে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিরোধ নাশ পায়। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা দৈহিক, মানসিক ও দেবসুখ ভোগ করা যায় সত্য কিন্তু সে সুখ আপেক্ষিক—আত্যন্তিক নহে। যেখানে সুখ, দুঃখও যেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অনুসরণ করে। বহু সৎকর্ম্মসঞ্চিত ফলে সুরেন্দ্রাদি লোক লাভ করিতে পার কিন্তু সে দিব্য লোকসকলও অসূয়া ও পতনাদি দোষদুষ্ট। আর দৃষ্ট ইহলোকের কথা ত আমরা সকলেই অবগত আছি। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া জগতের সর্ব্ববিধ ভোগ সুখ উপভোগ কর না কেন, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিরহ প্রভৃতি দুঃখের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই!

এখন প্রশ্ন হইতেছে, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ নশ্বর জানিয়াও কেন লোকে সেই ক্ষণিকসুখেই মগ্ন হয়? তাহার উত্তরে অস্মদ্দেশীয় ঋষিরা বলিয়াছেন—জীব অমৃতের সন্তান, তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। অনাদি মায়াকল্পনা হেতু সে তাহার নিজের স্বরূপজ্ঞান হারাইয়াছে বটে কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ বাঁচিয়া থাকিবার, জ্ঞানলাভের, ও সুখভোগের

সংস্কাররূপে তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, তাই সে নানা ক্ষুদ্র সান্ত বাসনার সৃষ্টি করিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছে। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যখন সে উপলব্ধি করে যে ইন্দ্রিয়জ সুখের দ্বারা কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—যেটুকু সুখ লাভ করা যায় তাহাও আবার বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্ষণিক এবং দুঃখও বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করে তখন সে তাহার স্বস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। ক্রমে প্রবৃত্তির মোহবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির ক্ষুরধারবর্ত্মে অগ্রসর হয়। অগ্রসর কালে তাহাকে প্রারব্ধ সংস্কারের ভীষণ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ সহ্য করিতে হয়। যশ, বিত্ত, রূপ, নাস্তিকতা প্রভৃতি নানাকারে প্রারব্ধ তাহার বীর্য্যবত্তা প্রকাশ করে। কিন্তু যে সহিষ্ণুহৃদয় সেই উত্থান-পতন ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিজ আদর্শে স্থির থাকিতে সমর্থ হন তিনিই সন্ন্যাসী। আর যিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই পরমহংস।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—বড় বড় কথায় কতকগুলি আদর্শ মানবের সমক্ষে ধারণ করিলেই চলিবে না, উহা বাস্তবজীবনে পরিণত করিবার ক্ষমতা মানবের আছে কিনা না জানিয়া শ্রুতিমধুর কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া "আকাশে পক্ষিপদচিহ্ন অনুসন্ধানের" নিমিত্ত মানবকে উত্তেজিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? সমাজে থাকিয়া সে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের দ্বারা কত নব নব সুখস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়া, নিজের ও পারিপার্শ্বিক জীবের হয়ত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের কত সুবিধা করিতে পারিত। তাহা না করিয়া যাহা কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই এরূপ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি অনুধাবিত করিবার জন্য মানবকে আহ্বান করিতেছ কেন? নিবৃত্তিমার্গের ইতিহাস ত আমাদের অগোচর নাই। তোমাদের ত্যাগী গুরু শিব ব্রহ্মা হইতে বিশ্বামিত্র, ব্যাস প্রভৃতি সকলেই ত জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে গিয়া পুনঃ পুনঃ সেই একই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন যখন অসম্ভব তখন সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন

করিয়া "হেয়" এবং "প্রেয়" এই দুইটি বিচার করিয়া যথাসম্ভব সুখ ভোগ করাই ত উচিত। কাঁটা আছে বলিয়া গোলাপ ফুল তুলিব না উহা যেরূপ, দুঃখ আছে বলিয়া সুখ ভোগ করিব না ইহাও সেইরূপ একই প্রকারের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইহার উত্তরে আমরা বলি—তুমি যাহাকে বৈরাগ্যবাদীদের জীবনে ক্ষণিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ তাহাকে আমরা উত্থানেরই সোপান বলিয়া থাকি। মানব জন্মাবধি বাহ্য প্রকৃতির সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা তাহার কায়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণকর তাহা সেই বাহ্য প্রকৃতি হইতেই আদায় করিয়া লইতেছে এবং যাহা তাহার বিরোধী সে তাহা প্রাণপণে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কোন্‌টি তাহার মধ্যে 'হেয়' এবং কোন্‌টি তাহার মধ্যে 'প্রেয়' ইহা তাহাকে অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে হয়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়—এই অভিজ্ঞতা শিশুকে উপার্জ্জন করিতে হইলে তাহাকে একবার না একবার আগুনে হাত দিয়া দহনযন্ত্রণা ভোগ করিয়া উক্ত জ্ঞানের উপলব্ধি করিতেই হইবে। তোমরা যে সংসারের মধ্যে থাকিয়া যতদূর সম্ভব বাছিয়া বাছিয়া ভোগের নিমিত্ত সুখ সঞ্চয় করিতেছ এ কথা তোমাদিগকেও মানিতে হইবে। ভুল করিয়াই মানব সদসদ্ বিচারের অধিকারী হইয়াছে। নতুবা বৃক্ষ বা প্রস্তরখণ্ডের জীবনের নির্ভুলতা দর্শন করিয়া তাহাকেই ত মানবেরও শীর্ষদেশে বসান উচিত হইয়া পড়ে। মানব এত বড় কেন? কারণ সে তাহার জীবনে যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে এবং সেই ভুলগুলি সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞ বলিয়া।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে যে, আমরা 'প্রেয়' বা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব না কেন? একটা অজানা জিনিষের অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর আমরা নিজ প্রকৃতি হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কারণ, বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা জীবের নাই। দার্শনিক হিসাব নিকাশ ছাড়িয়া দিয়া যদি পারিপার্শ্বিক ঘটনা সকল উপস্থাপিত করা

যায় তাহা হইলে দেখা যায়, মানবের প্রকৃতি যেমন তাহাকে ভোগে নিযুক্ত করে সেইরূপ তাহার প্রকৃতিই আবার তাহাকে ত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। ভোগ কথাটি উচ্চাবচ সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি কুৎসিত প্রকৃতির লোক বা পশু যাহা ভোগ করে এবং দার্শনিক উচ্চ উচ্চ বিষয়ের চিন্তার দ্বারা যাহা ভোগ করেন, এই উভয়ের ভোগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। শেষোক্তের নিকট যদি পূর্ব্বোক্তের ভোগ সকল উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে সে ভোগে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিবে না, স্বভাবতঃ উহার ত্যাগেই তাঁহার মতি জন্মিবে। বৈরাগ্যসাধনে যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন না তাঁহাদের নিকট এমন অনেক ভোগোপাদান আছে যাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। যাঁহারা সংসারের ভোগ্য বস্তুসকল তুচ্ছ করিয়া উহার বদ্ধ প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন নির্ম্মল পবিত্র আনন্দের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। কারণ, আনন্দ ব্যতিরেকে ত কেহ কোথাও কোন প্রকারে নিমেষার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারে না। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার, ত্যাগীর আনন্দ ভোগীর আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি করিয়া জানিলে? তদুত্তরে আমরা বলি, যে নির্ম্মল পবিত্র বায়ুর মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে সেই বলিতে পারে আপাতসৌরভযুক্ত ভবিষ্যতে মস্তিষ্কের পীড়াদায়ক চম্পক গন্ধ অপেক্ষা উন্মুক্ত নির্ম্মল পবিত্র সান্ধ্য সমীরণ কত সুন্দর। সংসারকাননে সুগন্ধ কুসুমও আছে আবার দুর্গন্ধ কুসুমও আছে। জীব দুর্গন্ধ ছাড়িয়া সুগন্ধেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে। কিন্তু সুগন্ধ কুসুমও তাহার চিরকাল ভাল লাগে না, সে উহাতে ক্লান্তি বোধ করে। পরে কানন বহির্ভাগে উন্মুক্ত প্রান্তরের অনুসন্ধান পাইয়া তাহার পবিত্র গন্ধহীন বাতাসের উপভোগে আনন্দ লাভ করে। সু বা কু গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া গন্ধহীন নির্ম্মল বায়ু সেবনে হৃদয়ের যথার্থ প্রসন্নতা লাভ হয় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা 'হেয়' ও 'প্রেয়' এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ে'র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মানবকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, আত্মা সদাপূর্ণ ও এক। অনাদি অঘটনঘটনপটীয়সী অনির্ব্বচনীয়া মায়াকল্পনা হেতু আত্মা স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া "দেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃত" করিয়া তাহাতে অভিমান হেতু নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ মনে করিতেছেন। কিন্তু চিরকাল তাহার এই ভাব ভাল লাগে না। এই ভাল না লাগা এবং নিত্য বস্তু লাভের যে ইচ্ছা তাহাই মুমুক্ষুত্ব। তখন জীব মায়ান্তর্গত সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্বরূপে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াস পায়। ক্রমে সেই জীব 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—সিংহের ন্যায় পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বহির্গত হন—ইহাই মুক্তি। তাই ভগবান্ শঙ্কর উপদেশ করিতেছেন, "বর্ণ, ধর্ম্ম, আশ্রম এবং আচার এতৎ সমস্তই শাস্ত্ররূপ যন্ত্র দ্বারা নিবদ্ধ। বৎস! পিঞ্জর হইতে কেশরীর ন্যায় তুমি জগজ্জাল হইতে নির্গত হও। বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম তোমার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাত্যভিমান এবং আশ্রমাভিমান থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য শ্রুতির দাস—অর্থাৎ শ্রুতিনিরূপিত পথে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। মানব যখন বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান শূন্য হয়, তখন শ্রুতি তাহাকে মস্তকে রাখেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাবৎ পর্য্যন্ত প্রমাণ দ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি বাধিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপলব্ধ হয়। যখন 'আমি দেহ নহি' এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন তোমার সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" (অজ্ঞানবোধিনী) কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদ্বৈত নীতি অবলম্বন করিয়া অসৎলোকেদের সমাজে ব্যভিচারের স্রোত বহাইবার এক প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। সমাজের বিধি নিষেধ এইরূপভাবে 'দেহজ্ঞান-রহিত' প্রভৃতি সন্দেহজনক আদর্শকে ভিত্তি করিয়া যদি উড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সংসারে শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ব কিছু থাকিবে না, বরং পাশ্চাত্য Nihilismকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কেহ ত কখনও দেহ জ্ঞানরহিত হইবেই না বরং 'আমিই ঈশ্বর, আমিই সব' এ প্রকার জ্ঞান হইতে তাহাদের সমাজের শাসন ও দায়িত্ব মুক্ত

হইয়া যাইবে এবং সমাজে যথেচ্ছাচারিতার স্রোত প্রবলবেগে বহিতে থাকিবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি সকলই সত্য। যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিলেও যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা মর্ম্মে মর্ম্মে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে বুঝিয়াছেন এবং প্রতিপদে সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ মুমুক্ষু বীতরাগ জনের প্রতি উহা আদৌ প্রযুজ্য হইতে পারে না। মতবাদ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন সংসারে চিরকাল একদল লোক থাকিবে যাহারা উহার কদর্থ করিয়া নিজেদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবে। তাই বলিয়া সে মতকে উঠাইয়া দিতে হইবে তাহার মানে কি? অসৎ লোকদের জন্য শাস্ত্রে বিধিনিষেধের অভাব নাই এবং এখনও বহু শাস্ত্রকার উঠিয়া নিজের মতে জগৎকে চালাইবার জন্য বহু বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া তাহা সকলকে মানিয়া চলিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। কিন্তু তুমি যে Nihilism এর কথা বলিলে অদ্বৈতবাদ তাহার সমর্থন করে না। যথেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতায় যেরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান Nihilism এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যেও সেইরূপ পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে। কারণ—অদ্বৈতজ্ঞানী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করায় তাঁহার সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় বলিয়া বিধিনিষেধ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অবশ্য সাধন অবস্থায়,—

> অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ যঃ
> কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
> বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্

তিনিই আবার যখন পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন,—

> সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
> গাঙ্গং বারি সমস্ত বারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
> বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
> সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥ (ধন্যাষ্টক স্তব)

যিনি প্রথমে নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,

সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ দেখিয়াছিলেন, বিষয় সকলকে দুরন্ত বিষবৎ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার যখন অখণ্ডৈকরসস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলেন তখন এই নিখিল জগৎ তাঁহার নিকট আনন্দকানন সদৃশ, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ, সকল জলই গঙ্গাজল সদৃশ, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্যতুল্য এবং সমস্ত পৃথিবীই বারাণসী তুল্য হইল। কারণ, সর্ব্বভূতেই তিনি প্রিয়তম আত্মাকে অনুভব করিতেছেন, তাঁহার 'হেয়' বা 'প্রেয়' কি করিয়া থাকিতে পারে? কেহ কেহ মনে করেন অদ্বৈতজ্ঞানীরা অতি শুষ্ক বা নীরস—কিন্তু বাস্তবিক তাহা একেবারেই নহে। তাঁহারা 'রসো বৈ সঃ' আনন্দব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে সম্ভোগ করেন।

আবার ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সকল বস্তুতেই আত্মার স্ফুরণ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছু হইলেন। এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী তাঁহার পতির নিকট বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া রূপে, রসে, গন্ধে আত্মার ভোগ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর আধুনিক ভোগবাদীদের অসদৃশ উদাহরণস্থল যে জনক তাঁহাকে তাঁহার গুরু যাজ্ঞবল্ক্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে পাওয়া যায়—

"এতৎ হ স্ম বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা উভে হ্যেতে এষণ এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মা।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২) এবং তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে রাজর্ষি জনক বহু বৎসর হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

আধুনিক সংসারসর্ব্বস্ব কতকগুলি লোকের আর একটি যুক্তি এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন—"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—"তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়

মুক্তসঙ্গঃ সমাচর"—এব তিনি নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াই এই সংসারেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহাকেই আদর্শ না করিয়া প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস প্রভৃতি বাক্য লইয়া নিজেদের ব্যস্ত করি কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" তাঁহার সহিত সাধারণ জীবের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি তিনি একদিকে যেমন অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহবশতঃ 'শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে' বলিতে শুনিয়া 'অশোচ্যানন্বশোচস্তং' ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করিয়া—

"ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ তং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ (গীতা—২য় অ)

বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অন্য দিকে উত্তম অধিকারীবোধে উদ্ধবকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন —

"গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমং।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বনভুক্ সুখনিস্পৃহঃ॥
তিতিক্ষু র্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবদ্, ১১ স্ক)

আবার যাঁহারা আরও উন্নত তাঁহাদের সম্বন্ধে একেবারে নৈষ্কর্ম্ম্য প্রচার করিয়াছেন—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৩য় অ)

ইহাতেও কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা না হয় হইল ; কিন্তু তোমরা অদ্বৈতবাদাত্মক ত্যাগের ধর্ম্ম সাধারণের নিকট প্রচার করিতে পার না, কারণ, অনুপযুক্ত লোক তোমাদের বাক্যমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ উহা গ্রহণ করিয়া পরে প্রবৃত্তির তাড়নায় 'ইতোনষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইবে। কিন্তু ইহা ত অদ্বৈতবাদ বা তাহার বৈরাগ্য সাধনের দোষ নয়। অদ্বৈতবাদ ত বলিয়াই রাখিয়াছেন—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ—তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসাযা ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্যয়ে।" (১অ, ১পা, ২সূ, শারীরক-ভাষ্য) কিন্তু ভ্রমবশতঃ যে সে চিরকাল নষ্ট হইবে তাহাও কখন নহে। কারণ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥" (গীতা ৬ষ্ঠ অ)

তাহাতে শ্রীভগবান্ উত্তর করিয়াছিলেন,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥" (গীতা ৬ষ্ঠ অ)

ভ্রষ্ট ব্যক্তিও 'কল্যাণকৃৎ' ইহাই শ্রীভগবানের শাসন, উপরোক্ত শ্লোকের দ্বারা অনুমিত হয়।

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে,—এই অদ্বৈতবাদ যাহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহার দ্বারা জগতের কি কিছু কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ? তোমরা ত আত্মতৃপ্ত আত্মরতিসম্পন্ন, অতএব স্বার্থপর জগতের দিকে কি তোমাদের নজর আছে ?— জগৎ তোমাদের ত নিকৃষ্ট

মিথ্যা। প্রশ্নোত্তরের পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে জগতের হিতকারী, তোমাদের এই জগৎ হিতকার্য্য কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? আমরা নয় স্বীকার করিলাম যে, তোমরা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ প্রভৃতি সন্ন্যাসী এবং তাঁহাদের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জগৎহিত করিয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সন্ন্যাসীর ভেকের দ্বারা অসৎকার্য্যের অবতারণা—অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের সৃষ্টিই বা কত হইয়াছে, আর অপর লোকদের দ্বারাই বা কত হইয়াছে? সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে কয়টি তৈমুর, নাদির জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আর চণ্ডাশোককে ধর্ম্মাশোকই বা কে করিল? জাতি, কুল ও অর্থমর্য্যাদার প্রবল অত্যাচার হইতে মানবকে সাম্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কাহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছে? জগতের সকল স্নেহের বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়া নিঃস্বার্থভাবে, হীনব্যক্তির প্রতি করুণার বা সহানুভূতির চক্ষে নহে, সর্ব্বভূতে প্রিয় আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমের চক্ষে কাহারা এই জগৎকে দেখিয়াছে? একটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কাহারা অমানবদনে নিজ মস্তক দান করিয়াছে? আবার মহাপ্রাণ গৃহস্থরাও সময়ে সময়ে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহাই বা কাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া?

বিশ্বপ্রেমই বল, জগৎহিতই বল, যদি উহা অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তোমার সকল নীতিই ভাসিয়া যাইবে। কেহ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে—'কেন জগতের উপকার করিব?' তোমার মৃত্যু হইতেছে বটে কিন্তু তাহা আমার বড় কৌতুক লাগে।' এ প্রশ্নের সমাধান, তুমি দয়া, সহানুভূতি, প্রয়োজন বা আর কিছুর দ্বারা করিতে পারিবে না। তথাপি বলিতে পার, আমরা ত অদ্বৈতবাদ মানি না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ত জগৎহিতব্রতে ব্রতী। সত্য, তর্কে মান না বটে কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, পরমাত্মীয় নিজ আত্মার স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখ বলিয়াই তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠে।

এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, সকলকেই অদ্বৈতবাদ ও উহার তীক্ষ্ণধার ত্যাগের রাস্তা মানিয়া চলিতে হইবে। সময় উপস্থিত হইলে একদিন সকলকেই ত্যাগের রাস্তা গ্রহণ করিতেই হইবে, মাথা ধরিলে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে মাথা ধরিয়াছে। আর যাহারা ঐ মত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করে, তাহাদিগকে আমরা বলি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু তোমার মতই একমাত্র সত্য, একথা বলিয়া মানবের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ রুদ্ধ করিবার তোমার কি প্রয়োজন? সমুদ্রযাত্রী হইয়া যদি অর্দ্ধপথে বিশাল নদীবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া 'ইহাই সমুদ্র' বলিয়া নঙ্গর ফেলিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর বসিয়া থাক, কিন্তু অপরকে সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিও না।

শ্রীশ্রীমহাবীর-চরিত।

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ)

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকল হিন্দু নরনারীই রামায়ণ-মহাবারিধির অমূল্য নিধি মহাবীর হনুমান্-চরিত স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। মাদৃশ হীনবুদ্ধি শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমহাবীরের নিষ্কলঙ্ক নিরুপম চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রয়াস বামনের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা মাত্র। তথাপি পরশমণি স্পর্শে লৌহ যেমন স্বতঃই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অদ্য মহাবীরের পূত জন্মদিনে তাঁহার পুণ্য নাম কীর্ত্তন করতঃ মদীয় মনোমালিন্য বিধৌত করিয়া অকৃতী জীবন ধন্য করিব।

পুরাকালে অপ্সরাদিগের মধ্যে অঞ্জনা নাম্নী এক পরম রূপবতী

অপ্সরা ছিলেন। তিনি ঋষিশাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে পবনের ঔরসে এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বরাঙ্গনা অঞ্জনা এই শিশুসন্তান প্রসব করিয়া ফল-সংগ্রহমানসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সদ্যোজাত শিশু ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া মাতৃঅদর্শনে অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে অরুণদেব জবাকুসুমতুল্য লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রভাত-গগনে উদিত হইতেছিলেন। ঐ নবকুমার নবোদিত সূর্য্যকে পক্ক ফলভ্রমে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া নভোমণ্ডলের দিকে ধাবিত হইলেন। বায়ুতনয় বাল্যাবস্থায় প্লবমান হইলে দেবদানবযক্ষ সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন বায়ু তাঁহার স্বাভাবিক শৈত্য দ্বারা স্বীয় সুতকে সূর্য্যের দাহভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব বায়ুপুত্রের এবম্বিধ কার্য্য বাল-সুলভ-চপলতা বশতঃ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন সূর্য্যকে ধরিবার জন্য পবননন্দন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন, সে দিন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পবনপুত্রকে দেখিয়া রাহু ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন, "বাসব! আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আপনি আমাকে চন্দ্রসূর্য্য দান করিয়াছেন, কিন্তু আর একজন আসিয়া আমাকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়াছে"। রাহুর কথা শুনিয়া ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বজ্রহস্তে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করতঃ পবনপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। মারুতি ঐরাবতকে দেখিয়া তাহাকেও একটী বৃহৎ ফল বিবেচনা করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে শচীপতি যারপরনাই ক্রোধান্বিত হইয়া হস্তস্থিত বজ্রদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। বজ্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি পর্ব্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই আঘাতে তাঁহার বামহনু ভগ্ন হইল। নিজ পুত্রকে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত ও ভগ্ন-হনু দেখিয়া অঞ্জনা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমানা অঞ্জনার কাতর ক্রন্দনে পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় গতি রোধ করিলেন। তাহাতে স্থাবর, জঙ্গম, খেচর, ভূচর যাবতীয়

জীব শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইল। সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া ব্রহ্মা পবনের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া পুত্র-শোকাতুর পবন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে বারত্রয় প্রণাম করিলেন। বিধাতা হস্তদ্বারা প্রহৃত শিশুর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। কমলযোনী ব্রহ্মার কর-স্পর্শে শিশুর চেতনা লাভ হইল। পবন স্বীয় পুত্রকে জীবিত ও সুস্থ দেখিয়া বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "হে দেবগণ! তোমরা সকলে পবনতনয়কে আশীর্ব্বাদ কর, কালে এই শিশুদ্বারা তোমাদের বহুতর কল্যাণকর কার্য্য সাধিত হইবে।" তখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমার বজ্রাঘাতে ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই কপিবর হনুমান্ নামে খ্যাত হইবে। অদ্যাবধি হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে"। তৎপরে সূর্য্য কহিলেন—"আমার তেজের শতাংশের একাংশ ইহাকে দিলাম। যখন এই বালক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তখন ইহাকে আমি শাস্ত্র শিক্ষা দিব, তদ্দ্বারা হনুমান্ বাগ্মীপ্রবর হইবে"। তৎপরে বরুণ কহিলেন—"আমার পাশ অথবা বারি দ্বারা শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না"। যম প্রীত হইয়া বর দিলেন, "এই বালক যমদণ্ডের অবধ্য ও নিয়ত অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কখনও অবসন্ন হইবে না"। ধনপতি কুবের বর দিলেন, "আমার অস্ত্রের ও আমার অবধ্য হইবে"। দেবাদিদেব মহাদেবও এইরূপ উত্তম বর দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন "আমি যে সকল দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে"।

দেবগণ বর দ্বারা বালককে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিলে ব্রহ্মা বায়ুকে বলিলেন, "তোমার পুত্র শত্রুগণের ভয়ঙ্কর ও মিত্রগণের শুভঙ্কর হইবে। অধিকন্তু এই কপিশ্রেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ, যথেচ্ছা গমন ও ভক্ষণ করিতে পারিবে। এই শিশু কীর্ত্তিমান্ ও অপ্রতিহত-গতি হইবে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের বিনাশকারণ ও রঘুকুলপতি

রামচন্দ্রের প্রীতিকর হইবে, এবং কালে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে"। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ পবনপুত্রকে এইরূপ বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং অঞ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। দেবগণের বরে হনুমান্ সাতিশয় বলশালী হইয়া বালসুলভচাঞ্চল্য বশতঃ মুনিদিগের আশ্রমে নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন এবং স্রগ্ ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সকল প্রকার ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য জানিয়া মুনিগণ তাঁহার সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিলেন। অবশেষে অঙ্গিরা ও ভৃগুবংশজাত মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমান্‌কে এই শাপ দিলেন - "হে হনুমান্ তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদের উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে বিমোহিত হইয়া দীর্ঘকাল সে শক্তি বিস্মৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন তোমার সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হইয়া কার্য্য করিবে"। ঈদৃশ শাপগ্রস্ত হইয়া হনুমান্ ধীরভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিগণের শাপবশতঃ তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত স্বীয় শক্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন পরে সীতান্বেষণার্থ যুবরাজ অঙ্গদ হনুমান্ এবং জাম্বুবান্ প্রমুখ বানরগণ সহ বহির্গত হইলে বানরবাহিনী যখন শত যোজন বিস্তৃত দুস্তর সাগর অবলোকন করিয়া বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন জাম্বুবান্ হনুমানের বলবিক্রম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদবধি হনুমান্ স্বীয় বলবিক্রম পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপে তিনি শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কানগরীতে সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি বলবিক্রম, শাস্ত্রজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতিগুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষার্থ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য প্রভৃতি মহাগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ আর কেহ ছিল না বলিলেই হয়; ইনি আজীবন অখণ্ডব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি কর্ম্ম সকল বিষয়ে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাবীরের জীবনী হইতে আমরা ২।১টী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। ইঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য সকলেই বিদিত আছেন—কিরূপে তিনি শত যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি তথাকার অসংখ্য রাক্ষস সেনা বধ ও লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি একাকী সমস্ত লঙ্কানগরী ধ্বংস করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করিতে পারিতেন, কেবলমাত্র সীতাদেবীর আদেশক্রমে তাহা করেন নাই। হনুমান্ যখন লঙ্কানগরী ধূলিসাৎ ও রাবণকে নিধন করিবার জন্য সীতাদেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "বৎস! তুমি যে একাকী এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার তাহা আমি জানি, কিন্তু রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যদি রাবণকে স্বহস্তে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, তবে সূর্য্যবংশের অক্ষুণ্ণ গৌরব রক্ষা হয়। সুতরাং তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন কর এবং রামকে সসৈন্যে শীঘ্র লঙ্কায় আসিবার জন্য আমার মিনতি জানাইও"।

সীতাহরণের পর রামলক্ষ্মণ সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন তখন বালি কর্তৃক বিতাড়িত সুগ্রীব তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ হনুমান্‌কে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার কথোপকথন ও বাক্যাবলী শ্রবণে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলেই মহাবীরের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবত্তার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"নানৃগ্বেদ বিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥

ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষপি চ সর্ব্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ কচিৎ॥
অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যমস্বরম্॥
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্ভুতামবিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্॥
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি॥
এবংবিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।
সিধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্য্যাণাং গতয়োঽনঘ॥
এবং গুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্য্যসাধকাঃ।
তস্য সিধ্যন্তি সর্ব্বেঽর্থা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, তৃতীয় সর্গ, ২৭-৩৫)

"ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক শাস্ত্র বহুবার পাঠ করিয়াছেন। বাক্যপ্রয়োগকালে ইঁহার মুখে, নয়নে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই। ইনি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যমস্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিমধুর, সংক্ষিপ্ত ও সরল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ ত্রিস্থানসংযুক্ত স্বরে উচ্চারিত ঐ বিচিত্র বাক্য শ্রবণে কাহার না চিত্ত প্রসন্ন হয়? খড়্গোত্তোলন পূর্ব্বক বধোদ্যত শত্রুর চিত্তও উহা শুনিয়া দ্রব হয়। হে অনঘ! যে রাজার এরূপ দূত না থাকে তাঁহার কার্য্য সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? যাঁহার এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন দূত আছে তাঁহার দূত-বাক্য দ্বারাই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়।"

লঙ্কায় উপনীত হইয়া সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন হনুমান্ রাবণের রাজপ্রাসাদে সুকোমল শয্যাসীনা বিপর্য্যস্তবসনা রত্নালঙ্কারভূষিতা, রূপযৌবনসম্পন্না অনেক নারী দর্শন করিয়াছিলেন,

তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল রামায়ণ হইতে তদ্বিষয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি॥
নহি মে পরদারাণাং দৃষ্টির্বিষয়বর্ত্তিনী।
অয়ঞ্চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ॥
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্য্যনিশ্চয়দর্শিনী॥
কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ।
নতু মে মনসা কিঞ্চিদ্বৈকৃত্যমুপপদ্যতে॥
মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥
নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্।
স্ত্রিয়োহি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে॥
যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎপরিমার্গ্যতে।
ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতুম্॥"

(সুন্দরকাণ্ড, একাদশ সর্গ, ৩৯-৪৫)

"হনুমান্ সেই প্রমদাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলে ধর্ম্মলোপ হয় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, নিদ্রাতুরা বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ম হইবে, কেননা ইতিপূর্ব্বে কখনই পর-নারীর প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। পরস্ত্রী দেখিলাম ইহাতে যে আমার পাপ হইবে এমন নহে, পরদারাপহারী এই পাপিষ্ঠ রাবণকে দেখিলাম বলিয়া নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে। মনস্বী হনুমান্ স্থিরচিত্তে প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বচিন্তা খণ্ডনপূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য বিচারক্ষম অন্য চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শায়িতা রাবণ-মহিলাগণকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমার মন কিছুমাত্র চঞ্চল হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়দিগকে শুভাশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে, সেই মনই যখন আমার বশীভূত রহিয়াছে, তখন আমাকে

পাপস্পর্শ করিবে কেন? আমি বৈদেহীকে আর অন্যস্থানে অনুসন্ধান করিতে পারি না। প্রায়ই দেখা যায় লোকে স্ত্রীদিগের মধ্যেই স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যে যাহার সমান জাতি, সেই জাতির মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। মৃগীদিগের মধ্যে অনুদ্দিষ্টা অঙ্গনার অন্বেষণ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।"

উপরোক্ত শ্লোকাবলী হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মহাবীর শুধু জিতেন্দ্রিয় ছিলেন তাহা নহে, তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কার্য্য করিতেন। 'পরস্ত্রী দর্শনে পাপ হয়' এই নীতি যদি বর্ণে বর্ণে মহাবীর অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক আদৌ সীতাউদ্ধার হইত কিনা সন্দেহ।

সাগরলঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া মহাবীর যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লঙ্কার বন, উপবন, পর্ব্বতকন্দর, প্রাসাদ, ভবন সমস্ত অন্বেষণ করিয়া সীতাদেবীর দর্শন পাইলেন না, তখন তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

সীতাকে প্রথম দর্শনের পর অভিজ্ঞানচিহ্নস্বরূপ মহাবীর যখন রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, তখন সীতাদেবী তাঁহার বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য রামচন্দ্রের অঙ্গচিহ্ন বর্ণন করিতে বলিলেন। বৈদেহীর বাক্য শ্রবণে তিনি যেরূপ ভক্তিগদ্গদচিত্তে রামরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

রাবণ বধের পর বানরগণের সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন সসীতা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন এবং বানরগণকে বিদায় দিবার প্রক্কালে বহু রত্নরাজি উপঢৌকন প্রদান করিলেন; কাহাকেও বা সস্নেহ আলিঙ্গন, কাহাকেও বা মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করিলেন, তখন তাঁহারা কাকুৎস্থ রামের কথা শ্রবণে তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভূয়োভূয়ঃ ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-বন্দনা পূর্ব্বক কি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে

কিরূপ স্নেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তি প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যকথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥
তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তবচর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনুমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সস্বজে স্নেহবাক্যমেতদুবাচ হ॥
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥
তাবত্তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা।
লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ॥
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্॥
ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ॥"

(উত্তরকাণ্ড, পঞ্চাশৎ সর্গ)

"হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি ও ভালবাসা থাকে, আর আমার মন যেন অন্য বিষয়ে লিপ্ত না হয়। ধরাতলে যতদিন রামকথা থাকিবে, ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব সংশয় নাই। আপনার যে দিব্য চরিত বিখ্যাত রহিয়াছে ইহা অপ্সরাগণ আমাকে শুনাইবে। বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে, তদ্রূপ আমিও আপনার চরিতামৃত পান করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

এই কথা শুনিয়া রাম দিব্যাসন হইতে উঠিয়া স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত লোকসমাজে আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া বাস করিবে। অধিক কি, যতদিন এই ত্রিলোক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে। কপিবর! তোমার এক একটী উপকারের জন্য আমি প্রাণদান করিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্টের জন্য আমি ঋণী রহিলাম। তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক, যেহেতু বিপৎকাল আসিলেই মানুষ প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। অনন্তর রামচন্দ্র নিজ কণ্ঠ হইতে বৈদূর্য্যমণিপরিশোভিত রত্নহার হনুমানের গলায় পরাইয়া দিলেন।

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী শ্রবণে সহজে প্রতীয়মান হয় শ্রীশ্রীমহাবীরের ভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল। যাবৎ রামচরিত লোকসমাজে বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ তিনি দেহধারণ করিয়া নামসুধা পান করিবেন, ইহা জগতের ইতিহাসে অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার মনপ্রাণ রামময় ছিল, তিনি রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতেন না। তিনি যেমন কর্ম্মবীর, তেমনি ভক্তচূড়ামণি ছিলেন।

মহাবীর হনুমান্ সর্ব্বনীতিবিশারদ ছিলেন। দেশকালপাত্র বিশেষে সাম দান ভেদ ও দণ্ড নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেন। লঙ্কায় উপনীত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যপদেশে যে ঔপনিষদিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং নরাক্ষসীবুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ॥ ১
ত্বং ব্রাহ্মণোহ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো নাস্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি॥ ২

শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়দুঃখসন্ততির্ন তে ন চ ত্বং তব নির্ব্বিকারতঃ।
অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সন্ততেরসত্ত্বমস্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ। ৩
ইদন্তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়াবিকারহেতুর্ন চ তেঽদ্বয়ত্বতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গতস্ত্বাত্মেতি বুদ্ধ্যাখিলবন্ধভাগ্ ভবেৎ। ৪
চিন্মাত্রমেবাহমজোঽহমক্ষরো হ্যানন্দভাবোঽহমিতি প্রমুচ্যতে।
দেহোঽপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো ন প্রাণআত্মানিল এব এব সঃ। ৫
মনোঽপ্যহঙ্কারবিকারএবনো ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা।
আত্মা চিদানন্দময়োঽবিকারবান্ দেহাদিসঙ্ঘাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ। ৬
নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা জ্ঞাত্বৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে।
অতোঽহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মহামতে। ৭
বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীবনির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ। ৮
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুং বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং।
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ং।
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্রবান্ধবো রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ। ৯

(অধ্যাত্মরামায়ণম্ সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

"হে রাবণ বিবেকবলে লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসারমোচনী দৈবীগতি অবলম্বন কর। তুমি উত্তম বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ, তুমি পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা; দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেও তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর তত্ত্বজ্ঞান মতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি রাক্ষস নহ ইহা আর বলিতে হইবে না। শরীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্ভূত দুঃখরাশি তোমার নহে, এবং তুমিও শরীর, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ; কেননা তুমি নির্ব্বিকার।

যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিতেদেখিতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করে, অথচ বস্তুতঃ তাহা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ এই অজ্ঞানমূলক সুখ দুঃখাদি অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা অলীক। তোমার বিকার নাই, একমাত্র তুমি সত্য, তুমি ভিন্ন অতিরিক্ত বস্তু নাই বলিয়া বিকারের হেতু অজ্ঞানও সত্য

নহে। যেমন আকাশ জগদ্ব্যাপক হইলেও ধূলি প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম তুমি দেহ সংশ্লিষ্ট হইলেও সুখদুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হও না। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি অথবা সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিলেই জীব সকল বন্ধনে বদ্ধ হয়। আমি চৈতন্য মাত্র, আমি জন্মরহিত, আমি অবিনাশী এবং আমি আনন্দস্বরূপ, ইহা বুঝিলে জীব মুক্ত হয়। দেহ আত্মা নহে, কেননা উহা পৃথিব্যাদির বিকারে উৎপন্ন, প্রাণ আত্মা নহে কারণ তাহা বায়ুমাত্র, মন অহঙ্কা-রের বিকার, অতএব তাহা আত্মা নহে, এবং প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন বুদ্ধিও আত্মা নহে। আত্মা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ—তাঁহার বিকার নাই, তিনি কাহারও বিকারসম্ভূত নহেন। আত্মা দেহাদিপ্রকৃতিসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত, ঈশ্বর, নিরঞ্জন ও সর্ব্বদা নিরুপাধি (সুখ দুঃখাদি উপাধিশূন্য)। আত্মাকে এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যাহাতে তোমার এইরূপ ধারণা হয়, সেইজন্য তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে মহামতে! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বিষ্ণুভক্তি হইতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব সেই পুরাণ পুরুষ প্রকৃতির পরস্থিত বিভু রমাপতি শ্রীহরি রামকে ভজনা কর। মূর্খতা ও তাঁহার প্রতি শত্রুতা ত্যাগ কর। সীতাকে প্রত্যার্পণ করিয়া শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুত্রপৌত্রাদি বন্ধু বান্ধবগণ সহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

উপসংহারে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং মহাবীর হনুমান্ সম্বন্ধে উত্তরকাণ্ডে কি বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"অতুলং বলমেতদ্বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
নত্বেতাভ্যাং হনূমতা সমমিতি মতির্মম॥
শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ॥

দৃষ্টৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা।
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতা চাপি সীতাপ্যাশ্বাসিতা তথা ॥
সেনাগ্রেগামন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ।
এতে হনূমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ ॥
ভূয়ো বন্ধাদ্বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী ॥
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্ম্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনুমতঃ ॥
এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥
হনূমান্ যদি মে ন স্যাদ্বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥

(উত্তরকাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ)

"বালির এবং রাবণের বলের তুলনা নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা কেহই হনূমানের সমকক্ষ নহে। বিশেষতঃ শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্রকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নয়সাধন, বিক্রম এবং প্রভাব সমস্ত গুণই একাধারে হনূমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য যখন অবসন্ন হইল, তখন মহাবাহু হনুমান্ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া শতযোজন বিমানপথে অতিক্রম করিলেন। লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শনলাভকরতঃ মিষ্টবচন দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, সেনাপতিগণ মন্ত্রিতনয়গণ, ভৃত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে হনুমান্ একাকী তথায় নিহত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অগ্নিসংযোগে মেদিনীর ন্যায় লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছেন। যুদ্ধে হনুমানের যেরূপ পরাক্রম দেখিয়াছি তাহা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও শ্রুত হয় না। ইহার বাহুবলপ্রভাবে রাজ্য, জয়, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছে।

বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার সহায় না হইত, তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধান করিতে আর কে পারিত?"

প্রাগুক্ত রামায়ণোদ্ধৃত শ্লোকাবলী পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কি ঔপনিষদিক জ্ঞানবাদ, কি গীতোক্ত কর্ম্ম ও কি ভক্তিবাদ সকল বিষয়ে মহাবীর জগতে উচ্চতম আসন লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হনুমান্‌জী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হনুমান্ বার তিথি নক্ষত্র জানিতেন না, কেবল রাম চিন্তা করিতেন। তিনি বলিতেন, 'রাম, কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, কখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ, কখনও দেখি তুমিই আমি আমিই তুমি।'" ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ এই ভাবত্রয়ের পূর্ণবিকাশ মহাবীরের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চাধিকার চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্য নির্ণয় করে। যিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি তত দৃঢ় হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সাহায্যে যে সমস্ত উচ্চ বিষয় ধারণা করা যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিকের মনে তদপেক্ষা উচ্চতর অতীন্দ্রিয় বিষয় স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পায়।

ধর্ম্মজগতে মহাবীর কত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার আজীবন প্রভুসেবা, প্রভুভক্তি ও প্রভুচিন্তা জগতে অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি যে সর্ব্বনীতিবিশারদ, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ হইবেন এবং অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল উপলব্ধি করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কে তাঁহার ন্যায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রভুকার্য্যে জীবনপাত করিয়াছেন, কে তাঁহার ন্যায় প্রভুর নামসুধা পান করিবার জন্য চিরকাল অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করিয়াছেন, কে তাঁহার ন্যায় শত যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপ্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং শত্রুকুল নিধন করিয়া বীরত্বের অমর কীর্ত্তি স্থান করিয়াছেন? বস্তুতঃ, একাধারে এরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূর্ত্তি জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না।

গত চৈত্রপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীমহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষে রাঁচিতে পঠিত।

ওঁ বেদস্তুতি।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(১)

নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জনককে বেদসমূহের ব্রহ্মপরত্ব অর্থাৎ বেদ সকল কেবল ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে এই উপদেশ দিলেন। রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ হয়, বেদ ব্রহ্মপর হইবে কিরূপে ? বেদ, শব্দরাশি মাত্র। শব্দের মায়াময় বস্তুতে প্রবৃত্তি হইতে পারে, মায়াতীত বস্তুতে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রকারে ? শব্দের প্রবৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্যা, গৌণী ও লক্ষণা। ঘট শব্দ উচ্চারিত হইলে বস্তু ঘটকে নির্দ্দেশ করে, ইহাই শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, অতএব ব্রহ্মে মুখ্যা-বৃত্তি সম্ভব নহে। গৌণীর উদাহরণ "দেবদত্ত সিংহ ?" অর্থাৎ দেবদত্তের সিংহের ন্যায় বলবিক্রম। ব্রহ্মে গৌণীবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম নিগুর্ণ। লক্ষণার উদাহরণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতে আভীরপল্লী বাস করে। "গঙ্গাতে" শব্দের মুখ্য অর্থ গঙ্গার জল-প্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা সম্ভব নহে, সে জন্য লক্ষণা দ্বারা গঙ্গার তীর বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণা প্রবৃত্তি মায়াময় বস্তুতে সম্ভব হইতে পারে বটে। কিন্তু ব্রহ্ম কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত বস্তু, সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণা সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্ম কোন পদের অর্থ নহেন। পদের যদি অর্থ না হন, বাক্যেরও অর্থ হইতে পারেন না। অতএব নিগুর্ণ ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহেন। সেজন্য রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পরীক্ষিদুবাচ—

ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নিগুর্ণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥

হে ব্রহ্মণ্! "গুণবৃত্তয়ঃ শ্রুতয়ঃ" শব্দরাশি মাত্র শ্রুতিরা "সাক্ষাৎ কথং ব্রহ্মণি চরন্তি" সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবে? কারণ, "অনির্দ্দেশ্যে" ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য—ব্রহ্মের আকার নাই, জাতি নাই, গুণ নাই; অতএব মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা বেদের ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "নির্গুণে" গৌণীবৃত্তি দ্বারাও ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ—কোন ধর্ম্ম তাঁহাতে নাই। লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম "সদসতঃ পরে"—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অতীত বস্তু।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবের ভোগমোক্ষ।

শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্‌জনানামসৃজৎ প্রভুঃ॥
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥ ২॥

"প্রভুঃ" ঈশ্বর "জনানাম্" অনুশয়ী জীবের "বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্" বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ "অসৃজৎ" সৃজন করিয়াছেন। (১) "মাত্রার্থং" মাত্রা অর্থাৎ প্রমিতির বিষয় অর্থাৎ অর্থ। বিষয়ার্থ বুদ্ধি সৃজন করিয়াছেন। (২) "ভবার্থং" ভব অর্থাৎ জন্ম। জন্ম কর্ম্মজন্য। ইন্দ্রিয় না থাকিলে কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছেন। (৩) "আত্মনে" আত্মা লোকান্তর গামী। মন বিনা লোকান্তর গমন হয় না। লোকভোগার্থ মন সৃজন করিয়াছেন। (৪) "অকল্পনায়" কল্পনা মায়া, কল্পনানিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্য প্রাণ সৃজন করিয়াছেন। প্রাণ বিনা মোক্ষ সম্ভব হয় না। জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, সে জন্য তিনি "প্রভু" অর্থাৎ নিত্যমুক্ত। জীবের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের জন্য যথাক্রমে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃজন করিয়াছেন।

ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সৈষাহ্যুপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েৎ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ॥ ৩॥

"সা এষা ব্রাহ্মী উপনিষৎ" এই ব্রহ্মপরা উপনিষৎ "পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বৈঃ" অতিবৃদ্ধ সনকাদি "ধৃতা" ধারণ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তনও "যঃ" যে "তাং" সেই উপনিষৎকে "শ্রদ্ধয়া" আদরের সহিত "ধারয়েৎ" ধারণ করিবে, অর্থাৎ বাজে তর্ক না করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ধারণ করিবে, "সঃ" সেইব্যক্তি "অকিঞ্চনঃ" দেহবুদ্ধিশূন্য হইয়া "ক্ষেমং গচ্ছেৎ" পরপদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহা উপনিষৎ। ত্রিবর্গ সাধনপরা উপনিষৎ ত্রিবর্গনিষ্ঠ মরীচ্যাদি ঋষিগণ ধারণ করিয়াছিলেন। আর ব্রহ্মপরা অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা উপনিষৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সনকাদি ঋষিগণ ধারণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ-নারদ-সংবাদ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্॥
নারদস্য চ সংবাদমৃষে র্নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥

"অত্র" এবিষয়ে "নারায়ণান্বিতাম্" নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত "গাথাং" ইতিহাস "তে বর্ণয়িষ্যামি" তোমাকে বলিতেছি। "ঋষেঃ নারায়ণস্য" ঋষি নারায়ণ ও "নারদস্য সংবাদম্" নারদের সংবাদও বলিতেছি। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট শুনিয়া সনন্দনদি যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন।

বদরিকাশ্রমে নারদের গমন।

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ॥
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্॥ ৫ ॥

একদা "ভগবৎপ্রিয়ঃ নারদঃ" ভগবৎপ্রিয় নারদ "সনাতনম্ ঋষিম্" পুরাতন ঋষি শ্রীনারায়ণকে "দ্রষ্টুম্" দেখিতে "নারায়ণাশ্রমম্ যযৌ" নারায়ণাশ্রম অর্থাৎ কলাপগ্রামাখ্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

কল্পারম্ভ হইতে অদ্যাপি নারায়ণের তপস্যা।

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ॥ ৬ ॥

"অস্মিন্ ভারতবর্ষে" এই ভারতবর্ষে "যঃ বৈ" যে শ্রীনারায়ণ ঋষি

"নৃণাম্" মানুষের "ক্ষেমায়" ঐহিক সুখের জন্য "স্বস্তয়ে" আমুষ্মিক মঙ্গলের জন্য "ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতং তপঃ" দয়া, তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত তপস্যা "আকল্পাৎ" কল্পের প্রথম হইতে "আস্থিতঃ" অদ্যাপিও করিতেছেন।

নারদ প্রশ্ন।

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ॥
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥ ৭ ॥

হে কুরূদ্বহ! "কলাপগ্রামবাসিভিঃ" কলাপগ্রামবাসী শ্রীনারায়ণের ঋষিগণ শিষ্য কর্তৃক "পরীতং" পরিবেষ্টিত হইয়া "তত্র উপবিষ্টম্" সেই আশ্রমে উপবিষ্ট (অর্থাৎ ব্যগ্রতারহিত) ঋষি নারায়ণকে নারদ "প্রণতঃ" প্রণাম করিয়া "ইদম্ অপৃচ্ছৎ" এই প্রশ্ন সর্ব্ব সমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ তুমি অদ্য আমাকে যে প্রশ্ন করিলে সেই প্রশ্ন করেন।

জনলোকবাসিগণের ব্রহ্ম নির্ণয়।

তস্মা অবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিমম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

"ভগবান্" নারায়ণ "শৃণ্বতাম্ ঋষীণাম্" অন্য শ্রোতা ঋষিদের সম্মুখে "তস্মৈ" নারদকে "ইদম্ অবোচৎ" এই কথা বলিলেন। "যঃ" যাহা "পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্" জন, তপঃ, সত্যলোক-নিবাসী বৃদ্ধগণের "ব্রহ্মবাদঃ" ব্রহ্মবিষয়ক নির্ণয়। [জন অর্থাৎ জন, তপঃ, ও সত্যলোক]

জনলোকে ব্রহ্মসত্র।

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

"শ্রীভগবান্" ঋষি নারায়ণ বলিতেছেন—"হে স্বায়ম্ভুব!" নারদ

"পুরা" কল্পের আদিতে "জনলোকে" জনলোকে "তত্রস্থানাং মানসানাং" তত্রস্থ মানসজাত "ঊর্দ্ধরেতসাম্ মুনীনাম্" ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রতধারী মুনিদের মধ্যে "ব্রহ্মসত্রম্ অভবৎ" ব্রহ্মসত্র হইয়াছিল। [যেখানে সমান যজমানগণের মধ্যে একজন ঋত্বিক্ হইয়া কর্ম্ম করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের সকলের তুল্যফল হয় সেই কর্ম্মকে কর্ম্মসত্র বলে। যেখানে সমান সাধুরা ব্রহ্মজ্ঞাপনার্থ একজন বক্তা অপরে শ্রোতা হইয়া ব্রহ্মমীমাংসা করেন, উহা ব্রহ্মসত্র।]

মনুষ্যলোকে এ বিষয়ে এই প্রথম প্রশ্ন।

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়োঃ যত্র শেরতে।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্ন স্তং মাং যমনুপৃচ্ছসি॥ ১০॥

তুমি ইহা জানিতে পার নাই, কারণ, "তদীশ্বরম্ দ্রষ্টুং" তত্রস্থ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে "ত্বয়ি শ্বেতদ্বীপং গতবতি" তুমি শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলে। সেই সময়ে "যত্র শ্রুতয়ঃ শেরতে" যেখানে শ্রুতিরা নিদ্রা যায় অর্থাৎ নিবৃত্ত ব্যাপার হয়, "তত্র" সেই জনলোকে "ব্রহ্মবাদঃ" ব্রহ্মবিচার "সুসংবৃত্তঃ" আরম্ভ হইয়াছিল। "ত্বং মাং যম্ অনুপৃচ্ছসি" যে প্রশ্ন তুমি আমাকে করিতেছ "তত্র" সেই জনলোকে "অয়ম্ প্রশ্নঃ" এই প্রশ্ন "অভূৎ" হইয়াছিল। জনলোকের পর তুমি এই প্রশ্ন করিলে। তোমার পূর্ব্বে এখানে আর কেহ এ প্রশ্ন করে নাই।

সনন্দন বক্তা, সনকাদি শ্রোতা।

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥ ১১॥

"তুল্যশ্রুততপঃশীলাঃ" জনলোকে তাঁদের অধ্যয়নাদি তুল্য, জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি তুল্য, স্বভাব তুল্য। "তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ" সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হেতু তাঁহাদের মিত্র, অরি ও উদাসীনের প্রতি সমদৃষ্টি ছিল অর্থাৎ তাঁহারা নিরুপম করুণ। "অপি" অতএব সকলেই প্রবচনযোগ্য। তথাপি শ্রৌতবিচারকুতুহলবশতঃ "একম্" সনন্দনকে

"প্রবচনম্" প্রবক্তা করিলেন। "অপরে শুশ্রূষবঃ" সনকাদি অপর ঋষিগণ শ্রোতা হইলেন অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তা হইলেন। একজনকে বক্তা না পাইলে স্ফূর্ত্তি হয় না।

শ্রুতিগণের নিদ্রিত ভগবান্‌কে প্রবোধন।

শ্রীসনন্দন উবাচ—

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥ ১২।

সনন্দন বলিতেছেন—"স্বসৃষ্টম্ ইদম্" নিজসৃষ্ট এই বিশ্ব "আপীয়" প্রলয়কালে সংহার করিয়া "শক্তিভিঃ সহ শয়ানং" সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষকালাদি শক্তিসহ যোগদেহনিদ্রিতের ন্যায় বর্ত্তমান "পরম্" ভগবান্‌কে "তদন্তে" প্রলয়ান্তে "শ্রুতয়ঃ" প্রথম নিশ্বাসাবির্ভূত শ্রুতিরা অর্থাৎ শ্রুত্যধিষ্ঠাতৃ দেবতারা "তল্লিঙ্গৈঃ" ঈশপ্রতিপাদক বাক্য দ্বারা "বোধয়াঞ্চক্রুঃ" প্রবোধন করিতে লাগিলেন।

স্তাবকের ন্যায় শ্রুতিগণের ভগবান্‌কে প্রবোধন।

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ॥
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥ ১৩॥

"যথা" যেরূপ "শয়ানং সম্রাজং" শয়ান সম্রাট্‌কে "প্রত্যূষে" প্রাতঃকালে "অনুজীবিনঃ বন্দিনঃ" অনুজীবী স্তাবকেরা "অভ্যেত্য" জানুপাতিয়া "তৎপরাক্রমৈঃ সুশ্লোকৈঃ" সম্রাটের দিগ্বিজয়াদি ও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি পরাক্রমবোধক শোভন কীর্ত্তিবচন দ্বারা "বোধয়ন্তি" প্রবোধন করে।

শ্রুত্যধিষ্ঠাতৃ দেবতারা বর্ণভেদে অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়া অষ্টাবিংশতি পদ্য দ্বারা স্তব করিতেছেন।

(১)

জীবের অবিদ্যানাশ কেবল ভগবান্ করিতে পারেন। ব্রহ্ম যে কি তাহার প্রমাণ কেবল শ্রুতি।

শ্রীশ্রুতয় উচুঃ—

> জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
> ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
> অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকতে
> ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ১॥ ১৫॥

প্রথম শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা বলিতেছেন,

হে অজিত! জয় জয়। উৎকর্ষ আবিষ্কার কর।

প্রশ্ন—কিরূপে উৎকষ আবিষ্কার করিব?

উত্তর—"অগজগদোকসাম্ অজাং জহি" স্থাবর জঙ্গম শরীরী জীবের "অজাং" অবিদ্যা নাশ কর। [অগ—স্থাবর, জগৎ—জঙ্গম, ওকঃ—বাসস্থান।]

প্রশ্ন—গুণবতী অবিদ্যাকে কেন নাশ করিব?

উত্তর—সত্য বটে অবিদ্যা গুণবতী। কিন্তু "দোষগৃভীতগুণাং" আনন্দ আবরণের জন্য অবিদ্যা গুণগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বৈরিণীর ন্যায় পরপ্রতারণার জন্য গুণগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব হন্তব্যা। [গৃভীত—গৃহীত, ভকার ছান্দস।]

প্রশ্ন—তাহা হইলেও আমাতে দোষ পড়ে।

উত্তর—"যৎ ত্বম্" যেহেতু তুমি "আত্মনা" স্বরূপে "সমবরুদ্ধ-সমস্তভগঃ" সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্প্রাপ্ত হইয়া আছ। তুমি মায়াকে বশ করিয়া আছ। মায়া তোমার বশে। তুমি মায়ার বশে নহ।

প্রশ্ন—জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা অবিদ্যা নাশ করুক না কেন?

উত্তর—তুমি যে "অখিলশক্ত্যববোধকঃ" অখিল শক্তির অববোধক। তুমি জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তির উদ্বোধক। অতএব জ্ঞানের পূর্ব্বে জীব স্বতন্ত্র নহে। জীব তোমার অধীন। "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

প্রশ্ন—আমি অকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট এ বিষয়ে প্রমাণ কি?

উত্তর—শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ।

"ক্বচিৎ" কদাচিৎ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির সময় "অজয়াচরতঃ" মায়ার

সঙ্গে ক্রীড়া কর "আত্মনা চ" তখনও তোমার ঐশ্বর্য্যের লোপ হয় না অর্থাৎ তুমি সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ একরস আত্মরূপে বর্ত্তমান থাক। সেই সৃষ্ট্যাদি সময়ে "নিগমঃ অনুচরেৎ" বেদসমূহ তোমাকে প্রতিপাদন করে। ["চরতঃ বর্ত্তমানস্য তব" কর্ম্মে ষষ্ঠী] অর্থাৎ বেদসমূহ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং বলিয়া তোমাকে প্রতিপাদন করে।

প্রশ্ন—বেদ কিরূপে আমাকে প্রতিপাদন করে?

উত্তর—(১) ভৃগু বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মের লক্ষণ কি? বরুণ বলিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, প্রাণ ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়, নাশ কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে এবং তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশকালে ভূতগণ "আত্মতা" ত্যাগ করিতে পারে না সেই হেতু উহাই ব্রহ্মের লক্ষণ।

(২) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।" যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদিকে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাকে বেদরাশি প্রদান করিয়াছেন মুমুক্ষু আমি সেই জ্যোতিমান্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবের আশ্রয় লইলাম।

(৩) উদ্দালক—অন্তর্য্যামী কে বলুন?

যাজ্ঞবল্ক্য—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যং আত্মা ন বেদ যস্য আত্মা শরীরম্ য আত্মানমন্তরো যময়তি এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" যিনি জীবাত্মাতে অবস্থিত হইয়াও জীবাত্মা হইতে দূরস্থ আত্মা, এই জীবাত্মা যাঁহাকে জানেন না, যাঁহার শরীর এই জীবাত্মা, যিনি জীবাত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া নিয়মন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।

(৪) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম।

(৫) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ যঃ সর্ব্ববিৎ।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ যিনি সর্ব্ববিৎ তিনিই ব্রহ্ম। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তোমাকে এইরূপে প্রতিপাদিত করে।

স্বামিকৃত স্তব।

জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপানীতমৃষা গুণাম্।
নহি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণব তানব॥

হে অজিত! জয় জয়! স্থাবর জঙ্গম জীবের আনন্দাবরক মিথ্যাগুণালঙ্কৃতা অবিদ্যাকে নাশ কর! হে নিগমগীতগুণার্ণব! তোমা ছাড়া জীবগণের উৎকর্ষ হইতে পারে না। স্থাবর জঙ্গম জীবগণকে "অব" রক্ষা কর।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

মঠ, বেলুড়।
১৪।১২।১৫।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

মা— তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত শুক্রবারে মহারাজ এখানে এসেছেন। তাঁহাকে তোমার চিঠির কথা শুনাইলাম, তুমি এখানে আসিতেছ শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। —র শ্রীচরণ দর্শন করে তোমার বাসনা তৃপ্ত হয়েছে এ অতি সৌভাগ্যের বিষয় জানিবে। তুমি যথার্থই ভক্ত লোক। এখানে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কর আমার ইচ্ছা। আর ঞ— বী— এদেরও একবার করে তাঁর দর্শনে পাঠাবে। ওখান থেকে কেহ না অমনি ফেরে। যা খরচা হয় আমায় লিখিলে পাঠাব। গুরুদর্শনে রিক্ত হস্তে যেতে নেই, কিছু কিছু নিয়ে যাবে। তাঁর কাজ কর্ম্ম ভাল করে দেখে শিখে আস্‌বে—জীবন কি করে চালাতে হয়।

কেবলমাত্র জপ কল্লেই সিদ্ধ হয় না। আদর্শ জীবন না দেখ্‌লে, কি করে বুঝ্‌বে আমাদের উদ্দেশ্য এই? ঐ স্থানে থেকে কিছুদিন তাঁর সেবা করে ধন্য হয়ে যাও, মানবজীবন সার্থক কর—ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। কি ধৈর্য্য, কি ক্ষমা, কতই সহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি ঘর করেন এইখানেই দেখ্‌বে। অমনটী জগতে আর কখনও হয় নাই ইতিপূর্ব্বে। তাঁহাকে দেখে যদি জীবন তৈয়ার না হয় তবে আর আশা নাই জান্‌বে। তাঁকে দেখাও যা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাও তাই। এই খানেই তিনি কি বস্তু ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে। কত উদার, কত ভালবাসা অনুভব কর্‌বে। তাঁকে দেখ্‌লে অভিমান অহঙ্কার নিশ্চয় পালাবে। ভাল করে তাঁর আচরণগুলি শেখ্‌বার চেষ্টা করো। তাঁর অসীম কৃপা জীবের উপর। আমরা এক কণা পেলেই পূর্ণ হয়ে যাব। ক্ষুদ্র আধার নিয়ে এসেছি, কত আর ধর্‌বে? মগ্ন হও, ডুবে যাও, এই প্রার্থনা। তোমরা সবাই আমার ভালবাসা জান্‌বে। আমি তোমাদের তোমরা আমার। ইতি—

তোমাদেরই প্রেমানন্দ।

---

(২)

বেলুড় মঠ।
৬।৪।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ওখানকার কার্য্য উত্তমরূপে চল্‌ছে জেনে সকলেই আনন্দিত। বিশ্বাস কর,—যা কিছু হচ্ছে জান্‌বে প্রভুর শক্তিতে, তোমরা যন্ত্র মাত্র। ঐ কর্ম্মকে কর্ম্ম মনে কর্‌বে না, কেবল নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তে চেষ্টা করিও। ওতেই বন্ধন ছুটে যাবে। একই ঔষধে অনুপান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়। তেমনই কর্ম্মই বন্ধন, আবার অনাসক্ত হয়ে ভগবৎ উদ্দেশে কর্ত্তে পাল্লে ওতেই ভক্তি মুক্তি লাভ হয়। নাম, লৌকিকতার দিকে নজর

রাখ্‌লেই গোল বাধে।—কে বলিও ঐ কর্ম্মকে সাধন ভজন ত্যাগ তপস্যা যেন মনে করে। দেখেছি, বসে বসে ধ্যান কত্তে গিয়ে ঢুলছে। এই চাও না সেবা কত্তে কত্তে দিলাম শরীরপাত করে—কোনটা শ্রেষ্ঠ? তবে গোঁ কিম্বা অতি পরিশ্রম উচিত নয়। শরীরের দিকে খুব নজর রাখ্‌বে। সময়ে স্নান আহার বিশেষ দরকার। নিয়মমত নিদ্রা চাই। সকল কাজ ভালবাসা দ্বারা যেন চলে, কঠোর আইন কানুন ভাল নয়। স্নেহ, প্রীতি, প্রেম যেন তোমাদের মূল মন্ত্র হয়। এতেই ছেলেরা মেতে যাবে—প্রাণ দেবে। মঠে থেকে থেকে এই শিখিছি যে, ছেলেরা যদি কোন দোষ করে, বিচার করে দেখি, সেটা তাদের দোষ নয়, যা কিছু অপরাধ সে আমারই। তাই আপনার কল্যাণ যদি চাও নিজের দুর্ব্বলতা শোধরাতে চেষ্টা কর। সর্ব্বদা আপনার দিকে দৃষ্টি রাখ। যদি খুঁত হয় সে আমারই, ঠাকুর ইহা খুব শিখাচ্ছেন। যদি বড় হতে চাও, সকলকে বড় দেখ—মহৎ দেখ। বীর বিবেকানন্দের আদেশ—'হে বঙ্গীয় যুবকগণ তোমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হবেই হবে।' সাক্ষাৎ শিববাক্য, বিশ্বাস কর। * * * যুবকগণ, সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তোমাদের আদর্শ, উহাই অনুসরণ কর, তবেই নব বলে বলীয়ান্ হবে নিশ্চয় জেনো। সর্ব্ব-শক্তির আধার আমাদের প্রভু! * * * সুবিধা মত পড়াশুনা করবে। লোকজনের সঙ্গে খুব মিশ্‌বে, নারায়ণ জ্ঞানে।— কে বলো কিছু ভাবনা নাই। মহারাজ তার কথা অনেক সময়েই জিজ্ঞাসা করেন। তোরা হচ্ছিস মা'র সন্তান, তোদের আবার ভয় ভাবনা কি? * * * মহারাজ ভাল আছেন। মঠের মঙ্গল, আজ কাঁথী যেতে হবে চার জনের। মঠে নিত্য উৎসব চলেছে। সাড়া পড়ে গেছে জগৎ জুড়ে। এখন কেবল 'লোক পাঠাও' 'লোক পাঠাও' এই রব শুনছি। শান্তিপ্রচারে তোমাদের জীবন আহুতি দাও। আমাদের ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(৩)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
২৭।৪।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

ম— তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। * * * মিশনের ঘর বাড়ী হচ্চে—উত্তম, সেই সঙ্গে তোমাদেরও ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ বৈরাগ্য বাড়ুক্, নতুবা ঐসব ঐশ্বর্য্য বন্ধন ও বিড়ম্বনার কারণ মাত্র। তোমরা সকলে —র কাছে দীক্ষা নিয়েছ, ঘর দোর ত্যাগ করে এসেছ, ভক্তি-মুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তত্রাচ যে তোমরা তিন জনে একমন একপ্রাণ হতে পাচ্ছনা এ অতি আক্ষেপের বিষয়! আমরা যে বলে বেড়াই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সব এক হতে হবে; এগুলি কি কথার কথা—মনের ব্যথা নয়? তবে আর আমাদের —র দর্শনে কি লাভ হল? কি শিখ্‌লুম তাঁর অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবন দেখে? প্রভুদর্শনে সব বন্ধন কেটে যায়, যেমন সূর্য্যোদয়ে আঁধার পালায়। আমাদের কি অভিমান-আঁধার দূর হয়ে ভক্তি প্রেমের উদয় হবে না? * * * তিনটে লোক এক হতে পার না, দম্ভ দূর কত্তে পার না, ভালবাসায় মেতে আপন-হারা হতে পার না, জ্যান্তে মরা হতে পার না, আবার চাও কিনা ভগবান্? তোমরা নাকি আবার ঠাকুর পূজা কর, * * শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর – ধিক্ তোমাদের! যদি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা না থাকে তবে তোমাদের পড়াশুনা পাঠ পূজা প্রচার সব কথা!

ঠাকুর বলেছেন, ভক্তের জাতি নাই। আমরা যে জগৎ জুড়ে একটা জাত বাঁধবার ইচ্ছা করি। * * * দেখ বাবা, এখনও সময় আছে। তোমরা ছেলে মানুষ, তোমাদের মন কাঁচা, প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে কাঁদ ও প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেনই দেবেন। 'আমি' 'আমার'গুলো ফেলে দাও। আজ থেকে একমন একপ্রাণ তোমাদের হয়ে যাক্ প্রভুর কৃপায়। তিনি তোমাদের শুভ বুদ্ধি দিন এই নিবেদন। মনের কথা যখন বলে ফেলেছ তাতে ভালই হবে।

তোমার একলার জন্য নয়, সকলের জন্যই ইহা লিখ্‌লাম। তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই, কাহারও উপর নাই। তোমাদের কল্যাণের জন্যই লিখ্‌লাম, তোমাদের আপনার ভাবি বলে। * * * ভালবাসা এলে গলে যাবে, আনন্দ পাবে। ভাল ভাল জিনিষ পেলে নিজে না না খেয়ে ভাইদের খেতে দিও, এই করে ভাব বাড়ে ভক্তি আসে। পরস্পর কেবল গুণ দেখ্‌বে, দোষের দিকে মোটেই নজর দেবে না। দোষ দেখ্‌ব—কি বিপদ! ওতে কোন লাভ নাই। আমরা এই ভাবে বরানগরে ছিলাম। উত্তম দ্রব্য পেলেই ভাইদের খাওয়াতাম। আমার আবার হাত পা ধরে মুখে গুঁজে দিত উত্তম খাবার। একদিন নরেনকে দেখ্‌তে না পেলে দৌড়ুতুম কল্‌কাতা। আর নরেনের কি টান, কি অসীম স্নেহ—শেষ দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত! সে সব যেন এখন উপকথা! দেখ রা— ভায়া মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে শুন্‌লে আমার ভিতরটা যেন ফাঁক হয়ে যায়, খালি খালি বোধ হয়।

মনটা কিছু না কিছু নিয়ে থাক্‌বেই থাক্‌বে, তবে ভক্ত ভগবান্ নিয়ে থাকা ভাল। যখন ঘর ছেড়েছ, তখন ভক্তদের পরম আত্মীয় বলে জান্‌বে। এরই নাম সাধন ভজন, যোগ যাগ, ত্যাগ তপস্যা। ভালবাসায় হয়ে যাও আত্মহারা–মাতোয়ারা, ভুলে যাও 'আমি' 'আমার'। দেখ্‌বি ক্ষুদ্র 'কাঁচা আমি'টা গেলে ভিতর থেকে আসল বস্তু বেরোবে, আর মহানন্দে চিদানন্দে ভাস্‌বি!

দেখ্, তোদের আপনার মনে করি তাই মন্দ বলি, মঙ্গলের জন্য। আর কারুকে পর কত্তে ইচ্ছা হয় না, সারা সংসারকে আপন কত্তে ইচ্ছা করে। দুনিয়া শুদ্ধ আপনার হয়ে যাক্।

চা—দাদার কাছে চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, কথামৃত, স্বামিজীর গ্রন্থাবলী, বীরবাণী এই সব পড়্‌বে, আর ধ্যান, জপ, বিচার কর্ব্বে। নিজ নিজ দোষ বা'র কত্তে চেষ্টা ও শোধরাবার কৌশল শিক্ষার নাম সাধন। পরের গুণ সর্ব্বদা দেখ্‌লে ও সাধ্যমত অনুকরণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হওয়া যায়। এই জীবনে যদি সিদ্ধ হতে না পার তবে সহস্র জন্মে হয় কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস কর এই শরীরেই

হবে—হবে—হবে, মোহ কেটে যাবে, আঁধার দূর হবে। * * * সবাই ভাল এই 'আমি'ই মন্দ, এইটাকে দূর কত্তে পারলেই বেড়ার বাহির হওয়া যায়।

সকলকে—যে যে আছে প্রত্যেককে—আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবে ও তুমি জানবে। আমরা ভাল আছি। খুব ধূম চলেছে মঠে। চারদিক্ হতে নিমন্ত্রণ আস্‌চে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।*

(শ্রীগোকুল দাস দে, এম এ)

বৈরাগ্যের লীলাভূমি ভারতগৌরব শৈলরাজ হিমালয়ের সানুদেশে শাক্যপুরী নামে একসময় এক ক্ষুদ্র জনপদ বর্ত্তমান ছিল। সেই পুণ্য পুরীই শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মস্থান। রোহিণী নদী এই স্থানটীর পাদমূলে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে ধনধান্যে সর্ব্বদা পূর্ণ ও অতুল-বৈভবশালী করিয়াছিল। বহুপূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুরাজ তাঁহার প্রিয়তমা রাণীর সন্তানকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছায় অপর মহিষীজাত করণ্ডক, হস্তীনিক এবং সিনিপুরকে নির্ব্বাসিত করেন। ইঁহারাই শাক্যজাতির আদিপুরুষ। গরিমাপূর্ণ ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্যগণ কখন নিজ জ্ঞাতিবর্গ ছাড়িয়া ভিন্ন কুলে বিবাহাদি বা অন্য কোন ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে যাইতেন না। স্বদেশনিবদ্ধ এই শাক্যজাতি শ্রীবুদ্ধের জন্মপরিগ্রহের সময় বিলাসবৈভবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য অন্য জাতির নিকট কোন প্রয়োজনে কখন দ্বারস্থ হন নাই বা মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদিগের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তাঁহারা কখনও হিংসাপরবশ হইয়া কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না। সংগ্রামে শত্রুর প্রাণনাশ তাঁহাদের বড়ই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল বলিয়া

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীবুদ্ধোৎসব সভায় পঠিত।

কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহাদিগকে দেখা যাইত না। তখন মহারাজ শুদ্ধোদন শাক্যদিগের নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

"ভূভৃৎপরার্ধ্যোঽপি সপক্ষ এব প্রবৃত্তদানোঽপি মদানুপেতঃ।
ঈশোঽপি নিত্যং সমদৃষ্টিপাতঃ সৌম্যস্বভাবোঽপি পৃথুপ্রতাপঃ॥"

তিনি রাজাধিরাজ হইয়াও স্বজনমণ্ডলীবেষ্টিত থাকিতেন, তিনি দানে মুক্তহস্ত হইয়াও অহঙ্কারবর্জ্জিত ছিলেন, একছত্র সম্রাটের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়াও তাঁহার পক্ষপাত ছিল না এবং প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব সৌম্য ছিল। মহারাজ শুদ্ধোদনমহিষী মায়াদেবী

"প্রজাসু মাতেব হিতপ্রবৃত্তা গুরৌজনে ভক্তিরিবানুবৃত্তা।
লক্ষ্মীরিবাধীশ কুলে কৃতাভা জগত্যভূত্তমদেবতা যা॥"

মাতার ন্যায় প্রজাদিগের মঙ্গলবিধানে যত্নবতী ছিলেন। স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভক্তির ন্যায় গুরুজনের সেবায় নিরত থাকিতেন এবং রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই বংশের প্রদীপস্বরূপ হইয়া জগতের সম্পৎবিধায়ক শ্রেষ্ঠ দেবতার মত বিরাজ করিতেন।

তখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তসমাজ বিলাসিতার বিপুল স্রোতে নিমগ্ন হইয়া এক মহা বিপদের দিকে তাড়িত হইতেছিল। ধর্ম্মকে ইহলোক-সর্ব্বস্ব ভোগতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত করিয়াও লোকে তৃপ্তি পাইতেছিল না। অতৃপ্ত বাসনায় ইহলোকে অধিকতর ভোগসুখের জন্য এবং পরলোকে তদপেক্ষাও সুখকর স্বর্গলাভের আশায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে অপরিসীম পশুহত্যা, এমন কি, নরহত্যাও সাধিত হইত। কেবল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু ব্যতীত ভোগের আর অন্য অন্তরায় ছিল না। বোধহয় তাহারা জগৎকারণ ঈশ্বরকেও সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময় বোধিসত্ব ৩০টী পারমিতায়পূর্ণ হইয়া তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবমণ্ডলী আসিয়া তাঁহাকে নরলোকের এই দারুণ দুরবস্থা মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অবতরণের সহায়-স্বরূপ ৫টী মহাবিলোকন (দর্শনযোগ্য বস্তু) যথা, (১) সময় (২) মহা-দেশ, (৩) দেশ, (৪) জাতি এবং (৫) গর্ভধারিণীর অন্বেষণ করিয়া

দেখিলেন অবতীর্ণ হইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখন তিনি জন্মগ্রহণের জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র মহাদেশ ভারতভূমির অন্তর্গত শাক্যস্থান, শাক্যজাতি ও জননী মায়াদেবীকেই নির্দ্ধারিত করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক আষাঢ় পূর্ণিমায় চিন্ময় মহাকায় ষড়্দন্তযুক্ত শ্বেতহস্তীর আকারে উত্তরাস্য হইয়া জননীগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে বৈশাখী পূর্ণিমার উদয় হইল। পূর্ণগর্ভা মায়াদেবী লুম্বিনী-উদ্যানে সমাগতা। তখন নিদাঘসমাগমে সমস্ত উদ্যান এক রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেমন মায়াদেবীর অন্তরে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আভাস ফুটিয়া উঠিল অমনি সহসা তাঁহার প্রসবকাল উপস্থিত হইল। মানসসুষমার পরমাধার ভগবান্ বুদ্ধদেব এই শুভ মুহূর্ত্তে যেন বাহ্য ও অন্তর্জগতের চরম সৌন্দর্য্যসমূহের একত্র সমাবেশ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

"বাতা ববুঃ স্পর্শসুখা মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ।
সূর্য্যাৎ স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চ্চিরনীরিতোঽগ্নিঃ॥"

স্পর্শসুখকর ফুল্লবায়ু বহিতে লাগিল, দিব্য বস্ত্র সকল আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইল এবং নবজাত কুমার সূর্য্যের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজিত হইলে দীপশিখা বায়ুস্পর্শ ব্যতীত ম্লান হইল। জন্মের পর রাজ্যের সকল অর্থ সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মহারাজ তাঁহার 'সিদ্ধার্থ' নাম রাখিলেন। রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দ হইতে লাগিল। কেবল মহারাজাকে নিদারুণ নির্ব্বেদ প্রদান করিয়া মায়াদেবী স্বল্পকাল মধ্যে স্বর্গগতা হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং শুদ্ধোদনের অপর মহিষী মহাপ্রজাপতী গোতমী মাতার ন্যায় কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি অসিত ধ্যানবলে তাঁহার জন্ম অবগত হইয়া কুমারকে দর্শন করিবার জন্য শাক্যরাজভবনে অতিথি হইলেন। মহারাজ শুদ্ধো-দনের আজ্ঞায় কুমার ধাত্রীর ক্রোড়স্থ হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে ঋষিবর সেই দ্বাত্রিংশৎ-মহাপুরুষলক্ষণসমন্বিত মহাযোগী বালককে দেখিয়া স্বর্গমুখী হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঋষিবর, আমার এই সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত বালককে দেখিয়া আপনি কাঁদিতেছেন কেন? ইহার কি কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করেন?' পরে কুমারকে দেখাইয়া বলিলেন,

"অপ্যক্ষয়ং মে যশসো নিধানং কচ্চিদ্ধ্রুবো মে কুলহস্তসারঃ।
অপিপ্রযাস্যামি সুখং পরত্র সুপ্তেঽপি পুত্রেঽনিমিষৈক চক্ষুঃ॥"

"আমার এই যশের নিধান অক্ষয় হইবে ত? আমার পবিত্র কুলের এই প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে না ত? আমি ত সুখে পরলোক গমন করিতে পারিব? মুনিবর, পুত্র সুপ্ত থাকিলেও আমার চক্ষু অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার উপর পতিত থাকে।" উত্তরে ঋষিবর বলিলেন, "রাজন্, আমি সেজন্য শোক করিতেছি না। আমি শোক করিতেছি কারণ, আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি আর ইঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্ম্মসুধা পান করিবার অবসর পাইব না।"

"বিহায় রাজ্যং বিষয়েষনাস্থস্তীব্রৈঃ প্রযত্নৈরধিগম্যতত্ত্বং।
জগত্যয়ং মোহতমোনিহন্তুং জ্বলিষ্যতি জ্ঞানময়ো হি সূর্য্যঃ॥"

"ইনি বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর প্রযত্নের দ্বারা পরম তত্ত্ব লাভান্তে জগতের মোহনাশকর জ্ঞানময় মহাসূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইবেন।"

"অস্যোত্তমাং ধর্ম্মনদীপ্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ॥"

"তৃষ্ণার্ত্ত জীবলোক ইঁহার প্রবর্ত্তিত বিমল ধর্ম্মনদীর জল পান করিয়া একদিন শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু আমি তাহা দেখিতে পাইব না।

মহর্ষির বচনে রাজা আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর কুমারের গৃহত্যাগ চিন্তা করিয়া মহা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইলে বোধ-হয় পুত্রের সংসারে উদাসীন হওয়া দুর্ঘট হইবে। তজ্জন্য যাহাতে সংসারের শোকদুঃখের ছবি কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত না হয় সেইরূপ বিধান করিয়া তিনি কেবল মোহকর কৌতুক বিলাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমারের জন্য শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতুর উপযুক্ত

তিনটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং তাঁহাকে অনন্যচিত্তে সর্ব্বদা সেই সকল প্রাসাদে অপূর্ব্ব নৃত্যগীত ও সৌন্দর্য্যে মগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। কুমার এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বহুপরে ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিতা আমায় অতি বিলাসিতার মধ্যে পালন করিয়াছিলেন। আমার জন্য তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মন-স্তুষ্টির জন্য তন্মধ্যে অহর্নিশি নৃত্যগীতাদি হইত। জলবিহারের জন্য প্রতি প্রাসাদে শ্বেত, রক্ত, নীল পদ্মের তিনটী সরোবর থাকিত। অনুচর-গণ সর্ব্বদাই আমার গাত্র মহার্ঘ চন্দন দ্বারা লিপ্ত করিয়া রাখিত। অতি সূক্ষ্ম কাশীর বস্ত্র আমার পরিধেয় ছিল। এমন কি, আমার দাসদাসী-সকলে ধনবানেরও দুর্ল্লভ খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি পাইত। কিন্তু এসকলে আমার তৃপ্তিসুখ ছিল না। জগতের দুঃখ মনে করিয়া সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ধ্যানস্থ থাকিতাম—ভাবিতাম এ মহা দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার কি উপায় নাই?"

কুমার বহু স্বর্ণমণিময় আভরণে ভূষিত থাকিতেন এবং নিজ কুলানুযায়ী বহু বিদ্যা তাঁহার অধিগত ছিল। আমরা ললিতবিস্তরে অবগত হই যে, অসামান্যবলসম্পন্ন রাজকুমার ৬৪টী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহারই অভিমতে শুদ্ধোদন মনোহরা যশোধরা বা গোপার সহিত তাঁহাকে পরিণীত করেন। কুমার যখন পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাসাদে আবদ্ধ সেই সময় একদিন তাঁহার বহির্দ্দেশদর্শনে ইচ্ছা জন্মিল। পিতা তাহা অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতে আতুর, ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পথ হইতে স্থানান্তরিত করাইয়া কুমারকে উপবনে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। উপবনে গমন করিবার পথে তিন দিন পর পর দেবগণপ্রসাধিত জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং সারথির নিকট ঐ সকল অবস্থার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিন দিনই তিনি রথ ফিরাইয়া আনিবার আদেশ করিলেন। কুমারের অন্তরে যে অত্যল্পমাত্র প্রফুল্লতা ছিল তাহা সমস্তই নিঃশেষে অন্তর্হিত হইল। তখন

কুমারের অবস্থা 'ন জগাম রতিং ন শর্ম্মলেভে হৃদয়ে সিংহইবাতিদিগ্ধ-বিদ্ধঃ' হৃদয়ে শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় শান্তিহীন এবং নিরানন্দ। ইহার পর আর একদিন তিনি বনস্থলী সন্দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। তথায় সলিলোর্ম্মির ন্যায় কর্ষিত ভূমি নিরীক্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গল দ্বারা বহু কীট বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত ও আর্ত্ত-চিত্তে অনুচরদিগকে বহু দূরে রাখিয়া এক বটবৃক্ষতলে জগতের দুঃখ-চিন্তায় ধ্যানস্থ হইলেন। এমন সময় ভিক্ষুবেশপরিহিত এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহার নয়নযুগল আকৃষ্ট করিল। কুমার তাঁহাকে পীতবস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে সেই ছদ্মবেশী দেবতা বলিলেন, 'আমি জন্ম জরা মৃত্যুর ভয়ে মোক্ষলাভের জন্য প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রমণ হইয়াছি। প্রব্রজ্যা লাভ করিতে হইলে সংসারত্যাগ প্রয়োজন।' এই কথা বলিয়াই ছদ্ম দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। কুমার মুক্তি পথের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং পিতার নিকট আসিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ক্ষান্ত করিবার জন্য রাজা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু কুমার মধুরস্বরে বলিলেন, "আপনি যদি আমায় এই চারিটী বর প্রদান করেন তাহা হইলে আমি তপোবনে গমন করিব না।—

"ন ভবেন্মরণায় জীবিতং মে বিহরেৎস্বাস্থ্যমিদং চ মে ন রোগঃ।
ন চ যৌবনমাক্ষিপেজ্জরা মে ন চ সম্পত্তিমপহরেদ্বিপত্তিঃ॥"

"আমি কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হইব না। চিরকাল নিরাময় সুস্থদেহে থাকিব। জরা কখনও আমার যৌবন গ্রাস করিবে না এবং এই সম্পত্তি কখনও বিপত্তি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।" এই সকল অপরিহার্য্য বলিয়া রাজা কুমারকে অসম্ভব কল্পনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন এবং পুত্রের মানসিক অবস্থায় ভীত হইয়া অধিকতর পরিমাণে বিলাস উৎসবের মাত্রা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার যাহাতে অলক্ষিতে রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত প্রহরীদিগকে সদা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন।

অচিরে সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের জন্ম হইল। কুমার সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, 'রাহুলো জাতো বন্ধনং জাতং'—রাহুল জন্মিয়াছে, এইবার ত সংসারের দৃঢ়বন্ধন ঘটিল। অবিলম্বেই সংসার হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিতে হইবে। এই সময় কৃশা গোতমীর নিবৃত্তিমূলক গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংসারমুক্তিলাভের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। কুমার আর কালবিলম্ব করিলেন না। সেই দিন রাত্রিসমাগমে পূর্ব্ববৎ নৃত্যগীত শ্রবণে জাগ্রত না থাকিয়া প্রথম প্রহরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিত্তানন্দদায়িকা গায়িকা নর্ত্তকীবৃন্দ তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া অবসর পাইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মধ্য রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গে কুমার দেখিলেন বিলাসভবন নিস্তব্ধ। কেবল ঝিল্লীর সহিত একতান মিলাইয়া ভৈরবী নিশা যেন কি মহা বৈরাগ্যের গান গাইতেছে। প্রাসাদ-প্রসাধন পুষ্পরাজি শুষ্ক, আলোকমালা নির্ব্বাপিত প্রায়। সেই আলোক অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্ত্তি-সকল নীরব, নিথর, নিস্পন্দ— যেন শবদেহের ন্যায় লম্বমান! তাহাদের বিলাসভূষণ স্রকৃচন্দন স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কুমার ভাবিতে লাগিলেন, এই ত শ্মশানের প্রতিচ্ছবি! আমি শ্মশানে অধিষ্ঠিত! কে বলে এই প্রাসাদ বিলাসের উৎসবমন্দির? শ্মশান— শ্মশান—প্রাণহীন শ্মশান! সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বরক্ষক ছন্দককে ডাকিয়া তাঁহার প্রিয় অশ্ব কন্থককে সুসজ্জিত করিবার আদেশ করিলেন। দেবগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ছন্দক যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। নগররক্ষীরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই বিশাল নগরদ্বার আপনি মুক্ত হইল। সেই নিস্তব্ধ নিশিতে কুমার অশ্বপৃষ্ঠে ছন্দকসহায়ে কপিলবস্তু পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ তাঁহার গমনের সুবিধার জন্য

"অকুরুত তুহিনে পথি প্রকাশং ঘনবিবরপ্রসৃতা ইবেন্দুপাদাঃ"

—মেঘবিবরনিঃসৃত জ্যোৎস্নাকিরণের ন্যায় তুষারময় পথ দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। গমনকালে জন্মভূমিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন, "সিদ্ধিলাভ না করিয়া আমি তোমার অঙ্কে ফিরিয়া আসিব

না।" মনের আবেগে এক রাত্রির মধ্যে বহু যোজন পথ অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহারা অনোমা নদীর তীরে মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন তখন কুমার আপনার আভরণগুলি একত্র করিয়া ছন্দককে অর্পণ করিয়া বিদায় লইবার জন্য বলিলেন—

"জরামরণনাশার্থং প্রবিষ্টোঽস্মি তপোবনং।
ন খলু স্বর্গতর্ষেন নাস্নেহেন ন মন্যুনা॥"

"আমি জরা মরণ নাশের জন্য তপোবন গমন করিতেছি, স্বর্গকামনায় কিম্বা অস্নেহ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া নহে।"

"তদেবমভিনিষ্ক্রান্তং ন মাং শোচিতুমর্হসি।
ভূত্বাপি হি চিরং শ্লেষঃ কালেন ন ভবিষ্যতি॥"

"অতএব আমার অভিনিষ্ক্রমণের জন্য শোক করিও না। দেখ, এই মিলন থাকিয়াও কালে বিনষ্ট হইবে।"

"যদপিস্যাদসময়ে যাতো বনমসাবিতি।
অকালো নাস্তি ধর্ম্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি॥"

"যদি বল আমি অসময়ে তপোবন গমন করিতেছি, বিবেচনা করিয়া দেখ জীবন অতি চঞ্চল, বাস্তবিক ধর্ম্মলাভ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল থাকিতে পারে না।" ছন্দক প্রভুকে কোন মতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া শোকাকুলহৃদয়ে কন্থককে লইয়া কপিলবস্তুতে ফিরিয়া আসিল। তাহারা রাজপুত্রের সহিত যে পথ এক রাত্রিতে গমন করিয়াছিল তাঁহার বিরহে ফিরিবার সময় তাহাতে অষ্টাহ গত হইয়াছিল।

ছন্দক চলিয়া যাইবার অল্প পরেই ইন্দ্র ব্যাধ সাজিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্যাধের ভিক্ষু-বেশ বিসদৃশ বিবেচনা করিয়া কুমার তাহার সহিত আপনার মহামূল্য বস্ত্র বিনিময় এবং পরে অস্ত্রের দ্বারা মস্তকের কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া উভয়ই অনোমা নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

এইবার সিদ্ধার্থ সিদ্ধ মহর্ষির ন্যায় সেই তপোবনে প্রবেশ করিলে

লক্ষ্মীবিযুক্ত হইয়াও বপুঃশ্রীতে সকল আশ্রমবাসিগণের চক্ষু আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

"নেথর্ষভস্যেব বপুর্দ্বিতীয়ং ধামেব লোকস্য চরাচরস্য।
স দ্যোতয়ামাস বনং হি কৃৎস্নং যদৃচ্ছয়া সূর্য্য ইবাবতীর্ণঃ॥"

—তিনি দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় বপুষ্মান্ হইয়া যেন এই চরাচর বিশ্বজগতের মহিমার মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ সূর্য্যের মত সমগ্র আশ্রম-পদ আলোকিত করিলেন। কিন্তু আশ্রমবাসীদিগকে স্বর্গলাভ কামনায় নানারূপে তপাচারী দেখিয়া মোক্ষাভিলাসী সিদ্ধার্থ দুঃখিতান্তঃকরণে সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার আশ্রমত্যাগে শোক করিতে লাগিলেন, কেবল এক জনমাত্র তাঁহাকে আচার্য্য আড়ার কালামের নিকট মোক্ষমার্গ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

"পুষ্টাশ্বঘোণং বিপুলায়তাক্ষং তাম্রাধরোষ্ঠং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
ইদং হি বক্ত্রং তনুরক্তজিহ্বং জ্ঞেয়ার্ণবং পাস্যতি কৃৎস্নমেব॥
গম্ভীরতা যা ভবতস্ত্বগাধা যা দীপ্ততা যানি চ লক্ষণানি॥
আচার্য্যকং প্রাপ্স্যতি তৎ পৃথিব্যাং যন্নর্ষিভিঃ পূর্ব্বযুগেঽপ্যবাপ্তং॥"

"আপনার এই বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় নাশা, বিপুল আয়ত চক্ষু, তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠ, শ্বেততীক্ষ্ণ দন্ত ও ক্ষীণ রক্তবর্ণ জিহ্বাযুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই অবগত হইবেন। এবং আপনার অগাধ গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বাঙ্গের দীপ্তি দেখিয়া মনে হয় আপনি পৃথিবীর যাবতীয় আচার্য্যদিগের অপ্রাপ্ত এক মহিমময় আসন অলঙ্কৃত করিবেন।"

"আমাদের আদর্শ" ।*

(সমালোচনার প্রতিবাদ)

(স্বামী শর্ব্বানন্দ)

'উদ্বোধনের' মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত "আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় প্রবর্ত্তকের পঞ্চম সংখ্যায় "স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ শীর্ষক" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। প্রবন্ধলেখক স্বামী শুদ্ধানন্দের যুক্তিরাশিকে "পাঁচ মিনিটের জেরায় উল্‌টো সুর" ধরাবার প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখনী চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল যে, লেখক তাঁর বহু আয়াসে প্রবর্ত্তকের আট পৃষ্ঠা ভরিয়া কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত কুতর্কের আবর্জ্জনা জড় করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বেদান্ততত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানিবার এবং বুঝিবার জন্য যে বিশেষ শ্রমস্বীকার করেন নাই তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি তিনি প্রাচীন ভারতের মনীষিগণের বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহের গভীর গবেষণার সহিত পরিচিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি এরূপ উদ্ভট কথা লিখিতে পারিতেন না। যথা—"এ জগৎটা মিথ্যা প্রমাণ কর্‌তে হলে তোমাকে চোখ বুজ্‌তে হবে, নাক কান বন্ধ কর্‌তে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজী খেতে হবে" ইত্যাদি, "লক্ষপ্রমাণ যে জিনিসটাকে আমার ভিতর থেকে অন্তর্হিত করিয়ে দিতে পারে না—সেটা হচ্চে, আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি", "আসলে আমি যে আছি এটা ঘোর মায়াবাদীকেও মান্‌তে হবে", "এই চৈতন্যেই আমার আমিত্ব",

---

* এই প্রবন্ধটী প্রথমে 'প্রবর্ত্তকে' ছাপিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু উহা উক্ত পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় 'উদ্বোধনেই' প্রকাশিত হইল। —উঃ সঃ।

"এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখ্‌ছি যে আমি নিগুর্ণ নই, আমি সগুণ—আমি আমার চৈতন্যে তিনটী জিনিসের পরিচয় পাচ্ছি—এই তিনটী জিনিস হচ্ছে—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম", "আর এই যে এদের প্রকাশ—এই প্রকাশের অন্তরালে আমার দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই—এর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমার একটা আনন্দ, একটা মহত্ব-বোধ", "মানুষের চৈতন্যের ঐ জ্ঞান, শক্তি, প্রেমই তার ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে প্রত্যেক নিমেষটীতে চাচ্ছে ও হচ্ছে" ইত্যাদি। এই Pragmatic রংএ রঞ্জিত বর্ত্তমান ভারতের অর্ব্বাচীন ত্যাগভোগসমন্বয়বাদ বেদবেদান্তবহির্ভূত এবং যে সত্যের উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত উহার চিরবিরোধ। উক্ত মতের বিশ্লেষণ এবং ঐ বিরোধটী কোথায় তাহা আমরা নিম্নে দেখাইবার প্রয়াস পাইলাম।

প্রথমতঃ, সত্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা সম্যক্‌রূপে আমাদের জানা দরকার। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখক "সত্য" "সত্য" করিয়া খুব চীৎকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁর প্রবন্ধপাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, চিরন্তন সত্যের গভীর রহস্যটী এখনও তাঁহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতের অদ্বৈতাচার্য্যগণ এই সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে গভীর যুক্তিরাশির অবতারণা করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সত্যকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহার প্রতিযোগী অসত্যকে বোঝা দরকার। অসত্য বা মিথ্যা বলিতে আমরা দুই প্রকার বস্তু বুঝি—একটী অপহ্নব, অপরটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু। যাহা কোনও কালেই বিদ্যমান নাই, যথা, 'বন্ধ্যাপুত্র', তাহাই অপহ্নবরূপ মিথ্যা বা অসৎ; এবং যাহা কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানগোচর হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, যথা, 'রজ্জুসর্প' ভ্রমের সর্প, উহাকে অনির্ব্বচনীয়রূপ মিথ্যা বলে। ইহার বিপরীতে সৎ বলিতে আমরা সেই বস্তটী বুঝি যাহার কোনও কালেই বিলয় ঘটে না, অর্থাৎ যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেই জন্যই ভারতের দার্শনিকরা পারমার্থিক সত্যের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, ত্রিকালাবাধিত বস্তুই

পারমার্থিক সৎ * এবং তদ্বিপরীত ত্রিকালবাধিত অর্থাৎ যাহা কালত্রয়ে বিলয়শীল তাহাই অসৎ। বৈদান্তিকের মতে পারমার্থিক-সৎ-বহির্ভূত সত্তা তিন প্রকার, যথা— ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক এবং তুচ্ছ। রূপ রস গন্ধযুক্ত এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ, যাহা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যাবহারিকরূপ সৎ, কিন্তু যেহেতু উহা ত্রিকালবাধিত সেইজন্য উহা পারমার্থিকরূপ সৎ নহে অর্থাৎ পারমার্থিক হিসাবেই উহা অসৎ। রজ্জু সর্পের সর্পসত্তা প্রাতিভাসিক সৎ এবং বন্ধ্যাপুত্রের সত্তা তুচ্ছ সৎ অর্থাৎ আত্যন্তিক অসৎ। যখন বৈদান্তিক জগৎকে মায়াবিকল্পিত অনির্ব্বচনীয়রূপ অসৎ বলে তখন উহাকে সেই ত্রিকালাবাধিত পারমার্থিক সৎ এবং ত্রিকালবাধিত আত্যন্তিক অসতের মধ্যসত্তায় স্থাপন করেন, তাঁর দৃষ্টিতে এই জগৎ আত্যন্তিক সৎও নয় আত্যন্তিক অসৎও নয়, উহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সদসৎবিলক্ষণরূপ একটী বস্তু। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই— বিশেষতঃ আধুনিক মায়াবাদবিরোধীরা মায়ার এই অনির্ব্বচনীয়ত্ব না বুঝিয়াই বকাবকি করিয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয় করেন। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখকও যে জগতের সত্যাসত্যের বিষয় বলিতে গিয়া ঐরূপ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

দর্শনের কূট তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, এই নামরূপ রচিত জগতের অনির্ব্বচনীয় রূপ মিথ্যাত্ব পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে। এই যে লেখনিটী, যাহা দ্বারা আমি লিখিতেছি, ইহা যদিও আমার প্রয়োজন সাধনার দিক্ হইতে সত্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, তথাপি যাঁহার একটু জড়বিজ্ঞান জানা আছে তিনিই বলিবেন, এই লেখনিটী পারমার্থিক সত্য নহে—ইহার পারমার্থিক সত্যতা কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জে, বা ইলেকট্রনে বা ঈথরে। এখানে সেই ইলেকট্রন বা ঈথরই হইতেছে ত্রিকালাবাধিত পারমার্থিক সৎ, তাহার কলমরূপটী ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক

* "ত্রৈকালিকাত্যন্তাভাবাপ্রতীতত্বং সত্ত্বমিতি" —অদ্বৈতসিদ্ধি।

সৎ মাত্র। কারণ দুধ যেমন ছানা হয় ইলেকট্রন বা ঈথর সেইরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কলম হয় নাই। ইলেকট্রন ইলেকট্রনই আছে, কেবল তাহার বিভিন্ন স্পন্দনগুণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট কলমরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের ঐ কলমরূপটী আমার ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতার ফলস্বরূপ। উহার বাস্তব অস্তিত্ব কোনখানেই নাই—ইলেকট্রনেও নাই, আমার ইন্দ্রিয়ে নাই, অথচ উহা যেন আমার ইন্দ্রিয় এবং ইলেকট্রনের মাঝামাঝি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন পিত্তদোষযুক্ত চক্ষু সাদা বস্তুকে হলুদে দেখে সেইরূপ আমার অক্ষম ইন্দ্রিয় ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনরূপে না দেখিয়া কলমরূপে দেখিতেছে। মনে কর, যদি এমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় যাহা দ্বারা ইলেকট্রনের স্বরূপ ধরিতে পারা যায়, আর যদি সেই যন্ত্র এই কলমের উপর ধরা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আর কলম দেখিতে পাইব না, তৎস্থানে নিত্যবিরাজিত ইলেকট্রনই নয়নগোচর হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই অক্ষমতা প্রথমে ইলেকট্রনের স্বরূপ আমাদের নিকটে আবৃত করে এবং তাহার স্থানে কলমরূপ সদসৎ-বিলক্ষণ একটী নূতন বস্তু উৎপন্ন করে। এই কলমটী ইলেকট্রনের মত আত্যন্তিক সৎও নহে, এবং বন্ধ্যাপুত্রের মত অত্যন্ত অসৎও নহে। ইলেকট্রনের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাই অবিদ্যা বা মায়া, এবং তাহার ঐ আবরণী শক্তি দ্বারা ইলেকট্রনের স্বরূপ আবৃত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা কলমরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তটীর সৃষ্টি করে। এই কলমের অধিষ্ঠান বা বিশেষ্য হইতেছে সৎবস্তু ইলেকট্রন, কিন্তু উহার বিশেষণ 'কলমরূপ' ত্রিকালবাধিত, সেইজন্য ব্যাবহারিক ভাবে সৎ হইলেও পারমার্থিকরূপে অসৎ। তদ্রূপ এই কলমটীর মত জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনির্ব্বচনীয়-অসৎ—আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রতি পদে এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। "Things are not what they seem"—বস্তুটী যে ভাবে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় উহা তাহার স্বরূপ নহে। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের নিকট

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে, ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা দেখি হীরক ও কয়লা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, একটী অতি স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় অপরটী অতি কদাকার, অস্বচ্ছ, মলিন। ইন্দ্রিয়ের দিক্ হইতে দেখিলে কে বলিবে দুইই এক বস্তু—এক কার্ব্বনেরই বিভিন্ন প্রকার, অথবা আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিতে পারা যায়—উহা এক ইলেক্‌ট্রনেরই বিভিন্ন প্রকাশ! সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৎ এবং তাহার নাম রূপের মেলাও চিরন্তন সৎ। কিন্তু জড়বিজ্ঞান-বাদী দার্শনিক বলেন যে, এই নানাত্বময় জগৎ আপেক্ষিক সৎ (Relative truth) মাত্র। বাস্তবিক সৎ (Absolute truth) হইতেছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" জড় ইলেক্‌ট্রন। এই বৈচিত্রটা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের ভেল্কি (Sense aberration)।

প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখক লিখিতেছেন, "এ জগৎটা মিথ্যা প্রমাণ কর্‌তে হলে তোমাকে চোখ বুঁজ্‌তে হবে, নাক কাণ বন্ধ কর্‌তে হবে, হাত পা বাঁধ্‌তে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খেতে হবে—কেননা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ কর্‌তে হলেই যে অসাধারণ বেগ পেতে হয় তা ত আমরা সবাই জানি। আর আমার জগৎ আছে তার প্রমাণ অতি সহজে চোখ খুল্লেই পাই—এর শব্দ গন্ধ রূপ রস আমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমার অন্তরাত্মাকে প্রতি নিমেষে জানিয়ে দিচ্ছে—"আমি আছি গো আমি আছি"। লেখকের এই সহজ প্রমাণের বিষয় পড়িতে পড়িতে আমাদের এক গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার একটী অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে আমরা গ্লোবের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এই পৃথিবীটী গোল এবং উহা লাটিমের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ লোকটাকে আমরা এই ভৌগলিক তথ্যটী বুঝাইতে পারি নাই। সে ক্রমাগত এই কথাই বলিতেছিল, "পৃথিবী যদি গোল হত ত আমরা সকলে গড়িয়ে পড়ে যেতাম্, তা ছাড়া মুসাই গো আমি কত

তেপান্তরের মাঠে গিয়ে দেখেছি সব সমান চৌরস্ত জমি, গোলটোল কোনখানে নেই।" সে পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির বিষয় শুনিয়া বলিয়াছিল, "কি বলেন মুসাই! আমাদের এই পৃথিবীটা যদি লাটিমের মত ঘুর্‌ত, তাহলে মনে করেন কি আমাদের এই বাড়ীঘরগুলো এই রকম দাঁড়িয়ে থাকৃতে পার্‌ত, না, আমরাই খাড়া থাকৃতে পাত্তাম? সব দূরে ছিট্‌কে পড়্‌তাম না? লাটিম যখন ঘোরে, দেন ত তার উপর একটা কুটো, সে ছিট্‌কে ফেল্‌বে না! আর কি বল্‌ছেন মুসাই পৃথিবী ঘুরচে, রোজ দেখ্‌চি সূয্যিঠাকুর পূবদিকে উঠ্‌ছেন আর পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছেন। আপনি কি আমার চোক্‌কে অবিশ্বেস কত্তে বলেন।" প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকারের মত এই গ্রাম্য লোকটীর কথাতেও গমক ও মূর্চ্ছনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন কথা এই যে, তাহার ঐ সহজ প্রমাণ যাহা সে "সহজে চোখ খুল্‌লেই পায়", তাহাই আমরা গ্রহণ করিব, না কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, হর্সেল, ল্যাপ্লাস্ প্রভৃতি ধুরন্ধর জ্যোতিষিগণ আজীবন সাধনার দ্বারা যে জ্যোতিষতত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিব? ইহার সমাধান সুধী পাঠকবর্গের উপর ছাড়িয়া দিলাম। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকার হয় ত তাঁর Pragmatic viewর অনুযায়ী বলিবেন যে, ঐ লোকটী তার সরল মন (unsophisticated mind) লইয়া যাহা বুঝিয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে সত্য, তাহাতেই সে সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আর জ্যোতিষী বুধমণ্ডলী যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহাদের কাছে সত্য। উভয় সত্যই সংসার সুখের পক্ষে সমান মূল্যবান্। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে মানুষকে কোনরূপে শিক্ষা দেওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ, শিক্ষা দিলেই তাহার "সহজ" জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটিবে, আর ঐ ইন্দ্রিয় কথিত "সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ" করিবার জন্য "মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খেতে থাক্‌বে" আর কি !!!

যাহা হউক, আধুনিক জড়বিজ্ঞান মুখর হইয়া এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, জগতের মূলতত্ত্ব ইলেকট্রনই বাস্তব বস্তু, উহার বৈচিত্র্য-

বিকাশ বাস্তব নহে। পাশ্চাত্য জগতের হেক্‌লপ্রমুখ জড়ের একত্ববাদিগণ এই বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু জড়বাদিগণ তাঁহাদের বিশ্লেষণ ঐ ইলেক্‌ট্রন বা ঈথরে পরিসমাপ্ত করিয়া উহাকেই মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সর জড়বাদীদের এই মূলতত্ত্ব দর্শনের দিক্ হইতে দেখিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "The Atomic Theory is a philosophical absurdity" এবং অস্মদ্দেশীয় আচার্য্য শঙ্কর হার্বার্ট স্পেন্‌সরের অন্ততঃ পঞ্চাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের তর্কপাদে কণাদের পরমাণুবাদ-নিরাকরণ মুখে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। আর যে উক্তি পরমাণুর বিষয়ে সত্য, ইহা ইলেক্‌ট্রন বা ঈথরের পক্ষেও সমীচীন। তাহা হইলেই দেখিতেছি, জড়ের প্রাথমিক অবস্থা উদ্ঘাটন করিতে গিয়া আমরা চৈতন্যেই আসিয়া পড়ি—Physics merges into Metaphysics. এ বিষয়ের বহুল যুক্তি বাহুল্যভয়ে এখানে প্রদত্ত হইল না।

সত্য সম্বন্ধে সকলের শেষ কথা এই যে, যাহা কিছু আমাদের প্রজ্ঞারূঢ় হয় তাহাই আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেন প্রজ্ঞা নিজের 'সৎ' রঙে রঞ্জিত করিয়াই উহাকে নিজের কাছে ধরে। এখন এই প্রজ্ঞারূঢ় বস্তু—যুষ্মদ্‌জগৎ, ত্রিকালাবাধিত সৎ নহে, কারণ, উহা ষড়্‌বিকারী, অর্থাৎ নিত্যপরিণামশীল ও ত্রিকালবাধিত। ইহার মধ্যে ঐ প্রজ্ঞাই অথবা বেদান্তের পরিভাষায় বলিতে গেলে, প্রজ্ঞা উপলক্ষিত চৈতন্যই ত্রিকালাবাধিত সৎ। কারণ, এই প্রজ্ঞার কোনকালে বাধ হয় না। এই ত্রিকালাতীত প্রজ্ঞা 'যুষ্মদস্মদ্'দ্বন্দ্ব-গন্ধবিহীন, একরস ও চিরন্তন সত্য। বাল্য-যৌবন-জরার শারীরিক ও মানসিক ক্রমপরিবর্ত্তনের মাঝে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়ের অবস্থাবিপর্য্যয়ের ভিতর এই প্রজ্ঞা সমানভাবে অচল অটল কূটস্থ নিত্য। জগৎ-ব্রহ্ম নির্দ্দেশ স্থলে পূজ্যপাদ আচার্য্য বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন—

"অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপনাম ইত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগৎরূপং ততোদ্বয়ম্॥"

প্রত্যেক বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই পাঁচটি জিনিষ পাই যথা, অস্তি, ভাতি, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ এবং নাম ও রূপ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটীই ব্রহ্মরূপ, কারণ, উহা সার্ব্বভৌমিক ও চিরন্তন। এবং পরের দুইটী অর্থাৎ নাম ও রূপই জগৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। এই নামরূপ জগতের অনিত্যত্বের আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রজ্ঞার বা চৈতন্যের তুরীয় অবস্থা নামক এমন একটী অবস্থা আছে যেখানে নামরূপ-জগতের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে—সেখানে "আমি"ও নাই "তুমি"ও নাই, আছে কেবল—

"অবাংমনসগোচরং বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

প্রজ্ঞার এই অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন নির্ব্বিকল্পজ্ঞানী এবং আমাদের শাশ্বত বেদ। শ্রুতি বলেন—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্য-মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

"এষ নেতি নেতি আত্মা।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রাচীনকালের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল মহামনীষিগণই এই বৈদিক শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। এখন যদি কেহ তাঁহাদের এই উপলব্ধিকে "মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খাওয়া" বলেন তাঁহার ধৃষ্টতার বিচার আমরা সুধী পাঠকবর্গের হস্তেই অর্পণ করিতেছি।

এই ত গেল প্রবন্ধকারের জগতের সত্যাসত্য লইয়া বিচার। দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছে চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ধারণা। তিনি বলেন, "লক্ষ প্রমাণ যে জিনিষটাকে আমার ভিতর থেকে অন্তর্হিত করিয়ে

দিতে পারে না—সেটা হচ্ছে, আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি।” “আসলে যে আমি আছি এটা ঘোর মায়াবাদীকেও মানতে হবে। কেন না মায়াবাদীর আসল তর্কটাই হচ্ছে যে আমি আছি কিন্তু জগৎ নেই। আমিও নেই যদি মায়াবাদী বলে তবে তার মায়াবাদও দাঁড়াবার স্থান পায় না। আমি সত্য বলে, মান্‌লেই জগৎটা মিথ্যা বল্‌তে পারি। এটা অতি সোজা কথা।” বাদীর পক্ষ বিষয়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞতাকে ন্যায়ের ভাষায় ‘নিগ্রহস্থান’ বলে, কারণ, ঐখানেই প্রতিবাদী সহজেই নিগৃহীত হন। মায়াবাদী কখনও বলে না, “আমি আছি অথচ জগৎ নেই”। সে এই সহজ সত্যটী খুবই জানে যে, আমি থাকিলেই জগৎ থাকে, আর জগৎ থাকিলেই আমি থাকি,—দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শন ও দৃশ্য আছে এবং দৃশ্য ও দর্শন থাকিলেই দ্রষ্টা আছে। পিতা আছে অথচ পুত্র নাই ইহা হইতেই পারে না। যুষ্মদ্ অস্মদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ মায়াবাদী বেশ জানে, উহা তাহাকে বহ্বারম্ভের সহিত জানাইয়া দিতে হয় না। সে জানে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটিই জগৎ। চিরন্তন সত্যস্বরূপ আত্মায় “আমি”ও নাই, জগৎও নাই ; সেখানে আছে কেবল অখণ্ডৈকরস অপরিচ্ছিন্ন সৎ, চিৎ, আনন্দ—“নেতি নেতি আত্মা”। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই ঐ ত্রিপুটির পশ্চাতে বিরাজমান—যাহার সত্তায় ঐ ত্রিপুটি সত্তাবান্। যেমন সিনেমেটোগ্রাফের চলৎ চিত্রগুলি তাহার আধারপটের সত্তায় সত্তাবান্ হয় বা রজ্জুসর্পভ্রমের সর্পের সত্তা ঐ রজ্জুসত্তা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও সেইরূপ। এই ত্রিপুটির “আমি” যে নিত্য নয় তাহা বেদবেদান্তও বলেন, আর যে মহাত্মাগণ প্রকৃত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন। পরমহংসদেবের একটী উক্তি এই যে—“যেমন প্যাঁজের খোসা যত ছাড়াও তত খালি খোসাই বেরোয়, ভেতরের মাঝ আর পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই আমিকে ধর্‌বার জন্য যত বিচার কর দেখ্‌বে এই আমি বলে কোন বস্তু আর পাবে না।” ভগবান্ নাগসেন রাজা মিলিন্দ কর্তৃক পৃষ্ট হইলে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, “মহারাজ

আপনি বলিতেছেন, আপনি রথে আসিয়াছেন, আপনার এই রথটী কি? আমাদের সম্মুখে যে বস্তু রহিয়াছে যাহাতে আপনি রথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা ত দেখিতেছি কতকগুলি বস্তুর সমষ্টি মাত্র। উহার কোনটী রথ? উহার চক্রটী কি রথ, না ধুরাটী রথ, না চূড়াটী রথ, না অগ্রভাগটী রথ? ইহার কোনটীই রথ নহে। এবং উহাদের সমষ্টিও কোন একটী পৃথক্ বস্তু নয়। অতএব আপনার রথ কুত্রাপি নাই। উহা আপনার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। সেইরূপ আত্মা (বা আমি) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা একটী সমষ্টি মাত্র—রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান এই পাঁচটীর সমষ্টি, উহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনখানেই নাই।" বেদান্ত মতে অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাসই "আমি"—"এই চৈতন্যেই আমার আমিত্ব" নহে। এই 'আমি'র স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে তিনটী রূপ আছে, বেদান্তে তাহাদের নাম—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। তদতিরিক্তই প্রত্যগাত্মা বা শুদ্ধচৈতন্য। সেখানে "আমি", "তুমি", কিছুই নাই। এই প্রত্যগাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

এখন এই বেদান্তোক্ত শাশ্বত সত্যকে নাকচ করিয়া প্রবন্ধকার তাঁহার "অতি সহজে চোখ খুল্‌লেই পাওয়া" জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখ্‌ছি যে, আমি নির্গুণ নই, আমি সগুণ—আমি আমার চৈতন্যে তিনটী জিনিষের পরিচয় পাচ্ছি—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম!" তিনি যদি প্রকৃত চোখ খুলিয়া চাহিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, ঐ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমবিমণ্ডিত তাঁর 'আমি'রূপ কুয়াসার পশ্চাতে এক ত্রিকালবিহীন দ্বৈতাদ্বৈতগন্ধ-শূন্য চিদেকরস সত্তা নিত্য বিরাজমান যাহার ছায়াপাতে চিত্তকুহেলিকায় ঐ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। উহা

চিত্তের ধর্ম্ম, চিদের নহে। প্রবন্ধকার চিৎভ্রমে চিত্তকে লইয়া যত গোল বাধাইয়া বলিয়াছেন—"আর এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভব আমি পাচ্ছি—এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখ পাচ্ছি না, বেদনা পাচ্ছি না, আমি আমাকে দীন করে দরিদ্র করে অধম করে পাচ্ছি না—ঐ জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমার আছে একটা বিপুল আনন্দ,—ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমি দীন নই দরিদ্র নই অধম নই পাপী তাপী নই—আমি এই সৃষ্টির মাঝে সর্ব্বোত্তম রহস্য। এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেম এ আমার কাঁধে বোঝার মতো চেপে পড়েনি—এ অমৃতের মতো আমার অস্তিত্বে বিছিয়ে আছে।" কিন্তু যাহারা জগতের একটু অভিজ্ঞতা রাখে তাহারাই বলিবে ইহা বাস্তব জগতের কথা নহে। আজ দুর্ভিক্ষের দিনে আইস ঐ দরিদ্রের কুটীরে যেখানে দীন গৃহস্বামী ক্ষুৎপিপাসার কঠোর তাড়নে কঙ্কালসার হইয়াছে—পেটে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, গৃহে কপর্দ্দক নাই; অভাব অনটনের প্রেতমূর্ত্তি তাহার প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; গৃহলক্ষ্মীর অলক্ষ্মীর বেশ; ঘরের নন্দদুলালেরা অস্থিচর্ম্মসার কোটরগতচক্ষু সর্ব্বতোভাবে কুমারশ্রীবিহীন, বুভুক্ষার বিকট তাড়নায় আহারের জন্য কাতর চীৎকার করিয়া উপায়হীন গৃহস্বামীর হৃদয়ে নিরানন্দের বীভৎস তুলিতেছে। এখন তাহার কাছে গিয়া যদি বল, "কেমন বল ত বাপু, তোমার ভেতরে কেমন একটা বিপুল আনন্দ পাচ্ছ, না? কোথায় তোমার দৈন্য দারিদ্র্য? তোমার আছে কেবল বিপুল আনন্দ, কি বল?" তাহা হইলে সেই গৃহস্বামীর শরীরে তখনও যদি যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে ত তোমায় উন্মাদ মনে করিয়া যষ্টি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিবার চেষ্টা করিবে, নচেৎ তোমার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নিজ ললাটে করাঘাত করিবে। কারণ, সে জানে তার জ্ঞান নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই, প্রাণ হতে অমৃতের আলোক নিভিয়া গিয়াছে; আছে কেবল হৃদয়ভরা বেদনা, দারিদ্র্যদৈন্যের প্রহেলিকা, অশক্তির মর্ম্মদাহ, অভাবের অসহ্য হীনতা, আর তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া নাচিতেছে মৃত্যুর করাল ছায়া!

প্রবন্ধকার যদি আরও একটু চোখ্ খুলিয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন যে তাঁর এই "চোখ খুল্‌লেই পাওয়া আমি"র ভিতর কেবল জ্ঞান শক্তি প্রেম আছে তাহাই নহে,—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান আছে, শক্তির সহিত অক্ষমতা আছে, প্রেমের সহিত দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আছে, আনন্দের সহিত নিরানন্দ আছে, সুখের সহিত অসুখ আছে, মহত্বের সহিত হীনতা আছে, আর আছে সমস্ত আমিত্ব ভরিয়া সসীমত্ব, ক্ষুদ্রত্ব। সূতিকাগারে নবশিশুর ক্রন্দন হইতে অন্তিমে গঙ্গাজলির নাভিশ্বাস পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনই এই সসীমত্বের একটা বীভৎস লীলা।

যিনি এই লীলার বাহিরে, 'আমি' 'আমার' পারে সেই নিত্যবুদ্ধমুক্তস্বভাব চিদেকরস আত্মাই অসীম, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।

যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্র অন্যৎপশ্যতি অন্যং শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্। যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

এখন এই শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রবন্ধকারের "চোখ্ খুল্‌লেই পাওয়া" 'আমি'—যদিও তাঁহার ঐ 'আমি' এই সৃষ্টির মাঝে যে সর্ব্বোত্তম রহস্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—সেই ভূমা বস্তু নহে, সে 'অল্প' বস্তু, কারণ সে "অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি", সেই জন্যই সে অসুখী, নিরানন্দময় ও মর্ত্ত্য।

এখনও হয় ত প্রবন্ধকার বলিবেন যে, বেদ যাহাই বলুন না কেন, আমার ভিতরকার সত্য এই বলিতেছে আমি তাহাই গ্রহণ করিব—তাহার উত্তরে বলি, তাঁহার সত্যের মূল্য তাঁহার নিকট যাহাই হউক না কেন, বেদবেদান্তআশ্রিত হিন্দুসমাজের নিকট তাঁর ঐ অবৈদিক সত্যের মূল্য কিছুই নহে।

তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তৎসম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দজী যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবর্ত্তকের লেখক উহার নিরাকরণ করিবার চেষ্টা কোনখানেই করেন নাই, কেবল তদ্-

বিপরীতে কতকগুলা নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেই জন্য উক্ত বিষয়ে বিশেষ বলিবার আমাদের কিছুই নাই। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকারের অনুধাবনের জন্য কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সন্ন্যাস অর্থে ভোগবিরাগ ও গুণবৈতৃষ্ণ্য এই উভয়ই আমাদের শাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস অর্থে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা রূপ এষণাত্রয়ের সম্যক্ ন্যাস। সেই আদিম বৈদিক যুগ হইতে এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার হইতে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মদর্শী মহাপ্রাণগণ—যাঁহাদের পবিত্র চরণস্পর্শে ধরা পবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাঁহাদের করুণাকটাক্ষ লাভ করিয়া কত সহস্র সহস্র মানব সংসারের দাবানল হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতপথের পন্থী হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"

আজীবন ধরিয়া সমগ্র মানব সেই অমৃতের হ্রদের দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ সেই অমৃতের সন্ধান না জানিয়া "আপাতমধুরং পরিণামে বিষোপমম্" বিষয়সুখে নিমজ্জিত হয়। এখন এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় সেই ভূমা পরমপুরুষকে জানা—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)

আর এই পরমপুরুষকে জানা মানে তাহাই হওয়া—

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকোপনিষৎ) এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় ঐ সন্ন্যাস—সন্ন্যাসই উহার সাধন এবং সন্ন্যাসই উহার সিদ্ধি। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা"॥ (মুণ্ডক উপনিষৎ)

"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেত্যেতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

"পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ॥
(কৈবল্যোপনিষৎ)

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় বলিতেছেন—"জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্"। এবং এইরূপ বলিবার কারণ ও যুক্তি যথেষ্ট আছে, তাহা সংক্ষেপে এই যে, ঐ নির্ব্বিকল্পরূপ প্রত্যগাত্মা বা পরব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে হয়। ঐ নির্ব্বিকল্প অবস্থাতেই চিজ্জড়গ্রন্থি কাটিয়া আত্মার কেবল স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অন্য অবস্থায় নহে। তাই পাতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। অর্থাৎ সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থাতেই দ্রষ্টা যে পুরুষ তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। অপর সময়ে মনের বৃত্তির সহিত তিনি মিশ্রিত হইয়া থাকেন এবং মনের এই নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছিতে হইলে তাহার সমস্ত প্রত্যয়ের ঐকান্তিক নিরোধের আবশ্যক—"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস-পূর্ব্বসংস্কারশেষোঽন্যঃ" (পাতঞ্জল যোগসূত্র)। এখন মনের এই নিরুদ্ধ অবস্থা এবং পূর্ণমাত্রায় নৈষ্কর্ম্য লাভ একই কথা, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় তাহাই বলিতেছেন—

আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণ মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ (গীতা)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত কর্ম্মত্যাগ, সমস্ত বাসনাত্যাগ, এমন কি, সমস্ত চিন্তা ত্যাগ পর্য্যন্ত না করিলে আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া একান্ত অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে সর্ব্বভোগত্যাগরূপ সন্ন্যাস যে অপরি-হার্য্য তাহার আর কা কথা। এ সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি এবং আত্মবিদ্‌-গণের উক্তি হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে দেওয়া হইল না। এখন আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, যদি কেহ সাংসারিক সুখাসক্ত হইয়াও বলেন যে তিনি আত্মদর্শী ত জানিয়া রাখ, এই লোক কপটাচারী, মিথ্যাবাদী অথবা বাতুল। কারণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্যহীন ভোগবিলাসী, তাঁহার পক্ষে কায়িক এবং মানসিক উভয় প্রকারেই আত্মজ্ঞান লাভ করা একান্ত অসম্ভব। সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্ব লোকের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—'সত্যেন লভ্য

তপসা হেষ আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জ্ঞানসাধনের লক্ষণ কহিতেছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ। (গীতা ১৩, ৮)
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। (ঐ, ১৩,১০)
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ (গীতা, ১১, ১৩)

এখানে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞানাভিলাষী তাঁহার পক্ষেই হওয়া উচিত—"এ জগতে আনন্দ নেই, এ সৃষ্টিতে অর্থ নেই, এ জগতের প্রত্যেক নিমেষটীই ব্যর্থ", (তাঁহার পারমার্থিক জীবনের পক্ষে) জাতি সমাজ দূরে রেখে, বনে বা নিৰ্জ্জনে গিয়ে অধ্যাত্মজ্ঞানসাধন। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—"এখন সৃষ্টির এই শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শকে বরণ করলেই যে সন্ন্যাসীর চাইতে আমি হীন হব এই কথাটা সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধনে'র প্রবন্ধে বল্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ রসকে বরণ করলেই যে কোন মানুষ হীন হবে এমন কথা বল্‌বার মতো চাপরাস কোন সন্ন্যাসীর বা আর কারো আছে বলে, আমরা স্বীকার কর্‌তে নারাজ।" ইহার এক কথায় উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সৃষ্ট রূপ, রস প্রভৃতিকেই বরণ করে সে অব্যভিচারিণী ভক্তিসংযুক্ত ভগবৎব্রতী নহে। তাহার জীবন পিপাসার চিরনিবাসভূমি, অশান্তির আকর। সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে চক্ষু না ফিরাইলে যে স্রষ্টার পুণ্যদর্শন লাভ হয় না তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সেই জন্যই অসীম কাল হইতে আমাদের হিন্দুসমাজ তুরীয় আশ্রমকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে সমস্ত বর্ণের, সমস্ত আশ্রমের পরিসমাপ্তিই ঐখানে, কারণ মানুষের অভিব্যক্তির চরম পরিণতিই ঐ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ পরমহংস। যদি কখনও ভগবৎকৃপায় আমাদিগের এই ভোগের নেশা কাটিয়া যায় তবেই আমরা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে গাহিব "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ-কার্য্য।

(বাঙ্গলা ও বিহার)

গত মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দেশের দুঃখ দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় যে সকল চারা ধানগাছ হইয়াছিল তাহারাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

আমাদের বাগ্‌দা কেন্দ্র হইতে একটী পুষ্করিণী এবং ইন্দপুর হইতে তিনটী কূপ খনন করা হইয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই আমরা বীজধান্য বিতরণ আরম্ভ করিব।

ইন্দপুর কেন্দ্রে একটী চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে। সেখানে আমরা সস্তাদরে চাউল ক্রয় করিয়া ঠিক সেই দরেই বিক্রয় করিতেছি। পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বাগ্‌দায় ঐরূপ একটী দোকান খুলিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় ঐরূপ একটী দোকান খোলা হইবে, তবে এখানকার চাউল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডই সস্তাদরে যোগাইবেন বলিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আমরা বাঁকুড়া জেলায় কনিয়ামারা ও কোয়ালপাড়া নামক স্থানে দুইটী এবং সাঁওতাল পরগণায় কুণ্ডা নামক স্থানে আরও দুইটী কেন্দ্র খুলিয়াছি। অর্থাভাববশতঃ আমাদিগকে অতি কষ্টের সহিত কার্য্য চালাইতে হইতেছে। উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলে আমরা বাকুড়া, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণায় আরও সাহায্য-কেন্দ্র খুলিতে পারি।

চাউল ও বস্ত্রবিতরণ-কার্য্যের সাপ্তাহিক বিবরণ।

(২৩শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে মে পর্য্যন্ত)

বাগ্‌দা (মানভূম)

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
৫৩	১৯৬৪	৯৯।৮	১২১
৬৪	২২৭৫	১১৪॥৫	০
৬৯	২৩৮০	১২০।০	০
৫৩	১৩৩৭	৬৭৸২	০
৬৮	২০৯৮	১০৬॥৬	২৪

৬৪	১৭৬২	৮৯/৪	২৪
৫১	১৪৭২	৭৪॥৪	০
৫৫	১৩১৭	৭৭॥৯	০
৫৫	১৫০৬	৭৪॥৪	০

ইন্দপুর (বাঁকুড়া)

২৬	২৮৭	১৪॥৭	২৬
২৫	২৯৩	১৫৸২	৮
২৫	৩৩২	১৭॥৭	১৯
২৫	৩৭৪	১৯।৮	২৪
২৫	৪১৮	২১৸৮	১৫
২৭	৪৫৪	২৩৸৭	১৫
২৮	৪৮০	২৪॥৬	৩২
২৯	৫০৪	২৫৷৮	৩০

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)

৩	৬	।২	০
৫	১৯	৸৮	০
৫	৩২	১॥৪	০
৭	৩৩	১॥৬	০
৯	৩৯	২৸০	০
১২	৯২	৫/৮	০
১৪	১১১	৬/৬	১
১৮	১৭০	৮৸৪	০

ব্রাহ্মণবেড়ীয়া (ত্রিপুরা)

১৭	১৯৫	৬।৭	০
৩০	৫৩৯	২৬৸৮	০
৩১	৬১৬	৩০৸২	০

দেওঘর—কুণ্ডা (সাঁওতাল পরগণা)

৩	১৪	৸১	০
৫	৪৫	২।৮	১
৯	৯৫	৬৸২	২

বাঁকুড়া জিলার অন্তঃপাতী কনিয়ামারা গ্রামে ও সাঁওতাল পরগণার সার্ম্মা গ্রামে যে একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহাদের কার্য্য-বিবরণী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বর্ত্তমানে মোট ১৫৬ খানি গ্রামে ৩৭৬৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আমরা সাহায্য করিতেছি।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

জনৈক মহিলা, কলিকাতা ২৲
কাপ্তেন কে, সি, সেন, সিবি ১০৲
শ্রীমতী কৃষ্ণমনোমোহিনী দেবী, ,, ১০৲
শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ বসু, ,, ১৲
,, নগেন্দ্র নাথ বসু ,, ১৲
শ্রীমতী শৈলবালা বসু, ,, ২৲
শ্রীযুত পান্নালাল দত্ত, ,, ১৲
,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস, ,, ৫০৲
,, বি, এন, চৌধুরী, সিলেট ২০৲
,, জগদ্বন্ধু লাহা, মালিয়ারা, বাঁকুড়া ১৲
,, পি, সি, সরকার, আন্দুল ২৲
,, হরিদাস রায়, নীলফামারি, ৫৲
জনৈক মহিলা, কলিকাতা ৫৲
,, টি, এন, মৌলিক ,, ৫৲
,, জগৎ কিশোর বিরালা ,, ২০০৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র বকসী, আঁটিপুর ২৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ২৷০
জনৈক বন্ধু, ,, ১০২৲
শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ,, ৪৲
,, এস, সি, ঘোষ, মাধুবাণী ৫৲
,, জগদ্বন্ধু লাহা, ঢাকা ৫৲
,, শ্রীশচন্দ্র ঘটক রাঁচি ১৲
,, পি, সি, সরকার, আন্দুল ৫৲
শ্রীশ্রীবিগ্রহজী, কলিকাতা ৫০০৲
জনৈক বন্ধু ,, ১৲
শ্রীযুত পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায় ,, ৷০
,, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ণেলগঞ্জ ২৲
,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ভাওয়ালিবাগান ২৲
,, কানাইলাল রায় ,, ১৲
,, আর, এস, আচার্য্য, ২৲
,, জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ, কলিকাতা ১০৲
,, সুশীল চন্দ্র কর্ম্মকার, পাঁইটা ৫৲
,, উমেশচন্দ্র দত্ত, পইক্তি ১০৷০
শ্রীযুত নৃত্যলাল মুখার্জ্জী, কলিকাতা ১১৲
,, জি, এল্, এলেন, কলিকাতা ২০৲
,, জালিম সিং ,, ১০৲
,, নগেন্দ্র নাথ রায়, পাটনা ১০৲
,, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বালকারগঞ্জ ২৲
,, বীরেন্দ্র নাথ মিত্র, নৈহাটী ২৲
,, ললিত মোহন রায়, ভাটপাড়া ৫৲
,, সিদ্ধেশ চন্দ্র দত্ত, নাগপুর, ৩৲
,, অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় নলহাটি ৪৲
,, ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, হৈদাকান্দি ১৲
মাঃ ,, জি, বি, বক্সী এম, এ, বসরা ৫৫৲
,, প্রতাপ চন্দ্র বসাক, ঢাকা ১০৲
,, সারদা চরণ শূর, ইলিয়টগঞ্জ ২৲
,, রাজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পাইকপাড়া ৪৷৷৴০
ইণ্ডিয়ান এসিষ্টেণ্ট এণ্ড ব্রোকারস্ মেসার্স জেমস স্কট এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫৲
পি, সি, সরকার, আন্দুল ২৫৲
জনৈক বন্ধু কলিকাতা ৬৲
জনৈক বন্ধু, ,, ২৲
শ্রীযুত গোপী নাথ মিত্র ,, ৫৲
,, ললিত মোহন বসু ,, ২৲
,, নগেন্দ্র ভূষণ দত্ত, চট্টগ্রাম ৩৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০০৲
ব্রহ্মচারী দুর্গানাথ, কাশী ৫৲
শ্রীযুত চন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীপুর ২৲
চন্দ্রনাথ, এম্, জি, স্কুলের ছাত্রগণ ২৷৴০
বোর্ডারস্, লাল কুঠীমেস্, কুমিল্লা ৫৲
শ্রীযুক্ত মন্মথ কুমার বসু কৃষ্ণনগর ১০৲
ডাঃ শরৎচন্দ্র ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা ২৫৲